ইসলাম বাস্তবতা
বনাম
কল্প কাহিনী

(ভুল বুঝাবুঝির পর্দা উন্মোচন)

সংকলন

সাইয়েদ হামিদ মহসিন

অনুবাদ

শেখ নাসিরউদ্দিন আহমেদ

সালাম সেন্টার

(কুরআনের বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে তৎপর)

www.misconceptions.in www.salaamcentre.in

ISLAM Facts vs Fictions
ISLAM Facts vs Fictions

Copyright © 2014 SYED HAMID MOHSIN.

ISBN: 978-81-928089-2-5

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author, except for the situation below which is permitted.

For Reprinting

Reprinting or reproducing this book on the condition that absolutely no change, addition, or omission is introduced is permitted free of charge. To make high quality reprints, you may contact the author / Salaam Centre to obtain free copies of the soft copy or printing files of this book.

The web site of this book :

This e-book is available on the Web, world wide at:

www.Misconceptions.in , www.salaamcentre.in

Price: Rs. 150/-

Printed and Published by :
SALAAM CENTRE
65, Ist main, S.R.K. Garden, Jayanagar, Bangalore – 560 041
Branch: #5, Rich homes, Richmond road, Bangalore - 560 025
Contact: +91 99011 29956 / +91 99451 77477 / 080-2663 9007
Email: salaamcentrebangalore@gmail.com

ঃ সূচীপত্র ঃ

☆	কল্প কাহিনী ও বাস্তবতা	১
☆	ভালবাসাই আমাদের এক করতে পারে	৪
☆	জনপ্রিয় ছাঁচে ঢালা কিছু ঘৃণ্য মন্তব্য	৬
☆	পক্ষপাত দুষ্ট ইতিহাস	৭
☆	বহুবিবাহ	৮
☆	ব্যক্তিগত আইন	১০
☆	হজ ভর্তুকি	১১
☆	গণমানচিত্র	১১
☆	মুসলিম তোষন	১৫
☆	পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমান	১৯
☆	৭৮৬ এর গোলকধাঁধা	২০
☆	চাঁদ তারা ও সাম্প্রদায়িক প্রচার	২১
☆	দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্রে গোমাংস	২২
☆	ভালবাসা জিহাদ	২৩
☆	বন্দেমাতরম– জাতীয়তাবাদের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বেশী	২৫
☆	টিপু সুলতান– এক নিন্দিত দেশ প্রেমিক	২৯
☆	‘তালাক’– বিবাহ বিচ্ছেদ	৩৯

★ খুলা– মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার অধিকার ৪৩
★ ফতওয়া ৪৪
★ কুফর ও কাফির ৪৬
★ মুসলিমরা আমিষ আহারি কেন? ৪৭
★ হালাল এবং হারাম ৫১
★ হালাল পশু হত্যার ইসলামী আচরণ বিধি ৫২
★ জুয়া ও মদ হারাম ৫৩
★ ধর্ষণ বা যৌন নিগ্রহ ৫৫
★ ইসলামী শরিয়তে ধর্ষণ ও ব্যাভিচারের মধ্যে পার্থক্য ৫৬
★ ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম দেশ ৫৭
★ মুসলিম না মহামেডান ৫৯
★ শিয়া ও সুন্নী মুসলিম ৬১
★ উর্দু ভাষা কি বিদেশী ভাষা? ৬৫
★ ইসলামে পৌরহিত্যবাদের স্থান নেই ৬৬
★ সারা পৃথিবীই মসজিদ ৬৯
★ আজান ৭০
★ মুসলমানেরা কি কাবার পুজা করে? ৭৩
★ কালো পাথর–
'হাজরে আল আসওয়াদ' কি মুসলিমদের কাছে পূজ্য? ৭৫
★ মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ কেন? ৭৭
★ দরগাহ ও মসজিদের মধ্যে পার্থক্য ৭৯
★ দরগাহ যিয়ারত বা দরগাহ দর্শন ৮১
★ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ৮৩
★ আল্লাহ এবং রসূলের কোন প্রতীক নেই কেন? ৮৬

✯	নবী (সাঃ) কি তরবারির জোরেই ইসলাম প্রচার করেছিলেন?	৯১
✯	ইসলাম কি বলপূর্বক প্রসার লাভ করেছিল?	৯৫
✯	প্রাচীন শত্রুতাই বর্তমান ঘৃণা	১০৫
✯	শরীরকে মুক্ত কর সাম্প্রদায়িক বিষ থেকে	১২১
✯	জিহাদ	১২৬
✯	বৃহত্তর জিহাদ	১২৬
✯	জিহাদের চরম পর্যায়	১২৭
✯	অপেক্ষাকৃত ছোট জিহাদ	১২৮
✯	সামাজিক জিহাদ	১২৯
✯	যুদ্ধ সম্বন্ধে নবী (সাঃ) যা বলেছিলেন	১৩১
✯	যুদ্ধের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ	১৩৫
✯	ধর্মের অপব্যবহার	১৩৯
✯	অত্যাচার ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?	১৪৩
✯	ইসলাম-ভীতির প্রচার	১৫১
✯	সন্ত্রাসের মূল কারণ সমূহ	১৫৫
✯	সন্ত্রাস নিয়ে প্রচার মাধ্যমের দ্বিচারিতা	১৬১
✯	ভয়, সন্ত্রাস ও গণহত্যা পাশ্চাত্য অগ্রসর	১৬৫
✯	ইসলামে আত্মঘাতি বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ	১৭৫
✯	ইসলামী মৌলবাদ	১৮১
✯	নারী– লুকান অতীত ও অনিশ্চিত বর্তমান	১৮৫
✯	নারীর প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	১৯১
✯	ইসলামী আইনের অধীনে নারীর অধিকার	১৯৪
✯	ইসলামে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯৬

✯	হিজাব বা বুরকা	১৯৮
✯	আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম মহিলারা হিজাব পরিধান করে থাকে	১৯৯
✯	ইসলামী আইনে কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পায় কেন?	২০৩
✯	মুসলিম মহিলাদের ভোট দান প্রসঙ্গ	২০৬
✯	মহিলাদের উচ্চশিক্ষা ও ড্রাইভিং	২০৮
✯	বহুবিবাহ বনাম এক বিবাহ ব্যবস্থা	২০৯
✯	ইহুদি ধর্মে বহুবিবাহ	২১১
✯	খৃস্টানদের মধ্যে বহু বিবাহ	২১২
✯	হিন্দুমতে বহুবিবাহ	২১৩
✯	পাশ্চাত্য সমাজে বহু বিবাহ	২১৪
✯	ইসলামে বিবাহ দর্শন	২১৬
✯	ইসলামে বিধবাদের পুনর্বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা	২২১
✯	নবী (সাঃ) ও তার পারিবারিক জীবন	২২৫
✯	কুরআনের কয়েকটি বাক্য নিয়ে বিভ্রান্তি	২২৯

স্বীকারোক্তি

'এ গ্রন্থ রচনার আইডিয়া ও অনুপ্রেরণা আমি দীর্ঘ দিন ধরে অসংখ্য জ্ঞানী মানুষদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছি। বেছে বেছে তাদের নাম আমি সত্যিই এখন বলতে পারবনা। কারণ এদের সংখ্যা শতাধিক হবে।

তবুও যাদের নাম না বললেই চলেনা, তারা হলেন, প্রবীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ইউনাইটেড স্টেটসের সি.আই. ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ গ্রাহাম ফুল, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়্যার পার্সন এবং সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত জাজ মার্কান্ডে কাতজু, ওয়াসিংটনের জর্জ টাউন ইউভার্সিটির ইন্টার ন্যাশন্যাল ও ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর মিঃ জন লুইস এসপিটো, ডঃ রফিক যাকারিয়া, ভারতীয় ইসলামী গবেষক ও পন্ডিত মিঃ এ.জি নূরানী, লন্ডনের মিডলসেক্স ইউনিভার্সিটির রাইটার ও প্রফেসর জিয়াউদ্দিন সর্দার, বিবিসি ও ব্যাঙ্গালোরের সাংবাদিক মকবুল আহমেদ সিরাজ প্রমুখ।

প্রাথমিক ভাবে সে সকল পন্ডিত ব্যক্তি আমার এ পন্ডুলিপি দেখে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন ম্যান বুকার ইন্টার ন্যাশনাল প্রাইজের নমিনি, জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড ও পদ্মভূষন উপাধি প্রাপ্ত ই.আর. অনন্ত মূর্তি, ম্যাঙ্গালোর ও গোয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ চন্দ্র শেখর কম্বর। কর্ণাটক পুলিশের ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ বিপীন গোপাল কৃষ্ণ, আই.ডি.বি, ইউনেসকো এবং ইউনিডোর প্রাক্তন অ্যাডভাইজার আই.এস সানাউল্লাহ। এবং আই.পি.এস. প্রাক্তন পুলিশ ইনস্পেকটর জেনারেল মিঃ ইউ. নিসার আহমেদ।

এদের সবাইয়ের উপদেশ আমার এ কাজকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাদের এ উপদেশ ও উৎসাহ দানকে কবুল করে নিন। আমীন!

বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম বি.বি.সি জার্নালিস্ট মকবুল আহমেদ সিরাজ এবং www.karnatakamuslims.com, এর চেয়্যারম্যান মিঃ সৈয়েদ তানবীর আহমেদ এর কাছে নানান দিক থেকে তাঁরা আমাকে সব সময়ের জন্য সাহায্য যুগিয়েছে। মিস্টার নুমান খানের সাহায্য না পেলে রচনাটি গ্রন্থ রূপ প্রকাশ পেতনা।

আমি আমার পরিবার সদস্য ভাইবোনদের কৃতজ্ঞতা জানাই। স্ত্রী সাবানা ফিরদৌসি ও কন্যা সুফিয়া যারা আমার এ কাজের ব্যস্ততার জন্য পারিবারিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাকে পায়নি– তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা আসমত সারাহকে। যিনি আমার এ মিশনের প্রধান উপদেষ্টা ও উৎসাহ দাতা। তিনি সব সময় দোওয়া করেন যাতে আমি আমার একাজে এগিয়ে যেতে পারি। সর্বোপরি সব শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা সেই পরম প্রভু আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে একাজের জন্য সবরকমের সাহায্য দান করেছেন। তার অপার করুণা না পেলে আমি কোনদিন এ ধরণের কাজ করতে পারতাম না। আমি প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে পথ দেখান এবং আমার একাজ সমস্ত মানব কল্যাণের জন্য গ্রহণ করে নেন। আমীন!

ফেব্রুয়ারি ২০১৩

সৈয়েদ হামিদ সহসিন

চেয়্যারম্যান, সালাম সেন্টার

অনুবাদকের কথা

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা, একবিংশ শতাব্দিতে সারা বিশ্বের কাছে ইসলাম ও মুসলমানেরা এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কি ধর্মীয়, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক– নানান দিকের নানান সমস্যা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে একেবারে অক্টোপাশের মতো জাপ্টে ধরেছে। এমন এক সময় সৈয়েদ হামিদ মহসিন সাহেবের সালাম সেন্টার ইসলামকে স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপনা করার কাজ করে চলেছে।

এরফলে দেশবাসী তথা সমস্ত বিশ্ববাসী 'সালাম' বা শান্তি পাবে বলে মনে করছি। 'সালাম সেন্টার'-এর অন্যতম কাজ হল ইসলাম সম্বন্ধে তথ্য ও গবেষণামূলক ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ করে তা সমস্ত মুসলিম অমুসলিম দেশবাসীকে প্রদান করা। এই পদক্ষেপের অন্যতম কাজ হল এই গ্রন্থটি। ইতিমধ্যে গ্রন্থটি বহু মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি বুদ্ধিজীবি ও সমালোচকদের চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা এনেছে। গ্রন্থটি পাঠে অমুসলিমতো বটেই অনেক মুসলিম নিজেদের অনেক ভুল চিন্তাধারা পাল্টে নেবে বলে মনে করি। বাংলা ভাষায় এর ভাষান্তরে সালাম সেন্টারের মিশন বাংলাভাষী মানুষের কাছে অনেকটা বিস্তার লাভ করবে ইনশা আল্লাহ। গ্রন্থটির আগাগোড়া তথ্য ও রেফারেন্সে ঠাসা, যে সকল উৎস থেকে গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক স্তরের। গ্রন্থকার ও 'সালাম সেন্টার'– এর সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। বাংলার বুদ্ধিজীবিরা ইসলাম সম্বন্ধে যে ধোঁয়াশায় রয়েছেন আশা করি এই গ্রন্থ পাঠে তাদের সে ধোঁয়াশাও দূরীভূত হবে।

জানুয়ারি– ২০১৪ শেখ নাসির উদ্দিন আহমেদ

ভূমিকা

আমরা এক সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছি। জাতীয় রাষ্ট্রগুলো মানব সমাজকে অসংখ্যভাগে বিভক্ত করে চলেছে, যদিও নাস্তিক্য ও ধর্মীয় ধারায় ইতিমধ্যে এভাগ অনেক আগেই হয়ে গেছে। পারস্পরিক সম্পর্ক এখন তলানিতে কারণ ভাষাগত, জাতিগত ও ধর্মগত শোষন এখন পরস্পরকে ভয় দেখিয়ে চলেছে। যে ধর্ম দিয়ে মানব সমাজকে এক সূত্রে বাঁধার কথা ছিল তা এখন বিভেদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যথেচ্ছ ভাবে। ভোগবাদ ও বাণিজ্যবাদ এক সঙ্গে মিলে সারা পৃথিবীর মানুষদের কাছ থেকে সকল শান্তি ও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আজ বদ্ধপরিকর। ভোগবাদের ক্ষমতা যেটা নাকি সারা বিশ্বের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে তা আজ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী শিল্পগুলোর কাছে মাথানত করে থাকে। এর বদৌলতেই অস্ত্রশিল্পগুলির চাকা ঘুরছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষনা কেন্দ্র এবং প্রচার মাধ্যম সব কিছুই এদের কথা শুনতে বাধ্য। এরা যে রকম ছাঁচ তৈরি করে দেয় সে রকমভাবেই এদের চলতে হয়। আমাদের এই সময়ে এ এক বড় প্রহসন যে আমাদের হাজার চেঁচামেচি আবেদন, নিবেদন কোন কিছু এদের সাহায্য ছাড়া সভ্য মানুষের কাছে পৌছাবে না, এরা যদি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের কথাকে সভ্য সমাজের কাছে পৌছাবে বলে মনে করে তবে তা পৌঁছাতে পারে তাদের কাছে, নচেৎ নয়।

সবাই এখন চাইছে যুদ্ধের উন্নতি, আর এটাকে এগিয়ে যেতে হবে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ঘৃণা ছড়িয়ে, এরা আরোও মনে করে যে মুসলমান সম্প্রদায়কে কিভাবে দানবিক রূপে চিহ্নিত করা যায়। আর এই বিষয়ের উপর সারা পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। তাই আমরা বিশ্ব প্রচার মাধ্যম দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উদ্গারন করা ঘৃণা বিদ্বেষই শুধু দেখে চলেছি নির্বাক দর্শক হয়ে। একটা মত এখন ছড়িয়ে পড়ছে তা হল 'হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো নচেৎ সন্ত্রাসী দলে যাও'। সাধারণ মুসলমান এরকম পরিস্থিতিতে কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। পরিস্থিতির শিকার হয়ে মুসলিমরা আজ কিংকর্তবিমূঢ়। সারা বিশ্বের প্রচার মাধ্যম আজ ইসলাম ও মুসলমানদের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে বিশ্ববাসীর কাছে। বিশ্ববাসী দেখছে লম্বাদাড়ির মুসলিম চিত্র যার কাঁধে ঝুলছে অত্যাধুনিক বন্দুক।

আমাদের প্রচার মাধ্যম, টিভি চ্যানেল সর্বত্রই এ চিত্র দেখা যাচ্ছে বার বার। রাজনৈতিক নেতাদের মুখে মুখে ঘুরছে 'জিহাদ', 'শিয়া', 'সূন্নি', 'ওয়াহাবী' প্রভৃতি বয়ঙ্কর শব্দগুচ্ছ। সবগুলিই পশ্চিমিরা ঠিক করে দিয়েছে আতঙ্কবাহী শব্দ হিসাবে। তাদের ভায়ায় এগুলো 'যুদ্ধ ত্রাস' বহন করে। বছরের পর বছর ধরে মুসলিমদের লক্ষ্য করে প্রচার মাধ্যমগুলো অপপ্রচার চালিয়ে আসছে কৌশলে। এই ধরণের পক্ষপাতপুষ্ট প্রচারের ফলে ইতিহাসে ভুল তথ্য সংযোজিত হয়ে চলেছে দিনের পর দিন। সারা পৃথিবীতে যা কিছু অন্যায় ঘটছে তার দায় তুলে দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদের ঘাড়ে। হাসির ব্যাপার, যে সকল সুপার পাওয়ার অন্যকে সন্ত্রাসের দায়ে দায়ী করছে তারা নিজেরাই সব সন্ত্রাসের হোতা। জিহাদের ধারণা এমনভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পেশ করা হয়েছে যে ইসলাম মানে নিরোপরাধ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসের পেছনে কারা কাজ করছে তা থেকে যাচ্ছে আড়ালে।

এখন সময় এসেছে, যারা এসব কাজ করছে তাদের শুধরে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা সামনে এসেছে। যাতে করে যে যার বিশ্বাসের স্থানে স্থির থাকতে পারে ও নিজেরা একসাথে মিলে মিশে বাস করতে পারে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে করে ভুল বোঝাবুঝির একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয় সে জন্য পশ্চিমিরা অনেক খেটেছে। সন্ত্রাস দমনের নাম করে পশ্চিমিদের দ্বারা বহু মানুষের জীবন হানি ঘটেছে। নির্বিচারে তারা পদ দলিত করছে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ। সারা মিডল ইস্টে এক কৃত্রিম মত ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমন 'সভ্যতার সংকট', চতুর্থ 'বিশ্বযুদ্ধ' এবং শ্বেতাঙ্গদের 'প্রভুত্ব' ইত্যাদি। খুব বেশী দিন আগে নয় তারা আমাদের উপমহাদেশকে উপহার দিয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণা। এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি একেবারে একপেশে। তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে পশ্চিমাদের নাক গলানোর পরিণতি সম্বন্ধে মানুষদেরকে সচেতন করার কোন প্রচেষ্টাই নেই। মিডল ইস্টের কেন্দ্রস্থলে ইজরাইলকে প্রতিস্থাপন করার প্রতিবাদে জোরালো কণ্ঠও কোথাও শোনা যায় না। আর এটা সকলের জানা যে ইউরোপীরা ইহুদিদের প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার ক্ষতিপূরণের জন্য এই অবৈধ ইজরাইল রাষ্ট্রগঠন।

বিশেষভাবে 'এই গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে যাতে করে এই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সুহৃদ বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তা সত্বেও হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ভুল ধারণা বিদ্যমান তা দূরীভুত করার জন্য একটু বেশী বিস্তৃত আলোচনা করা হল। এটির মূল উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি আলোচনা করা এবং এই উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের উপর ভারতীয় সংস্কৃতি কিভাবে কাজ করছে তা দেখান। তাছাড়াও দেখান হয়েছে সারা বিশ্বে প্রচার মাধ্যম কেমনভাবে অহেতুক ত্রাস ছাড়িয়ে দিচ্ছে ইসলামের নামে। কেউ যেন এটা মনে না করে যে কেবল মুসলমানদের একেবারে নির্দোষ বানানোর জন্য আমার এ প্রচেষ্টা। অথবা একাজ অন্য কারোর উপর দোষ চাপানোর জন্য করা হয়েছে।

এটা সত্য যে এই বইয়ে দেখা যাবে মুসলিমরা ক্ষোভ প্রকাশ করছে পশ্চিমাদের বিরূদ্ধে। এর কারণ মুসলিমদের গায়ে সন্ত্রাসবাদের যে তকমা তারা এঁটেছিল তার বিরুদ্ধে মুসলিমদের হাজার প্রতিবাদ ধ্বনি পশ্চিমাদের কানে পৌঁছায়নি। তাই এই গ্রন্থের নিরপেক্ষ আলোচনার মধ্য দিয়ে মুসলিমদের একটা প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে মাত্র, যাতে করে আপাতত ভারত-উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাশীল মানুষের কানে সত্য ঘটনাটা পৌঁছায়। এ গ্রন্থের প্রচেষ্টা এই নয় যে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর সমন্বয় সাধিত হবে। বরং পরস্পর সহযোগিতার বন্ধনে দৃঢ় হবে বলে মনে করছি।

যদি মানুষের মধ্যে ত্রাস, ভয়, ইর্ষা, ঘৃণা বিদ্বেষ সরিয়ে একসাথে মিলেমিশে থাকার একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে হয় তাহলে প্রথমেই আদর্শগত ভুল বোঝাবুঝির সমস্যার সমাধান করা দরকার। সেজন্য আমাদের সাম্প্রদায়িক স্তরে যে সকল সত্য আছে তার ব্যাপক পরিচিতি ঘটান।

আমাদের একাজের জন্য দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অনেকেই জড়িয়ে রয়েছেন। একাজকে আরোও ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের আরোও বেশী করে প্রয়োজন সক্রিয় শিক্ষক ও সচেতন ব্যক্তিদের, আমাদের এ কঠিন কাজের সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত করেছি "ইসলাম ভারসেস ফ্যাক্টস এন্ড ফিকশান' নামের বইটি যেটা নাকি ভুল বোঝাবুঝির ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলতে সাহায্য করবে।

কল্প কাহিনী ও বাস্তবতা

'আমরা এমন এক সমতা বা ভারসাম্যের যুগে সময় কাটাচ্ছি যখন ব্যক্তিত্ব, জাতি এবং ধর্মের মধ্যে একটা টানা পোড়েনের স্রোত বিদ্যমান, আর এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে সব সময়ের জন্য একটা প্রভাব ফেলে চলেছে। এটা আমাদের একটা চিরন্তন সত্যের দিকে আহ্বানও করে চলেছে যার দ্বারা আমরা আমাদের ক্ষোভ, ব্যথা, কালিমা ঝেড়ে ফেলার অবকাশ পেতে পারি। আর এটাও সত্য, যে এর দ্বারা আমরা আমাদের অভ্যাস ও আচরণগত মৈত্রী কামনা করতে পারি। ইসলামের প্রচার প্রসার দিন দিন বেড়ে চলেছে একথা অনস্বীকার্য। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য যে দিকেই আমরা নজর দিইনা কেন, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার যে ইসলামের গতি আজ উর্দ্ধমুখি। ইসলামের প্রচার প্রসার দিন দিন করে যেমন বেড়েই চলেছে, তেমনি ইসলামকে নিয়ে প্রশ্নও উঠছে অনেক। ভারতবর্ষের কথাই ধরলে দেখা যাবে এর বাস্তবতা। হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে হিন্দু-মুসলিম এখানে এক সঙ্গে বাস করছে কিন্তু তাদের মধ্যে একাত্মতা গড়ে ওঠেনি। তারা একই ভূমি চাষ করছে, একই গঙ্গা, সিন্ধুর জল পান করছে, তাদের কৃষ্টি কালচার এক বলে দাবি করছে কিন্তু তারা তাদের বৈষম্যকে মাঝে মাঝে প্রকট করে তোলে রাজনৈতিক স্বার্থে। আর এটা হল উপমহাদেশের এক পরিকল্পিত রাজনৈতিক পরিকল্পনা। পারস্পরিক দূরত্বটা দিন দিন বেড়েই চলেছে আর এতে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে রাজনীতি। অপরপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু খুবই সহজ সরল। এরা কদাচিত পরস্পরের প্রতি আঙ্গুল তুলে কথা বলে।

আরব মরুভূমিতে শীতলতা ছড়িয়ে ইসলাম একশত বৎসরের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশে বয়ে এনেছিল তার মহান বার্তা। কিন্তু ইসলামী শাসন হিসাবে তা দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এগার'শ একানব্বই খৃস্টাব্দে। ব্রিটিশদের শাসক হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভের অনেক আগে মুসলিদের আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মীয় শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এখানে, আর একাজ সূফী সন্তরাই করতে পেরেছিলেন তাদের মহানুভবতা ও হার্দিক উষ্ণতার মধ্য দিয়ে। সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে এ ঐক্য তারা সফলভাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বাস্থনিবাস এবং ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার স্নিগ্ধ আলো। ধর্মের সীমা অতিক্রম করে বহু মানুষ ছুটে এসেছিল এই দিকে।

সুফীবাদের এই দীর্ঘ ধারা– শান্তি, ভালবাসা ও ঐক্যের বাণীই সারা উপমহাদেশকেই উপহার দিয়েছিল। আর এই দেশের হাজার হাজার মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে এসেছিল এই আলোর দিকে ভালবাসা, ত্যাগ ও শান্তির মহা মিলন বার্তা নিয়ে। আর এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি, ভাষা, স্থাপত্য সব মিলে মিসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় শিল্পকলা সমৃদ্ধ হয়েছিল হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, কাওয়ালী, গজল মোঘলীয় গাঁথা প্রভৃতির দ্বারা। এ সংস্কৃতির মধ্যে শিখ ধর্ম যেমন স্থান পেয়েছিল তেমনি স্থান পেয়েছিল আর্য সমাজও সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল কবির পন্থিরাও। এছাড়া আরোও অনেকে। আর এর ফলে আরোও অনেক কৃষ্টি কালচার নতুনভাবে এসেছিল ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে গুলোর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি লাভ করেছিলো এক মৈত্রি।

এর পরের ঘটনা-প্রবাহ দীর্ঘ। অনেক রাজবংশই অতিবাহিত হয়েছে এই ভারতের মাটিতে থেকে তারা এসেছে চলে গিয়েছে, বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ভারতের প্রান্তিক সীমা পরিবর্তন হয়েছে অনেকবার। এর ফলে নতুন নতুন সমাধান সূত্রও উত্থাপিত হয়েছে ভারতবাসীর কাছে। বিভিন্ন রাজবংশের এই উত্থান পতন পারস্পরিক একটা বন্ধন সূত্র অবশ্য রেখে গেছে। এই ভাবে মুঘল শাসকরাও একদিন ভারতের মাটি শাসন করেছিল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু তারাও কালের স্রোতে বিদায়

নিয়েছে। ১৮৫৭ সালে তাদের শাসন স্তব্ধ হল, আর তাদের স্থান দখল করল ব্রিটিশ শাসন। এ বৃহৎ দেশ শাসন করার জন্য তারা এক মারাত্মক নীতি অবলম্বন করল। সমগ্র ভারতবাসীর ঐক্য তারা না চেয়ে বরং তারা এর বিভেদকে বেশী করে চাইল। তারা এটা ভাল করে অনুভব করেছিল যে, এই দেশ থেকে যদি প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে হয় তা'হলে এ জাতির মধ্যে বিভেদ নীতি প্রয়োগ করা এক মোক্ষম হাতিয়ার। তাই তারা একাজে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছিল।

প্রথমেই তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন এক নীতি অবলম্বন করল যাতে করে তাদেরই প্রয়োজনীয় কিছু ক্লার্কই শুধু যাতে তৈরী হয় তারই ব্যবস্থা হল। তারপর এই সকল ক্লার্ক বা করণিকদের তারা নিযুক্ত করল নিজেদের কাজ কারবারে, আর এই সকল চাকুরীজীবি করণিকদের দ্বারাই প্রথমে সমাজে বিভাজন শুরু হল। আর এই বিভাজনের হাত ধরে ক্রমশ ধর্মীয় বিভাজনের সূত্রপাত দেখা গেল সমাজে। ভারতবাসী 'আমরা' বনাম 'তোমরা' নীতিতে ক্রমশ ঢলে পড়ল।

শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া, দেশীয় ভাষার প্রতি-আয়েশী দিন কাটানোর পরিনাম কি মারাত্মক হয়েছে মুসলমানেরা আজ তার কোন রকম ব্যাখ্যা আমাদের কাছে আর দিতে পারবেনা। মুসলিমদের যে ইমেজ ফুটেছিল তা ধীরে ধীরে মলিন হতে লাগল যখন তারা ছিটকে পড়েছিল শিক্ষার অঙ্গন থেকে। চারদিক থেকে নিন্দার পাহাড় তাদের উপর আছড়ে পড়ল। মুসলিমদের উষ্ণ রক্ত শোষিত হল ইংরেজদের দ্বারা, তারা তাদের উপর চাপিয়ে দিল নানা রকম সাজানো গল্প, যার ফলে তারা মাথা তুলে দাড়াতে পারলনা সমাজের কোথাও। সকলের কাছে ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হল মুসলমানেরা। ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা কল্প কাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিল সেগুলো গো গ্রাসে গিলে নিল তাদের তৈরী করণিক বাবু শ্রেনির মানুষেরা। বিকৃত এই বিষাক্ত ইতিহাস ও কল্প কাহিনী গ্রহণ করে বাবু শ্রেণির লোকেরা মুসলমানদের আর মানুষ বলেই ভাবতে চাইল না। দীর্ঘ দিনের সম্প্রীতিপূর্ণ যে সহাবস্থান ভারতবর্ষে চলছিল তা ছিন্ন হল মারাত্মকভাবে। এর পরিণাম হল মারাত্মক। মুসলিম ও হিন্দু

ভায়েরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সন্দেহের সাথে তাকাতে শুরু করল। ক্রমশঃ তা শত্রুতায় পরিণত হল সবার অলক্ষে।

এখন সময় এসেছে এসব নিয়ে ভাবার, দেরি করলে চলবে না। আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের তন্দ্রা না কাটিয়ে চলতে থাকি তাহলে আরোও ঘোর দিন আমাদের সামনে এসে পড়বে যখন আমরা পরস্পর পরস্পর দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত থেকে নিজেদের ধংস করে ফেলব। তাই আজই আমাদের হাতে হাত রেখে ভুল বোঝাবুঝি ছুড়ে ফেলতে হবে। এটাই এখন ভারতবাসীর সবচেয়ে বড় করণীয় কাজ।

ভালবাসাই আমাদের এক করতে পারে

ভারতীয় ধর্মীয় উদ্বিগ্নতা দিন দিন করে বেড়েই চলেছে। তা সবাইয়ের ক্ষেত্রে। বিশেষতঃ তা বেশী করে গ্রাস করছে রাজনীতিবিদ, ক্রিমিনাল ও সামরিক বাহিনীর লোকেদের মধ্যে। এরা সবাই ভাল করে বুঝে নিয়েছে যে শোষণের বিরাট জায়গা হল এই ধর্মীয় উদ্বিগ্নতা। তারা এর মধ্যে তাদের স্বার্থ খোঁজে, কিন্তু সমাজ এর ভুক্ত ভোগী হয়। এর আগে অনেকবার হয়েছে এখনও হচ্ছে। আর আগামী দিনে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটাও দেখার বিষয়।

প্রবীন এক রাজনীতিবিদ এরকমই মন্তব্য করেছেন যে মুসলিমরা যেমন, তাদের সাথে তেমনই আচরণ করা দরকার। অথচ আমাদের নিজেদের ব্যপারে অনেকটা উদার থাকতে হবে। ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি এরকম আচরণ কোন প্রকার অন্যায়ের নয়। আর এই ধরনের আচরণ দিন দিন বেশ প্রকট হয়ে উঠছে। এমনকি বর্তমান পরিস্থিতিতেও আমরা কমবেশী এটাই দেখছি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিমদের প্রবেশ করার অনুমতি দেয়াই হচ্ছেনা। এখনও মুসলিমদের বিদেশী ভাবার উন্নাসিকতা কমেনি, বরং মাঝে মাঝে তা বেড়ে যেতে দেখা যায়।

চরমপন্থী চিন্তা ধারা প্রসারলাভ করার পেছনে যে জিনিস কাজ করে তা হল কল্প কাহিনীর প্রাবল্যতা। কল্প কাহিনীকে ভিত্তি করে অনেক সময়

ক্রমশ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা দেখলে আমাদের অবাক হতে হয়। কল্প কাহিনীটা আসলে সত্য, অর্ধসত্য পাঁচ মিশালি চিন্তাধারার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যাকে সহজে আলাদা করাও যায় না, যে জন্য চরমপন্থিরা সাধারণত এমন জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে যার দ্বারা তাদের আবেগ পায় ঘৃণ্য প্রশয়। তারা এমন সব ঘৃণা উদ্রেককারী অনাবশ্যক অযৌক্তিক কাজ কারবার করে থাকে যে তার দ্বারা সাধারণ মানুষেরাও খারাপ কাজে প্রভাবিত হয়। যার ফলে আত্মগরিমা, হিংসা, দ্বেষ ছড়িয়ে বেড়ানো তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে উপহাস করা, মানুষের নিন্দা করা, মানুষকে হীন করা তাদের কাছে খেলতামাসার মত একটা কাজ হয় তখন। এমনকি এর ফলে সৃষ্টি হয় যতসব বিকৃত ইতিহাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি।

বর্তমানে ভারতের মুসলিম সংখ্যা মোটেই কম নয়। কম বেশি ১৬০ মিলিয়নের মত। আর এরা নানা দিক থেকে সমালোচনার বিষয় হচ্ছে তা অনস্বীকার্য। বলা যেতে পারে এদের সুখ্যাতির চাইতে অখ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়ার নানা পরিকল্পনাই নেওয়া হচ্ছে। এরম এক পরিস্থিতিতে এটা পরিস্কার, যেকোন মুহূর্তে আমাদের সম্প্রীতির ফিউজ কেটে গিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামার বিরাট সম্ভাবনা আসতে পারে। আর এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পারস্পরিক সন্দেহ, অনাস্থাই হল এসবের মূল উৎস। সত্যি সত্যিই কি আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক আচরণ করে চলতে পারছি? আর এই গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতা শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃতের অটুট বাধনের পক্ষে সহায়ক বলে আমরা মনে করতাম।

গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতি আমাদের এ ধরনের আচরণ সম্বন্ধে আমাদের কাছে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কার কাছে আমরা এর জবাব চাইব? কেই বা এ প্রশ্ন কি স্বার্থে করবে? নীরবতাই শুধু এর উত্তর। যদিও এর উত্তর খোলাখুলি ও স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল, কিন্তু জল অনেক ঘোলা করা হলেও কোন রকম সুফল মেলেনি এ ব্যাপারে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সফলতা পেতে গেলে আমাদের আরোও অনেক ভাবার দরকার। আমাদের ভারতীয় দুটি মেজর কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের

দ্বার খোলার একান্ত প্রয়োজন। দুটি সম্প্রদায় যতক্ষণ নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মতের আদান প্রদান না করবে, ততক্ষন তারা ,একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারবে না। পরস্পর ধর্মীয় চিন্তার দার্শনিক মূল্যকে অনুভব করা একান্ত প্রয়োজন সবার আগে। এর ফলে উভয় ধর্মের মানুষদের প্রতি পারস্পরিক সহানুভুতি ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ ঘটা তখন অনেকটা সহজ হবে বলে বিশ্বস করা যেতে পারে। ভ্রাতৃত্বের এমনই এক সেতুর উপর আমরা দাঁড়িয়ে স্লোগান তুলতে পারি। ঘৃণা, বিদ্বেষ মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনে এবং ভালবাসা আনে ঐক্যের বন্ধন। জাতি গড়তে আমাদের এমনই এক লক্ষে অগ্রসর হতে হবে যেখানে শান্তি ও উন্নতির জন্য এই মৌলিক জিনিসের গুরুত্ব সর্বাগ্রে স্বীকৃত হবে।

জনপ্রিয় ছাঁচে ঢালা কিছু ঘৃণ্য মন্তব্য

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলিম দুটি জাতি পাশাপাশি বাস করে আসছে কিন্তু শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সবাইয়ের মুখে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু ঘৃণ্য অভিযোগ শোনা যায়। কোন দিন এগুলো তলিয়ে দেখা হয়না। কেউ ভাবেনা, ভাবার কথা একবার মনেও করে না। যার ফলে এই সব ভ্রান্ত ধারণা কেবলমাত্র অমুসলিম নয়, বরং অনেক বুদ্ধিজীবি মুসলিমদেরও আক্রান্ত করেছে। আর এগুলো তারা তাদের সাহিত্যে প্রকাশ করতেও ছাড়েনা। 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' (Muslim Personal Law) কেও তারা কয়েকটি বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যেই পর্যালোচনা করে থাকে। যেমন ভাবা হয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইন মানে মুসলিমদের একসঙ্গে চার চারটি স্ত্রী কব্জা করার হাতিয়ার কিংবা যখন ইচ্ছা স্ত্রীদের তালাক প্রদান করে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়ার মত এক সুযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটাও ভাবা হয়ে থাকে এমন মুসলিমই 'পরিবার পরিকল্পনা'কে (Family Planning) জঘন্য ঘৃন্য জিনিস বলে মনে করে থাকে। এই ধারণাগুলো এত ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে যে যার ফলে সাধারণভাবে সবাই এটা মনে করে থাকে যে মুসলিমদের জন্যই জাতির উন্নতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর মুসলিমরা যদি না থাকত তা হলে দেশ ও জাতির উন্নতি বুঝি বন্যার মত প্লাবিত হয়ে যেত। এ ধরনের অভ্যস্ত ধারণা যখন জাতিকে জটিল

সমস্যায় ভোগাচ্ছে তখন বিকৃত ইতিহাসের প্রচার এ কুৎসিৎ ধারণায় ঘৃতাহুতি প্রদান করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মুসলিমরা নাকি জোর করে অন্যান্য ধর্মের মানুষদের নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করে চলেছে। ডাহা গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে তারা মন্দিরগুলোকে গুঁড়িয়ে তার উপর উঁচু করে গড়ে তুলেছে গম্বুজ ও বিশিষ্ট মসজিদ স্থাপত্য। এমনকি মুসলিমরা মন্দিরের প্রতিমা মূর্তিগুলি ধূলায় ফেলে মাড়িয়েছে ও মাড়াচ্ছে। এই ধারণায় যখন একটি সম্প্রদায় পুষ্ট হয় তখন তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে। আর এই সুযোগ গ্রহণ করে ভোট বাক্স যারা ভরাতে চায় তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে, তারা নবীর জন্মোৎসবে ছুটির ব্যবস্থার জন্য হৈ-চৈ করে। সংখ্যালঘুর উন্নতি চাই, উন্নতি চাই, বলে সর্বত্র গলা ফাটায়। কিন্তু এগুলো সত্যিই আন্তরিক নয়। শুধু শুধু দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের হৃদয়ে যথেষ্ট দূরত্ব এনে মৈত্রিকে নষ্ট করে।

পক্ষপাত দুষ্ট ইতিহাস

পক্ষপাত দুষ্ট ইতিহাস আমাদের সর্বনাশ করেছে অতীতে, বর্তমানেও করে চলেছে। এর হাত থেকে আমাদের বাঁচা খুবই কঠিন, সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষক, সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি থেকে ইতিহাসের গবেষকরা পর্যন্ত এই সর্বনাশা টোপে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। আওরঙ্গজেবকে শিখন্ড বানিয়ে মুসলিম চরিত্রকে কলুষীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আওরঙ্গজেব ছিলেন উদার হৃদয়ের মানুষ। কিন্তু পাঠ্য ইতিহাসগুলোতে তার ব্যাপক দুর্নাম ছড়ানো হয়েছে। বেনারসের মন্দির ধংস করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে দেওয়া হচ্ছে তার মাথায়। একই সঙ্গে তিনি গোলকুন্ডার জামা মসজিদও ভেঙ্গে ফেলেছিলেন কারণ যেখানে কুতুব শাহি বংশের আবুল হাসান তানাসা অবৈধ সম্পদ পুঞ্জিভুত করে রেখেছিলেন, অবশ্য এ ঘটনাকে লঘু করে পেশ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে একই ঘটনা, ধর্মস্থানের লক্ষ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে সেখানে নানান ষড়যন্ত্রের আখড়া বানানো হয়েছিল আর সেগুলো যদি ধংস করে না দেওয়া হত, তা হলে

তা সমগ্র দেশের মানুষকে নানান বিপদের সামনে টেনে আনত। তাই এগুলো ধংস করার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

বহুবিবাহ

মুসলমানেরা বহু-বিবাহ করে, অতএব তারা ভাল নয় তারা খারাপ, তাদের চরিত্র নেই, তারা কামুক ইত্যাদি অভিযোগ সর্বত্র বিদ্যমান। এর আলোচনা প্রসঙ্গ হাটে বাজারে, চায়ের দোকানে, পথ যাত্রায় তীর্থ স্থানে যেমন হয়ে থাকে তেমনি পত্র-পত্রিকা সংবাদ সর্বত্র বেশ মর্যদার স্থান করে নিয়েছে। সাধারণভাবে এটা বলা হয় যে একজন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করা মানে বেশী পরিমান সন্তানের জন্ম দান করে। যার ফলে দেশে স্বাভাবিক নিয়মে মুসলিমদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাবে। এমনকি বিরোধীরা এটাকে বিনা অস্ত্রে দেশ জয় বলেও অভিহিত করে থাকে। কিন্তু যারা এরকম সমালোচনা করে, তারা কেবল অপরের মুখে ঝাল খেয়ে এরকম কথা বলে, বাস্তবের অংক তারা মিলিয়ে দেখেনা। সাধারণভাবে পরিসংখ্যানে দেখা যায় মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের ছেলে অনেক বেশি, যদি চারটি করে প্রতি মুসলিম পুরুষ বিবাহ করে থাকে তা'হলে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চারগুণ হওয়া দরকার কিন্তু তাতো কেউ বলতে পারবে না। আবার যদি চারজন মহিলার চার জায়গায় বিয়ে হয়ে থাকে তারা পৃথক পৃথক ভাবে যতগুলি সন্তান প্রসব করবে তার চেয়ে অনেক কম করবে বহু পত্নীক স্বামীর কাছে। তাছাড়া বর্তমানে একাধিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভারতীয় অন্যান্য ধর্মের মানুষদের চেয়ে মুসলিমরা বহু বিবাহে মোটেই এগিয়ে নেই। ১৯৮১ সালের জনগণনায় দেখা গেছে যে আমাদের ভারতে মহিলা পুরুষের অনুপাত ১০০০ জন মহিলা হলে পুরুষ হল ১০৬৮ জন, তাহলে কি করে মুসলিমরা চারটি করে বিয়ে করার সুযোগ পেয়ে থাকে? এটা এক অবাস্তব মিথ্যাচার।

১৯৬১ সালে পুনের Mallika B. Mistry of Ghokle Institute of Pune এক পরিসংখ্যান যা আমাদের সামনে পেশ করেছিল তা দেখলে আমাদের সবাইয়ের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম হওয়ার কথা, এই পরিসংখ্যানে

দেখা গেছে ভারতীয় জনসংখ্যায় আদিবাসীদের মধ্যে বহু-বিবাহের হার সবচেয়ে বেশি, এদের হার ১৫.২৫% তারপর বৌদ্ধদের (৭.৯%), তারপর জৈনদের (৬.৭২%)তারপর হিন্দুদের মধ্যে (৫.৮০%) এবং যাদেরকে নিয়ে এত হৈ চৈ সেই মুসলিমদের মধ্যে বহু বিবাহের হার সবচেয়ে কম শতকরা ৫.৭০%, এই পরিসংখ্যান দেখে আমাদের অবাক হতে হবে। কেবল মিথ্যা গুজব রটিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে কোন কিছু লাভ হবে না, আমরা এখানে পূরানো পরিসংখ্যান তুলে ধরেছি এই কারণে যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনেক পূরানো, আর পূরণ অভিযোগ নুতন করে বার বার করে নূতন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে। উল্লেখিত পরিসংখ্যানে এই কথা বলে শেষ করা হয়েছে – "There is no evidence that the percentage of polygamous marriage (among Muslims is larger than those among Hindus." "এমন কোন প্রমান নেই যে মুসলিমরা হিন্দুদের চেয়ে বহু বিবাহে কোন দিক থেকে এগিয়ে আছে।"

আধুনিক কিছু পক্ষপাত দুষ্ট প্রচার মাধ্যম মিথ্যাভাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে "হাম দো, হামারা দো, ওহ পাঁচ উনকো পঁচিশ'– আমরা দুজন আমাদের সন্তান সন্ততি দুই, কিন্তু ওরা যে পাঁচ জন অতএব ওদের সন্তান সন্ততি পঁচিশ"– মূলত এ স্লোগান এক ধরণের উস্কানি মূলক ব্যঙ্গোক্তি ছাড়া কিছু নয়। এধরনের প্রচার সমগ্র মুসলিমদের মুখে চুনকালি দিয়েই চলেছে। এটা কি কোন সময় ভেবে দেখা হয়েছে যে এর কি মারাত্মক পরিনাম দেশবাসীর উপর পড়বে। এই ধরণের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণে জাতির সামগ্রিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রকট।

১৯৯৩ সালে গুজরাটের আমেদাবাদে আটটি ব্লকে মুসলমানদের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, এই সমীক্ষায় দেখা গেছে মুসলিম পরিবার গুলোর মধ্যে মাত্র ২৭৯ টি ঘটনা ঘটেছে দুটি করে বহু-বিবাহের। এ রিপোর্ট কোন মুসলিম ম্যাগাজিনের নয় বরং তা বেরিয়েছিল ২০০৩ সালের ১৩ই জুলাই The Hindusthan Times পত্রিকায়। এখানে আরোও মন্তব্য করে বলা হয়েছে– "While muslims have often been jeered, that

fact is that Hindus are also involved in Polygamous practices. As many as 29,951 cases of Maitri Karar (friendship contract) were found officially registered at the District Collectorate in Ahmedabad at that time. The Maitri Karar was a pact between a married Hindu man and his 'other woman' to circumvent provisions of the Hindu Marriage Act that prohibits another marriage while the wife is still alive."

"যখন মুসলিমদের বহু-বিবাহকে ব্যঙ্গোক্তি করে অনেক কথা বলা হচ্ছে তখন হিন্দুদের মধ্যে একই অভ্যাস পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। আমেদাবাদে ডিস্ট্রিকট কালেক্টর এলাকায় হিন্দুদের মধ্যে ২৯৯৫১ টি ঘটনা পাওয়া গেছে যেখানে "মৈত্রি করার' (বন্ধুত্ব চুক্তি) নিয়ম মেনে বহু-বিবাহ বা একাধিক মহিলা গ্রহণের সুযোগ নেওয়া হয়েছে। অফিসিয়ালি এই তালিকা নথিভুক্ত করা হয়েছে। 'মৈত্রি করার' চুক্তিটি ক্রমশ হিন্দু পুরুষের অন্য মহিলা গ্রহণের অধিকার স্বীকৃতি দান করে। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে যে এক স্ত্রী বেঁচে থাকাকালিন সময়ে একাধিক পত্নী স্বীকৃত নয় সেই আইনকে এক প্রকার নিস্কৃয় করে বোকা বানিয়েছে বলা যেতে পারে", দৈনিক পত্রিকা The Hindustan Times আরোও বলেছে,

"It was not legally enforceable, but the Maitri Karar was meant to give a sense of security to the married man's 'other woman".

'আইনত বলবতযোগ্য নয় কিন্তু 'মৈত্রি করার' মানেই হল এক বিবাহিত পুরুষের অন্য মহিলা গ্রহণের নিরাপত্তা লাভ'।

ব্যক্তিগত আইন

(Personal Law)

অনেকেই মনে করেন যে 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' (Muslim Personal Law) মানেই মুসলিমদের সুযোগ সুবিধার শুধু ব্যবস্থা করা, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তারা তলিয়ে দেখেনা, এটা সত্য যে– মুসলিম ব্যক্তিগত আইন কেবল মুসলমানদের স্বার্থ দেখেনা বরং ভারতীয় অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের কথাও বলে থাকে। তাদের অধিকার গুলোও এই আইনের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়া হিন্দু ও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য শ্রেণিদেরও আলাদা আইন স্বীকৃত রয়েছে, এবং সেগুলো পৃথকভাবে স্বীকৃতও বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন সম্পত্তি হস্তান্তর ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে হিন্দুদের ব্যক্তিগত নিয়মই আইন হিসাবে স্বীকৃত, ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতে পারিবারিক বিষয়গুলোতে প্রথাগত সংস্কৃতির অনেক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত ভাবে। কারণ এতে রয়েছে জাতি বিকাশের অনেক সম্ভাবনা, এটা অবশ্যই আমাদের বোঝা দরকার সিভিল কোডের ইউনিফরমিটির স্লোগান মোটেই সুখকর নয়, বরং তা সবাইয়ের জন্য ক্ষতিকর বলা যেতে পারে। তাই শক্তি প্রয়োগ করে হলেও এই দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া হিন্দুদের বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ বাস্তবিক পক্ষে মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুদের স্বার্থ এর সাথে অনেক বেশি জড়িয়ে রয়েছে। আজ না হলেও কাল বুঝবে হিন্দু ভাইয়েরা।

হজ ভর্তুকি

মুসলিমদের ধর্মীয় পাঁচটি মৌলিক কাজের মধ্যে বিত্তশালীদের হজে গমন করা একটি অবশ্য করনীয় কাজ। আর এর জন্য সূদূর আরব দেশে পাড়ি দিতে হয়। তাই হজ যাত্রায় বড় ধরণের পয়সা ব্যয় হয়ে থাকে। বর্তমানে ভারত সরকার হজ যাত্রীদের এই যাত্রায় কিছু ভর্তুকি ধার্য করেছে, এতে মুসলমানরা উপকৃত হচ্ছে। এই বিষয়টি অনেকের কাছে সমালোচনা

হিসাবে দেখা দিয়েছে। মনে রাখতে হবে কেন্দ্রীয় হজ কমিটি দ্বারা ভাড়া করা প্লেন পাওয়ার সুবিধা একটি ব্যতিক্রম ব্যবস্থা। আর এ ব্যাপারে অনেক মুসলিমরাই বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। এটা মূলত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বৈশিষ্টের মধ্যে পড়েনা, এমনকি ইসলাম এর প্রতি নমনীয়ও নয়। এতে মুসলমানদের দোষ কোথায়? কিন্তু ইতি মধ্যেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ কিছু রাজ্যে তীর্থযাত্রায় ভর্তুকি দেওয়া শুরু হয়েছে।

গণমানচিত্র

আমাদের মধ্যে এক ভুল ধারণার যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে, আর সেটা শুধু আজকের নয়। অতীতের ইতিহাসেও এমন ভুল বোঝাবুঝির অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক বুদ্ধিজীবিরাও এই ভুল ধারণার শিকার। মুসলমানদের মধ্যে জন সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে কারণ তারা চারচারটি বিয়ে করে, ফলে অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে মুসলিমরা পরিবার পরিকল্পনা মানে না এবং বহু বিবাহের ফলে তাদের সংখ্যাধিক্য হতে বেশীদিন সময় লাগবে না।

সত্যি কথা বলতে বেশ কয়েকটি চরমপন্থি সংগঠন বছরের পর বছর এই ধরণের একটা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এটাই উদ্দেশ্য মুসলিমদের জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির এই তত্ত্বটা জনসাধারণের মধ্যে চাউর করে দেওয়া, যাতে করে বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের মানুষ যেন ভাবতে শেখে যে মুসলমানদের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তাদের মেজোরিটি ভোটের ভিত্তিতে এ দেশ দখল হয়ে যাবে। তাদের এই দুর্নীতিমূলক অভিসন্ধি গুজবের আকার নিয়ে ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে। কিন্তু জনগণনা রিপোর্ট আমাদের এ ধরণের গুজবকে সমর্থন করেনা। তাই মুসলমানেরা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটায় আতঙ্কিত হওয়ার দারকার নেই। ১৯৭১ সালের জনগণনায় হিন্দু ছিল ৮২.৭% ও মুসলিমরা ছিল ১১.২%। ১৯৯১ সালের জনগণনায় হিন্দু ছিল ৮২.৬% এবং মুসলিমরা ছিল ১১.৪%।

১৯৯২ সালের মালায়ালাম ইয়ারবুক এ তথ্য আমাদের পেশ করে, ২০০১ সালের সেনসাসে দেখা গেছে মুসলিমরা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, মুসলিম বৃদ্ধির পরিমান এখানে ছিল ২.৯% এবং হিন্দুদের বৃদ্ধির পরিমান ছিল ২.৩%, কিন্তু এটাকে বিশেষজ্ঞরা নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং অতি মাত্রায় নিরক্ষরতার পরিণাম হিসাবে গন্য করেছেন। এই রকম আর্থ সামাজিক সমস্যার জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয়ের বৃদ্ধির হার আলোচনায় আনা যেতে পারে, এখানে খৃস্টান তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিহার ১.৮%। আর এটা সম্ভব হয়েছে শিক্ষা বিস্তারের জন্য। অপরপক্ষে জম্মু কাশ্মীরের হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার মুসলমানদের চেয়ে বেশী, এখানে হিন্দু জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার ৩৭% অপরপক্ষে মুসলমানদের বৃদ্ধিহার ২.৬ জন।

সর্বোপরি এটা বলা যেতে পারে ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা বিভিন্ন আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির জন্য কম বেশী হতে পারে। এর জন্য উপরোক্ত যে সকল অভিযোগগুলো মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু একবারে ঠিক নয়। যদিও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধিহার একটু তারতম্য বর্তমানে হয়েছে তবুও এটা বলা যায় যে এই শতাব্দীতে মুসলিমরা দেশে এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে না যে তাতে এ দেশ স্বভাবতই তাদের দখলে এসে যাবে। তাছাড়াও বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃদ্ধিহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৬১-৭১ এবং ১৯৭১-৮১ হিন্দুরা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৭১% থেকে ২৪.৪২% অপর পক্ষে মুসলিমদের বৃদ্ধিহার উপরের দিকে না উঠে নিম্ন দিকে ৩০.২০%। এখন যে কেউ এটা সহজে বুঝতে পারবে যে মুসলিমদের বৃদ্ধিহার যদি এভাবে কমেউ যায় তাহলে তো শতাব্দী পরে হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমরা কমেই যাবে স্বাভাবিক ভাবে।

মুসলিম তোষন

কিছু কট্টর সাম্প্রদায়িক সংগঠন প্রচার করে চলেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মুসলিমদের তোষন করে চলে, অথচ মুসলিমরা জাতি গঠনে অথবা দেশের কল্যাণ সাধনে কোন প্রকার ভূমিকা রাখেনা, অথবা রাখলেও তা নগন্য। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে রাজেন্দ্র সাচার কমিটির রিপোর্টে। ২০০৫ সালে ভারত সরকার ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ সমাজিক শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য এই রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চালিয়েছিল। ২০০৬ সালেই সাচার কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করেছে। রিপোর্টে দেখা গেছে ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা খুবই খারাপ ও শোচনীয় এমন কি তা সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবদের চেয়েও খারাপ। কমিটি আশ্চর্য জনক তথ্য প্রকাশ করেছে এ ব্যাপারে। বাস্তবক্ষেত্রে মুসলিমদের বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা কোন অন্যায়ের নয়। আমাদের দেখা দরকার মুসলিমরা কি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এটাও আমাদের জানা দরকার মুসলিম জনসংখ্যা কিন্তু ১৩%-এরও অধিক।

১। মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাহার জাতীয় শিক্ষাহারের তুলনায় খুবই কম। ৬ থেকে ১৪ বছরের মুসলিম ছেলেমেয়েদের প্রায় ২৫% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তিই হয়নি অথবা অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় ছেড়েই দেয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কর্মসূচী জাতীয় স্তরে নেওয়া হয়েছিল তা থেকে মুসলিমরা প্রায় একেবারে বঞ্চিত থেকে গেছে। কলেজে যাওয়া ২৫ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক জন

মুসলিম ছাত্র বা ছাত্রী থাকে। আবার গ্রাজুয়েট স্তরের পর পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম ছাত্র বা ছাত্রী। গ্রাজুয়েট স্তরের মুসলিম বেকারদের হাল অন্যান্য যে কোন ধর্মের লোকেদের চেয়ে খারাপ। বিদ্যালয়ে যাওয়ার মত বয়সী মাত্র ৩% শিশুরা মাদ্রাসায় পড়াশোনার জন্য যায়। সাচার কমিটির রিপোর্ট আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবদের উন্নতির জন্য অনেক সদর্থক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাই মুসলিমদের জন্য একই রকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

২। উচ্চ সরকারি অফিসে মুসলিমদের নিয়োগ খুবই নগন্য। প্রথম শ্রেণির অফিসারদের মধ্যে মাত্র ৩.১৯% মুসলিম চাকুরি করেন। দ্বিতীয় শ্রেণি অফিসারদের মধ্যে আছেন ৪.৩০% এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন ৮.১৬%। প্রাইভেট সেক্টরগুলিতে এর পরিমান আরোও কম।

৩। ভারতীয় আমলা বিভাগে মুসলিমদের নিয়োগও খুব কম। ভারতীয় মুসলিম যেখানে ১৩% সেখানে মুসলিম আমলারা আছে ২.৫%।

৪। কর্মক্ষেত্রে মুসলিমদের নিয়োগও খুব নগন্য, (I.A.S) আই.এ.এস ৩%, (I.F.S) আই.এফ.এস-এ ১.৪% এবং (I.P.S) আই.পি.এসে আছেন ৪%, ভারতীয় রেলওয়েতে নিয়োগ রয়েছে মুসলিমদের মাত্র ৪.৫%, আবার এদের মধ্যে ৯৮.৭% নিম্নতলায় চাকুরী করেন। ব্যাঙ্ক ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও মুসলিমদের কর্মী খুবই কম। ভারতের কোন রাজ্যেই মুসলিমরা তাদের সংখ্যানুপাতে কাজে নিযুক্ত নয়। পুলিশ বিভাগে মুসলিমরা রয়েছে ৬%, স্বাস্থ বিভাগে রয়েছে ৪.৪%, এবং পরিবহন বিভাগে রয়েছে ৬.৫%।

৫। বিচার বিভাগে মুসলিমদের অনুপস্থিতিও লক্ষ করার মত। ১৯৮০ সালের ১ এপ্রিলের হিসাব অনুযায়ী ৩১০জন জর্জের মধ্যে মাত্র ১৪জন মুসলিম।

৬। ব্যাঙ্কে চাকুরীজীবি রয়েছেন মাত্র ৪.৩% এবং মুসলিমরা লোনও পায় মাত্র ২.০২%। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের লোনের সুযোগ মাত্র ৩.৭৬%।

৫। শিল্পক্ষেত্রেও মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে। দেশের বৃহৎ শিল্পে মুসলমানেরা তো নেই, এমন কি কোন রকম নিয়ন্ত্রনও তাদের দ্বারা হয়ে থাকে না। শিল্প ক্ষেত্রে যে লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে মুসলিমরা তার মাত্র ২% পেয়ে থাকে। হস্তশিল্পে মুসলিমরা পারদর্শিতায় ৫২% হলেও তারা হস্তশিল্পের মালিকানায় মাত্র ৪.৪% অধিকার রেখেছে।

সাচার কমিটি খুবই দুঃখের সাথে প্রকাশ করেছে যে মুসলিমদের প্রতি একটা ধারাবাহিক অভিযোগ তোলা হয়ে থাকে সব সময়। অযথা তাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে তারা নাকি নানা প্রকারের দেশদ্রোহীতা মূলক কাজে সবসময় জড়িত থাকে। সেই সঙ্গে নানান ষড়যন্ত্র মূলক কাজে তারা আঞ্জাম দেয়।

তোষন?

মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত নানান সার্ভের ফলাফল থেকে এটা বোঝা যায় যে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য খুবই কম কিছু করা হয় অথবা অনেক সময় কিছুই করা হয়না। কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে রাজনীতির লোকেরা নানা বুলি আওড়ালেও বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলিমরা তেমন কিছু পায়না, এর দ্বারা কেবল বিভিন্ন রাজনীতির কুমীরেরা নিজেদের পেট ভরায়। যৎ সামান্য মুসলিমরা পেয়ে থাকলেও তাকে পাওয়া বলে না। তাদের উন্নতির জন্য অনেক বেশী পাওয়ার আছে।

সার্ভে রিপোর্ট বলছে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক। মাত্র ১০০০০ হাজার টাকার কম বার্ষিক আয়ে সংসার চালান মুসলিমদের ৩০.৪০%, ২০০০০-৩০০০০ হাজার বার্ষিক আয়ে ৭.৫%, ৩০০০০-৪০০০০ হাজার টাকায় সংসার নির্বাহ করেন মাত্র ৩.৮%, ৪০০০০-৫০০০০ হাজার টাকায় সংসার চালায় ১%। এছাড়াও করুন কথা

শুনিয়েছে সাচার কমিটি, ২৭.৬% মুসলমান বাস করছে ঘিঞ্জি বস্তিতে। এদের ৪৬.১% আবার একটি মাত্র বেডরুমে। যারা সমালোচনার ঝড় তুলছে যে মুসলমানদের তোষনে অনেক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তবে মুসলমানদের এ হাল কেন? নানান রাজনৈতিক দল মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য নাকি শুধু ঢেলেই চলেছে? কিন্তু প্রশ্ন স্বাধীনতার এত বছর পর তাহলে মুসলমানদের হাল এরকম থেকে গেল কেন? এর উত্তর, যা বলা হয় তা করা হয় না। মুসলমানদের উন্নতির জন্য যে কথা ঘটা করে ছড়ানো হয় তা বাস্তবে করে দেখানো হয় না। রাজনৈতিক ভোট ব্যাঙ্ক মারাত্মকভাবে ভিলেন ভূমিকার পাঠ করে চলে। ভারতীয় রাজনীতির এ এক বিরাট বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন মন্ডল কমিশনের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল তখন হিন্দুদের মধ্যে যারা পিছিয়েছিল তারা উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিমরা এর দ্বারা কোন উপকার পায়নি। একেবারে নয়, কেবল মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা উপকৃত হয়েছিল মাত্র। উত্তর ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের ২০% লোক ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু। তাই তাদের স্বার্থকে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল এই মন্ডল কমিশনের সুপারিশ এর ফলে তারাই একত্রিত হয়ে মন্ডল কমিশনের সুপারিশে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল। আর এর ফলেই তাদের প্রতিবাদ আঘাত হেনেছিল তাদের নিজ ধর্মের বঞ্চিত মানুষগুলোর প্রতি।

রাজেন্দ্র সাচার কমিটি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের দুদর্শা তুলে ধরেছে। এখানে মুসলিমদের অনেকটা সচেতন করে তোলা হয়েছে। এই কমিটির রিপোর্টে কেবল মুসলিমরা নয় দেশের অনেক অমুসলিম বুদ্ধিজীবিগণ মুসলিমদের শোচনীয় অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচক অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে মুসলিমদের এই করুন অবস্থায়। তাছাড়াও দরিদ্রতা মুসলমানদের নিত্য সঙ্গী, ইতিমধ্যে যদি সদর্থক কিছু ভাবনা মুসলমানদের জন্য না ভাবা হয়ে থাকে তাহলে তারা শীঘ্রই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে চির বঞ্চিত হয়ে পড়বে। রাজনৈতিক স্তর থেকেও তারা ছিটকে পড়বে স্বাভাবিকভাবে।

সমতা প্রদানে নিরাপত্তাহীনতার জন্য মুসলমানেরা দিন দিন সংখ্যালঘু

পরিচয় প্রাপ্তির আশঙ্কায় ভুগছে। নিয়ন্ত্রনহীন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রায়শঃ মুসলমানদের ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার সামনে হাজির করছে। সে জন্য স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে মুসলমানেরা ক্রমশঃ বিছিন্ন হয়ে পড়ছে। আর এভাবে জীবন যাপনের জেরে মুসলমানেরা সম্পূর্ণভাবে অবহেলার পাত্র হিসাবে দিন কাটাচ্ছে। তাই তারা বর্তমানে সবার অলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিকই বটে। দুটি সম্প্রদায় তাই একই মাটিতে বসবাস করা স্বত্তেও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ধারার শিকড় বিস্তার করে চলেছে। একটি সম্প্রদায় বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত উপাদান পেলেও অপরটি সংখ্যালঘু হয়ে বেঁচে আছে।

মুসলমানেরা কখনও তোষন পায়নি, কিন্তু তাবুও তাদের এ বদনাম বহন করে চলতে হচ্ছে। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল তাদের প্রতি যে দয়া দাক্ষিন্য দেখিয়ে থাকে তা তোষামদ নয় বরং তা মুসলমানদের প্রাপ্যই ছিল। এটা আমাদের কাছে পরিস্কার হওয়া দরকার যে মুসলমানদেরকে তোষামদ না করে বরং অধিকার প্রদান করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমান

একটা বড় ধরনের গুজব আমাদের সবাইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে পাকিস্তান নাকি মুসলমানদের জন্য পবিত্র বাসভূমি কিন্তু এ কথা এক বারে মিথ্যা। মক্কা মদিনার মত ধর্মীয় কোন কারণ নেই যাতে করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান পবিত্র বাসভূমি হবে। মক্কা মদিনার সাথে ইসলাম ধর্মের আগমন ও হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্ম মৃত্যুর ঘটনা জড়িত তাছাড়া মহাগ্রন্থ কুরআন মক্কা মদিনায় অবতীর্ন হয়েছিল তাই এগুলো মুসলমানদের কাছে পবিত্র। কিন্তু পাকিস্তান মোটেই পবিত্র ধর্মীয় কোন স্থান নয়। পৃথিবীর ৫৭ টি মুসলিম দেশের মধ্যে পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ। পাকিস্তানের পতাকাকে মুসলিমরা কখনও পবিত্র মনে করে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পতাকার যেমন মর্যদা পাকিস্তানি পতাকাও সেই রকম। মালয়েশিয়া, চাঁদ, উজবেকিস্থান ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পতাকার মত পাকিস্তানের পতাকা। এতে আলাদা কোন মাহাত্ম

নেই। ভারতীয় মুসলমানেরা পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলনে কোন প্রকার ধর্মীয় পূণ্য পাবে বলে মনেও করে না। বরং মুসলিমদের বিখ্যাত কতগুলি স্থান ভারত ভাগ হওয়ার সময় আমাদের দেশ ভারতেই থেকে গেছে। তাই মুসলমানেরা কোন সময় পাকিস্তানে যাওয়ার আশা পোষন করেনা। কিন্তু ভারত ভাগ হওয়ার সময় শিখদের পবিত্র স্থান 'গুরুদ্বারা' দে বাবা নানকরা পাকিস্তানের লাহরে থেকে গেছে যেজন্য তারা হয়ত পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারে। হিন্দুদের পবিত্র স্থান 'কাটাখরাজ' ও ইসলামাবাদে অবস্থিত তাই তারা পাকিস্তানে চলেও যেতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রতি দুর্বলতা দেখানোর কোন কারণ থাকতে পারে না।

৭৮৬ এর গোলকধাঁধা

খৃস্টানরা তাদের ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে 'ক্রশ' চিহ্ন ব্যাবহার করে থাকে। তাই গির্জায় গির্জায় 'ক্রশ' -এর ফলক দেখা যায় সর্বত্র। খৃস্টান কবরের মাথার দিকে কাঠের নিমির্ত ক্রশও পোঁতা হয়। তাছাড়া 'ক্রশ' গলায়ও পরিধান করতে দেখা যায়। এইভাবে ক্রশ খৃস্টানদের জীবনে সব কিছুতে জড়িয়ে রয়েছে বলা যেতে পারে।

হিন্দুরাও 'ওম' বা স্বস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন। খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় অন্যান্য ধর্ম থেকে আমদানি করে কিছু মুসলমানেরাও এরকম প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের এরকম প্রতীক ব্যবহার করার কোন ধর্মীয় অনুমোদন নেই। আরবি অক্ষর গুলির আলাদা আলাদা শাব্দিক মান রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে ৭৮৬ লিখলে কূরআনের একটি বাক্য যা সূরা তওবা ব্যতিত সব সূরার প্রথমে রয়েছে তা লেখা হয়। তাছাড়া সব কাজ শুরু করার প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহিম' বাক্যটি পড়ার কথা বলা হয়েছে হাদীস গ্রন্থে। 'বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহিম'–বাক্যটির অর্থ 'পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। এই বাক্য পাঠ করা বা লিখা খুবই কল্যাণকর কিন্তু এর সংক্ষিপ্তকরণ রূপ দিয়ে ৭৮৬ লিখা এক ধরনের নব আবিস্কৃত ধর্মীয় সংযোজন। বর্তমানে এই ৭৮৬ সংখ্যাটিকে শুভ বলে ভাবা হয় তাই ঘরবাড়ি, যান বাহন ইত্যাদিতে ৭৮৬ সংখ্যাটি লিখতে দেখা যায়। এমন কি লোকেরা ফোন নাম্বার বা কোন এ্যাকাউন্ট নাম্বারের

চাঁদ তারা ও সাম্প্রদায়িক প্রচার

চন্দ্র মাসের গণনা অনুযায়ী মুসলিম পঞ্জিকা নির্ধারন হয়ে থাকে। দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাঃ) এর আমল থেকে হিজরি সাল গননা শুরু হয়। 'হিজরি সাল শুরু হয়েছিল নবী (সাঃ) ও তার সাথিদের মক্কা থেকে মদিনায় ঐতিহাসিক দেশান্তরের ঘটনার সময় থেকে। চন্দ্র মাসের এই হিজরি বর্ষ অনুযায়ী মুসলমানদের অনেক ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন হজ, রোযা, ইদুল ফিতর, ইদুল আযহা প্রভৃতি। তাই মুসলমানদের কাছে চন্দ্রমাসের গুরুত্ব রয়েছে। আর সেই সাথে জড়িয়ে পড়েছে চাঁদের প্রতীক। অটোম্যান তুর্কিমুসলিম শাসকদের সময় হিজরি পঞ্জিকার ব্যাপক বিস্তার ইউরোপের বিশাল অংশে কার্যকরি হয় আর তখন থেকেই চাঁদ তারা প্রতীকটি পতাকায় স্থান পায়। যার ফলে মুসলিম জগতও এই ধরনের পতাকা বহনের রীতি নীতি গ্রহণ করে এখান থেকেই। সেই ঐতিহ্যকে বহন করে বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মুসলমান সম্রাজ্য চাঁদ তারা খচিত পতাকা গ্রহণ করে থাকে। এমনকি চাঁদ তারাকে তারা জাতীয় প্রতীক হিসাবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তা বলে এর কোন ধর্মীয় স্বীকৃতি নেই। এমনকি এটি কোন পবিত্রতা বা অপবিত্রতার প্রশ্ন রাখেনা।

কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অজ্ঞ মুসলিমদের দ্বারা চাঁদ তারার প্রতীক এক প্রকার পুজিত হয়ে থাকে। আর তার ফলে চাঁদ তারা খচিত সবুজ বৃহদাকারের পতাকা কবর স্থানে কিংবা দরগাহে ব্যবহার করা হয়। এগুলো ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারি কুসংস্কার ও বিদয়াত ছাড়া কিছু নয়। এ ধরণের কাজ কারবারকে ইসলাম কোন সময়ে অনুমোদন করেনা। যদিও বহু মুসলিম দেশ এধরনের পতাকা বহন করে থাকে। অটোম্যান তুর্কীরা তাদের সরকারি প্রতীক হিসাবে এই চিহ্ন ব্যবহার করত এবং তা

প্রায় চার শতাব্দী ধরে তারা এই ঐতিহ্যের অধিকারি ছিল। এমনকি এর প্রভাব বর্তমানে আমেরিকার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের ডি.সি তে মুসলিমদের ব্যাপক উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইসলাম ধর্মে এর কোন অনুমোদন নেই যে এটাকে জাতীয় প্রতীক, শীলমোহর বা পতাকা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই ধর্মীয় কোন বিষয় এর সাথে একেবারে জড়িত নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক হিন্দু ভায়েরা এই চাঁদ তারা খচিত পতাকা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারা বলে থাকেন যে যেহেতু মুসলমানেরা পাকিস্তানের মত চাঁদ তারা খচিত পতাকা ব্যবহার করে থাকে অতএব তারা পাকিস্তানকে ভালবাসে এবং তারা পাকিস্তানের কাছে অনুগত। কিন্তু এটা জানা দরকার যে কিছু মুসলিম কবর ও দরগাহে যে পতাকা ব্যবহার করে তা চাঁদ তারা খচিত থাকলেও পাকিস্তানী পতাকা থেকে একেবারে আলাদা। পাকিস্তানী পতাকায় বাম দিকে লম্বভাবে সাদা ডোরা এক চতুর্থ অংশ ঢাকা থাকে, যা ভারতীয় মুসলমানদের দরগাহে ব্যবহৃত পতাকার মত নয়।

তা সত্ত্বেও ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে এই পতাকাকে কেন্দ্র করে শ্রী রাম সেন-হিন্দু সংগঠনের মধ্যে বড় ধরনের উত্তেজনা দেখা যায় এমনকি সংগঠনের কয়েক জন উগ্র সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হন। আমাদের ভাবা উচিত সাম্প্রদায়িকতা কত সুক্ষ্মভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে সাধারণভাবে এই সব ব্যাপারে জন সাধারণ খুবই স্পর্ষকাতর।

দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্রে গোমাংস

খুবই স্পর্শ কাতর এক বিষয় নিয়ে হায়দ্রাবাদে খুবই হৈ-চৈ হয়েছিল বছর খানেক আগে। হিন্দু সংগঠনের চারজন যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছিলেন এই জন্য যে, তারা গোমাংসের টুকরো নিয়ে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মন্দিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল, যাতে করে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যায়। কিন্তু পুলিশ খুব তৎপরতার সাথে বিষয়টি নিয়ন্ত্রনে

আনে, এবং দাঙ্গার হাত থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করেন।

এ ঘটনা দ্বারা এটা সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম গুপ্ত শত্রু রয়েছে যারা আমাদের সংহতিকে বিনষ্ট করার জন্য নানা রকম কৌশল করে। এই ধরনের হীন কৌশল অবলম্বন করে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে এক সম্প্রদায়ের মানুষের মন বিষিয়ে দেওয়ার এ এক হীন প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। ভারতের মত এরকম গণতান্ত্রিক দেশে এ ধরণের হীন চেষ্টার ফলে অশান্তির আগুন জ্বলে যেতে পারে। গোঁড়ারা তাদের চর নিয়োগ করে রেখেছে এধরণের কাজ করার জন্য যাতে করে সাম্প্রদায়িকভাবে দেশের মানুষ এই জঘন্য বিষয় নিয়ে দল পাকায়।

এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ এটা প্রমান করে যে এই জঘন্যতম কাজের প্রয়াস অনেক দিন ধরে চলছে। অযোধ্যা ইস্যু অনেকটাই অনুর্বর হয়ে পড়েছে। বর্তমানে তাই নূতন করে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানোর জন্য নূতন করে জমি খুজছে সাম্প্রদায়িক লোকেরা। আর একেই কেন্দ্র করে ভোট ব্যাঙ্কের হাওয়া পাওয়া খুব সহজ ভাবছে তারা। সাধারণ জন সমাজের উচিত এ ব্যাপারে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করা। কোন সময়েই উত্তেজিত হলে চলবেনা, হিন্দু কিংবা মুসলমান যেই হোকনা কেন উভয়কেই শান্তভাবে চিন্তা ভাবনা করে চলতে হবে। কোন মতেই আবেগকে প্রশয় দেওয়া যাবে না। জন সাধারণ যদি এ রকম হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে তা হলে আমাদের মধ্যে দুষ্ট চিন্তা স্থান করে নিতে পারবে না, বরং এরই হাত ধরে সমাজে আসবে একটা স্থিরতার পরিবেশ।

ভালবাসা জিহাদ

কর্নাটকে BJP-র পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় একটি অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় একটা ইস্যু এমনভাবে প্রচার করার চেষ্টা চালান হচ্ছে তা ভাবলে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। মুসলমানরা এই হীন চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়ছে সহজেই। সাধারণভাবে এটা প্রচার করা হচ্ছে যে মুসলিম যুবকদের হিন্দু মেয়েদের সাথে প্রেমে জড়িয়ে

দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে। আসলে এতে মুসলমানদের সংখ্যাই বেড়ে যাবে। এবং হিন্দু মেয়েরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করবে। এই ইস্যুটা এতটাই প্রসার লাভ করেছে যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আশেপাশের পত্রিকা গুলোর প্রথম পাতার খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর পরিণাম হয়েছে মারাত্মক। কোথাও কোন মুসলিম যুবক ও হিন্দু মহিলার কথা বার্তা হলেই মুসলিম যুবকের উপর হামলা চালানো হচ্ছে জঘন্য ভাবে। এমনকি যাতায়াতের পথে বাসে ট্রামে সবার সামনে।

এই রকম স্পর্শকাতর বিষয়কে ইস্যু করার পেছনে রাজনৈতিক অনেক কারণও রয়েছে। হিন্দু ভাইদের আসল উদ্দেশ্য যে তারা তাদের সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। আর এটাকে ইস্যু করে সমস্ত সম্প্রদায়কে এক ঐক্য শক্তিতে বাঁধা গেলে ভবিষ্যতে উপকার হবে। এরকম ঘটনার পরিপেক্ষিতে হাইকোর্ট এক তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল। ডি.আই.জি ব্যাঙ্কের অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তা বেশ চাঞ্চল্যকর। হিন্দু মহিলাদের কোন রকম প্রলোভন দেওয়া হয়নি, বরং তাদের এ বিবাহটা একেবারে ব্যক্তিগত ইচ্ছা। তদন্ত রিপোর্টে জানা গেল এতে কোন প্রকার মুসলিম ষড়যন্ত্র নেই। আর এর পেছনে কোন বলপ্রয়োগেরও স্থান নেই। তবে স্বেচ্ছায় কিছু হিন্দুমহিলা ইসলাম গ্রহণ করাতে তাদেরকে মুসলিম যুককেরা বিয়ে করেছেন। যতদিন না তদন্ত হয়ে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে ততদিন পর্যন্ত সাংবাদিকরা তাদের অপপ্রচার চালিয়েই রেখেছিল। কিন্তু এটা অমুসলিমদের মিথ্যা প্রচারকে তেমন কিছু প্রতিহত করতে পারেনি। তাই এই ঘটনাকে সাধারণ বিচারেও প্রত্যাখান করা যায়। কারণ ভালবাসার ব্যাপারটা একেবারে দুটি ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। জুলুম চাপিয়ে কাউকে ভালবাসা অসম্ভব। ভালবাসার মধ্যে থাকা উচিত এক স্বতস্ফূর্ত আবেগানুভুতি। এটা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় পারস্পরিক বোঝা পড়ার মধ্য দিয়ে।

বন্দেমাতরম

জাতীয়তাবাদের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বেশী

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের এক জটিল ইতিহাস বর্তমান। বাংলার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এর রচয়িতা। পরবর্তী সময়ে তার বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দমঠে এটি সংযোজিত হয়েছিল। এই উপন্যাস খুব কঠোর ভাবেই মুসলিম বিদ্বেষি। অথচ এই সংগীতটি এক সম্প্রদায়ের কাছে জন বহুল। ইসলাম তৈহীদবাদী ধর্ম, একশ্বর বাদী ধর্ম। ইসলামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করা হয়না। অন্য কোন দেবদেবীর স্থানও নেই ইসলামে। কিন্তু কিছু সাম্প্রদায়িক মানুষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট মাথা ঘামায়। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে বন্দেমাতরম সঙ্গীত না গায় তাহলে তাকে জাতীয়তা বিরোধী বলে মনে করা হয়।

মুসলমানেরা স্বীকার করেন যে, দেশের একজন নাগরিক হিসাবে জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার। দেশপ্রেমের জন্য কাজ ও বিশ্বাসে সেটা প্রমাণ করা দরকার। কিন্তু এ কথা দ্বারা এটা বোঝায় না যে তাকে ইসলামের তৌহীদ নীতি বর্জন করে অন্য কিছুকে পূজার স্থানে স্থান দিতে হবে। জাতির প্রতি অনুগত মানে জাতি পুজা কখনই গ্রহণ যোগ্য নয়। জাতি পূজা আর জাতির প্রতি ভালবাসা দুটো কখনই এক নয়। সৌদী আরব অথবা ইরানে দেশ পূজা বা জাতি পূজা করার জন্য কোন রকম পীড়াপীড়ি বা বাধ্য করা হয়না কিন্তু তা বলে দেশের সার্বভৌমিকতাকে অস্বীকার করতে পারেনা কোন নাগরিক। দেশের প্রতি আনুগত্য কোন সময় দেবত্বে পৌঁছায় না এ সব দেশগুলোতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জনগণ মন..... জাতীয় স্তোত্র হিসাবে তখনই নির্বাচিত হয়েছিল যখন তা ভারতের বৈচিত্র বর্ননায় যথেষ্ঠ প্রসার লাভ করেছিল। লক্ষ করার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দেমাতরম সঙ্গীতের প্রথম দুটি স্তবকই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যদা লাভ করেছে। পরের স্তবকগুলি হিন্দু দেবদেবীদের সাথে তূলনা করা হয়েছে ভারতভূমিকে।

এছাড়াও জনগণ মন... সংঙ্গীত গাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি থেকে যায় অনেক কারণে। একটি উল্যেখযোগ্য কারণ হল এটি রচিত হয়েছিল ভারতে রাজা পঞ্চম জর্জের আগমনকে কেন্দ্র করে। এতে রাজা পঞ্চম জর্জকে প্রশংসা করা হয়েছে একথা কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করতে পারবেন না। এই কল্প কথাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে বর্তমানে একজন নোবেল বিজয়ী মানুষকে সম্মান হানি করার জন্য। কিন্তু তার ঔপনিবেশিক বিরোধী চিন্তাধারা সবার কাছে জ্ঞাত। সবাই জানেন তিনি সাম্প্রদায়িক চিন্তার উর্দ্ধে ছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আযাদ হিন্দ ফৌজ 'জনগণ মন ....' কে জাতীয় স্তোত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। আর গান্ধীজী এটা বলেছিলেন যে জনগণ মন .... আমাদের জাতীয় জীবনে একটা স্থান করে নিয়েছে। এমন একটা কারণ যাতে এমন বেশ কিছু সুক্ষ উপাদান আছে। যার ফলে এই কারণেই 'জনগণ মন...' সঙ্গীতের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম কে অনেকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিতে তৎপর।

আজ মুসলমানেরা বন্দেমাতরম গাইতে যে ইতস্তত করে তার চাইতে জনগণ মন সঙ্গীতকে নীচু করে দেখার প্রয়াস মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। এই ব্যাপারটিকে নিয়ে যে ধরণের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা হয়ে থাকে তাতে জাতীয় মর্যাদার প্রতি কুর্নিশ জানানোর জন্য বাছাইকৃত আচরণ অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্ট ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছিল। Jehovah's Witnesses -স্কুলের ছাত্ররা জাতীয় সঙ্গীত গাইতে অস্বীকার করেছিল কেননা এতে তাদের ধর্মীয় আপত্তি ছিল, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের

স্কুল থেকে বিতাড়িত করেছিল এই মর্মে। ঘটনাটা এই পর্যন্ত শেষ হয়নি বরং তা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট তদন্ত করে দেখেছিল সত্যিই এর মধ্যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে কিনা। কোর্ট যখন এ সত্যতায় পৌঁছাল যে সত্যিই এর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে তখন ছাত্রদের পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং ছাত্রদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষকে। কারণ ভরতীয় সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারের বলে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি গোষ্ঠী সবাই তাদের ধর্মের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

সোলি সোরাবজি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তিনি মহামান্য বিচারক চিন্নাপ্পা রেড্ডির কাছ থেকে এই রায়ের ব্যাখা প্রসঙ্গে যা ইঙ্গিত পেয়েছেন তা হল,

> "Our tradition teaches tolerance; our philosophy preaches tolerancce; our constitution practices tolerance; let us not dilute it."

"আমাদের ঐতিহ্য সহিষ্ণুতার শিক্ষাদেয় আমাদের দর্শন সহিষ্ণুতার প্রচার করে আমাদের সংবিধান সহিষ্ণুতার বাস্তবায়ন ঘটায়। সুতরাং কিছুতেই তা নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।"

টিপু সুলতান

এক নিন্দিত দেশ প্রধান

অষ্টাদশ শতাব্দীর মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ঐতিহাসিকদের দ্বারা দারুনভাবে নিন্দিত হয়েছেন। এমন কি তাকে অত্যাচারি গোঁড়া মুসলিম শাসক হিসাবে নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে ইংরেজদের চালাকি। তারা চেয়েছিল হিন্দু মুসলিম দুটো জাতিকে যদি আলাদা করা যায় তাহলে অনেক ফায়েদা লোটা যাবে। তাই তারা ভারতীয় ইতিহাসে বেশ কিছু ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভেজাল ঢুকিয়েছিল। আর তারই পরিণামে আজও আমাদের ভোগান্তি পেতে হচ্ছে।

টিপু সুলতান ও তার পিতা হায়দার আলি উভয়ই ইংরাজদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন। যেজন্য ইংরেজরা তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য ১৭৬৭ তে এক ষড়যন্ত্রমূলক সন্ধী স্থাপন করে কিন্তু পরে তা ভেঙ্গে যায়।

যাই হোক বর্তমান ইতিহাস টিপু সুলতানের মর্যাদাকে যথেষ্ট উচ্চে তুলে ধরেছে। তার রাজ্যকে 'সুলতানে-খুদাবাদ' নামে অভিহিত করা হয়। যার অর্থ 'ঈশ্বর প্রদত্ত সরকার'। এটা নিঃসন্দেহ যে তিনি বিভিন্ন ধর্মের সহবাস্থান কামনা করতেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য সহানুভুতিশীল ছিলেন। মন্দির মসজিদ উভয় প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারণের জন্য তিনি আন্তরিকতা প্রদান করতেন। তিনি প্রশাসনিক

বিভাগে কেবল হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন তা নয় বরং তিনি বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ বিভাগেও অনেক হিন্দুদের নিযুক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণ রাও ছিলেন তার অর্থমন্ত্রী, সোমা রাও ছিলেন তার পুলিস অধিকর্তা। অপরদিকে শ্রী নিবাস ছিলেন মাদ্রাজের রাষ্ট্রদূত। আপ্পাজি ছিলেন পুনের রাষ্ট্রদূত এবং মূলচাঁদ ছিলেন দিল্লির রাষ্ট্রদূত। তার ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে ছিলেন সুব্বা রাও। তিনি তার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন নারানাইকে। এমনকি সৈন্য বিভাগের ডিভিসান অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন হরি সিং। শিবাজী হয়ে ছিলেন অশ্বারোহী বিভাগের কমান্ডার। যার অধীনে ছিল ৩০০০ ঘোড়া। এটাই সত্য যে, এমন কোন রাজা নেই যে যিনি টিপু সুলতানের মত এত সংখ্যক নিজ সম্প্রদায় বহির্ভুত লোকেদের শাসন কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। শুধুমাত্র এত সংখ্যক লোক নিয়োগ নয় বরং এত বড় বড় পদে এদের নিযুক্ত করা সত্যিই বিরল বলা যেতে পারে। টিপু সুলতান যে পরিমান দান মন্দিরগুলিকে প্রদান করেছিলেন তা সত্যিই ঐতিহাসিকদের ভাবিয়ে তোলে এমন ধরনের কাজ সত্যিই তাকে যোগ্য শাসক হিসাবে তুলে ধরে ইতিহাসের পাতায়। এত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে টিপু সুলতানের মন্দিরগুলোকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে আমরা এটা বলতে পারি যে তিনি তার ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রদর্শনীর জন্য এ সব কাজ করেননি বরং তিনি এ সকল কাজ একান্ত আন্তরিকতার অনুপ্রেরনায় করেছিলেন। কারণ ধর্ম নিরপেক্ষাতার প্রমান তাকে তখন দেখানোর প্রয়োজন ছিলনা। সেকালেও এটার প্রয়োজন ছিলনা বর্তমানেও নেই। তিনি এসব কাজ করেছিলেন রাজকীয় পরিকল্পনার তাগিদে যাতে করে শান্তি শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় শাসন ব্যবস্থায়।

এটা খুবই স্পষ্ট যে ক্ষুদ্রমনের ঐতিহাসিকরা রাজনৈতিক টানা পোড়েনের মাঝে পড়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। স্বভাবতই তারা ইংরাজদের চক্রান্তে পড়ে অমুসলিমদের হয়ে পক্ষপাতিত্ব করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য পোষন করতে গিয়ে ডঃ বি.এ.পান্ডে তার বিখ্যাত 'Aurangzeb and Tipu Sultan: Evaluation of their Religious Policy'

গ্রন্থে লিখেছেন,

> "If he crushed the Hindus of Coorg, the Christians of Mangalore and the Nayars of Malabar that was due to the fact that they wished to undermine his authority by joining the British. He did not spare the Mopillas of Malabar or the Mahadevi Muslims or Nawabs of Sawanur or Nizam whenever he suspected such tendencies among them."

"যদি তিনি কুরগের হিন্দু, ম্যাঙ্গালোরের খৃস্টান এবং মালাবারের নায়ারদের ধ্বংস করতেন তবে সেটা এই কারণে হত যে তারা তার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। তিনি ছেড়ে দিতেন না মালাবারের মপিলা, মহাদেবীর মুসলিম। নবাব ও নিজামদের যেখানে তিনি সন্দেহ করেছিলেন তাদের মধ্যে এরকম প্রবনতা বিদ্যমান।"

তাই বলা যেতে পারে টিপু সুলতানের চরমপন্থী হওয়ার নামে কাদা ছেটানো জঘন্যতম এক অন্যায়। তিনি কেবল কঠোর হয়েছিলেন তাদের প্রতি যারা ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে তার সম্রাজ্য ধসিয়ে দিতে চেয়েছিল। কারণ এটা ছিল একটি রাজনৈতিক ব্যাপার এটার সাথে ধর্মীয় কোন যোগসূত্র বর্তমান ছিলনা। হয়ত তাকে এখনও আমরা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চরমপন্থি ধর্মীয় গোঁড়া ব্যক্তি হিসাবে দেখতাম যদিনা গান্ধীজীর উক্তি আমরা না পেতাম। এ প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছিলেন,

"an embodiment of Hindu-Muslim unity". হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক প্রতীক"।

টিপু সুলতানের ব্যাপারে ইতিহাসে যে বিরাট বিকৃতি ঘটেছে সে ব্যাপারে পরে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডঃ বি. এন. পান্ডে বড় করে আলোকপাত করেছেন। (তিনি তৎকালীন উড়িষ্যার গভর্নর AICC-র History Research Cell -এর নেতৃত্বেও ছিলেন) মহিশূর গেজেটিয়ারের এক রেফারেন্স দেখে অবাক হয়েছিলেন তাতে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়

টিপু কুরগদের হত্যা করেছিল। তিনি মহিশূর গেজেটিয়ারের সাথে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদের 'Anglo Bengali' কলেজের পাঠ্যপুস্তক ভাল করে দেখেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল,

> "Three thousand Brahmins had committed suicide as Tipu wanted to convert them forcibly into the fold of Islam".

"তিন হাজার ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করেছিল যখন টিপু তাদের জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন।"

এ উক্তির লেখক ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত হর প্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয় যিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান।

ডঃ পান্ডে তৎক্ষণাৎই শাস্ত্রি মহাশয়কে একথার প্রমানে, কোথা থেকে এটি নেওয়া হয়েছে তার রেফারেন্স পেশ করার জন্য লিখেছিলেন। কয়েক বার তিনি বলার পর শাস্ত্রি মহাশয় উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এ তথ্যটি পেয়েছিলেন Mysore Gazetteer থেকে। তাই ডঃ পান্ডে তৎকালীন Mysore University -এর ভাইস চ্যান্সেলর ব্রিজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে শাস্ত্রি মহাশয় যে গেজেটিয়ারের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা খুঁটিয়ে দেখতে বলেন। সেই সময় গেজেটিয়ারের নূতন এডিসনের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসার শ্রীকান্তিয়া। তিনি তাকে ব্যাপারটি দেখার জন্য দায়িত্ব দেন। প্রফেসার শ্রীকান্তিয়া জানালেন গেজেটিয়ারে এরকম কোন ঘটনা উল্লেখ নেই বরং তিনি তার বক্তব্যে যোগ করে বললেন, যে টিপু সুলতানের প্রধান মন্ত্রী এবং কমান্ডর-ইন-চিফ উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আরো জুড়ে দিলেন ১৫৬ টি মন্দিরের একটি তালিকা যেগুলোতে টিপু সুলতান আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান করতেন তার কোষাগার থেকে। এমনকি একটি লিঙ্গ দান করেছিলেন টিপু সুলতান যা পাঞ্জাগুড় মন্দিরে এখনও পূজিত হয়ে থাকে। শ্রীরঙ্গ পত্তনে টিপুর রাজ প্রাসাদ থেকে একেবারে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ছিল রঙ্গনাথ মন্দির। তিনি নিকটবর্তী মসজিদ থেকে যেমন আযানও শুনতেন তেমনি এই মন্দির থেকে শুনতে পেতেন ঘন্টা ধ্বনি। (Impact

International, London, Vol. 28, July 1998)

এর পরে জানা গেল শাস্ত্রি মহাশয় ব্রাহ্মণদের আত্মহত্যা কাহিনীটি Colonel Miles History of Mysore -থেকে তুলে নিয়েছিলেন। এখানে এটি নাকি উল্লেখিত হয়েছিল রাণি ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের এক পার্সি পান্ডু-লিপি থেকে। ডঃ পান্ডে যখন পুনরায় ব্যাপারটি খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি জানালেন রাণির ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে এরকম কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমান নেই। তা সত্ত্বেও শাস্ত্রি মহাশয়ের বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চলত ভারতের সাতটি রাজ্যে। সেগুলো হল আসাম, বাঙ্গাল, বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ। পান্ডে মহাশয় তখন ব্যাপারটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোস চৌধুরীর উপর ন্যস্ত করেন। বেশ কয়েক বছর গত হলেও ১৯৭২ সালে ডঃ পান্ডে মহাশয় খুবই অবাক হয়েছিলেন যখন দেখেন যে সেই একই পুরান 'ব্রাহ্মনদের আত্মহত্যার' মনগড়া গল্প উত্তর প্রদেশের জুনিয়ার হাই স্কুলগুলোতে পড়ানো হচ্ছে। মিথ্যা কাহিনীও ইতিহাসের মুখোশ পরে চলতে পারে স্রোতের মত।

টিপু সুলতান মন্দিরগুলোর জন্য এত জমিও উপহার স্বরূপ দান করেছিলেন যে সেগুলো বর্ণনায় কয়েক ভল্যুম ইতিহাস রচনা হয়ে যেতে পারে। প্রমানগুলো মাত্র সাম্প্রতিক কয়েক দশকে আবিস্কৃত হয়েছে। শ্রীনগরের বিখ্যাত মন্দিরের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন থেকে এই গুপ্ত কথা জানা যায়। আরোও জানা যায় পেশোয়ায় যে মন্দির তার সৈন্যদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল তার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত ছিলেন। তিনি মন্দিরের মূর্তিগুলি সরকারি টাকায় রক্ষা করেছিলেন। তামিলনাড়ুর কাঞ্জিভরম মন্দির সম্পন্ন করার জন্য দিয়েছিলেন ১০,০০০ হানস (নগদ টাকা) এবং যখন মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তখন তিনি রথযাত্রায় যোগদানও করেছিলেন। এক সময় মেলকট মন্দিরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠলে তিনি তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন। উভয় সম্প্রদায় তার রায় মেনে নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তিনি যে রায় দিয়েছিলেন তা মেনেও নেয় তারা। তার

ঐতিহাসিক দিন্দুগুল অভিযানে সতর্কতা স্বরূপ সৈন্যদের আদেশ দেন, রাজার মন্দির যেখানে অবস্থান করছে তা যেন আক্রান্ত না হয়। পুরান কানাড়া সাহিত্যে এখনও টিপু সুলতানের বীরত্ব ও ভালবাসার কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সিবি মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে রচিত টিপু সুলতানের অনেক প্রশংসাই রয়েছে। পুরান মইশূরে আজও ধ্বনিত হয় ব্যালড-গাঁথা যা স্মরণ করায় টিপু সুলতানকে। বাস্তব ঘটনা হল প্রচার গাত্রে- এ সকল গাঁথা খোদিত হয়েছিল টিপু সুলতানের শহিদ হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পরে। এগুলো থেকে বোঝা যায় জন সাধারণ তাকে কতই না ভালবাসত।

একজন শাসকের মৃতদেহকে শ্রদ্ধা জানাতে সেই সব হিন্দু প্রজারা এসেছিলেন যারা তার অবজ্ঞা করেছিলেন। তারাতো নিজেরাই বুঝতে পেরেছিলেন টিপু সুলতানের সম্মান পাওয়ার যোগ্যতাকে। এসব ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। যখন তার রক্তাক্ত দেহ আনা হয়েছিল, তাকে সম্মান জানাতে হিন্দু প্রজাদের বিশাল ভিড় জমে গিয়েছিল। অপর পক্ষে ইংরেজ সৈন্যরা তার প্রাসাদ লুঠের কাজে ব্যস্ত ছিল। হিন্দু প্রজাদের বিলাপ রোল আজও ইতিহাসের পাতা সিক্ত করে। এরকম এক শাসককে ধর্মীয় গোঁড়ামির কাঠ গোড়ায় দাঁড় করানো এক জঘন্য ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। (Beatson 1880 quoted by Md. Moienuddin, Sunset at Srirangapatnam, Orient Longman, 2000).

মানব হিতৈষী কাজে টিপু সুলতান

টিপু সুলতান ছিলেন মানবিকতার এক মূর্ত প্রতীক, এ চিত্র সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে "Tipu Sultan A secular Ruler" নামে এক প্রবন্ধে, এটি লিখেছেন প্রফেসর বি. শেখ আলি যিনি প্রাক্তন ম্যাঙ্গালোরের গোয়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

"টিপুর সতের বছরের শাসনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল তার দেশীয় নীতি। তিনি বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন ব্যবসা বানিজ্য ও

শিল্পকলার উপরে। তার শাসনে এসেছিল অসাধারণ দক্ষতার ছাপ। তার কাজ ছাড়িয়ে পড়েছিল শিল্প থেকে নৌবহরে। ব্যবসা ও শিল্পের উপর ছিল তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ। তিনি নির্মান করেছিলেন অস্ত্রকারখানা, কাঁচ কারখানা, চিনি কারখানা, মৃত শিল্প ইত্যাদি। সাহার গঞ্জাম হয়ে উঠেছিল একটি শিল্প হাব অঞ্চল যেখানে কাপড় ও কাগজের কারখানা প্রচুর পরিমাণে স্থান পায়। তিনি দেশ বিদেশ উভয় স্থানেই ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তুলে ছিলেন। মানকাট, জেদ্দা, বসরা এবং পেগুতে তার বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। সমুদ্র পথ দিয়ে বাণিজ্য চলত চন্দনকাঠ, রেশম, গোলমরিচ ও হাতির দাঁতের দ্রব্যাদির। ভাটকল, ম্যাঙ্গালোর, ও হনাভার ছিল তার শাসন আমলের বিখ্যাত বিখ্যাত বন্দর। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি একবারে বাধ্য করেছিলেন। তার সাম্রাজ্যে কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ডাক বিভাগও খুব উন্নত পরিষেবা দিত। কাবেরী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের কথা তিনিই প্রথম ভেবেছিলেন। সেচ ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর তিনিই গেঁথে ছিলেন। তার এই বৃহত্তর প্রকল্পের নাম ছিল 'সাদ-ই-মোহি'। পরবর্তীতে স্যার এম. বিশ্বেসরা কাবেরীর ঐ একই দিকে বাঁধ নির্মান করেছিলেন। এই বাঁধের প্রধান গেটে ইংরেজি ও পার্সি ভাষায় লেখা আছে 'আমি এর শুরু করলাম কিন্তু এর সমাপ্তি আল্লাহর হাতে'। দরিদ্র কৃষক, শিল্পী সবাইকে তিনি কাজের জন্য উৎসাহ দিতেন। এমনকি তারা সুলতানের কাছ থেকে লোনও পেতেন। পড়ে থাকা ভূমিও চাষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন কৃষকেরা। কৃষকেরা বছরে যা ফসল ফলাত তার চার ভাগের এক ভাগ খাজনা স্বরূপ প্রদান করত। কোন বছরে ফসলহানি ঘটলে কৃষকেরা ট্যাক্স থেকে রেহাই পেতেন। তার শাসন আমলে রেশম শিল্পে প্রসার ঘটেছিল। এমনকি কুড়িটি রেশম ফার্ম তিনি গড়ে তুলেছিলেন। বন্দীদের বিচারে তিনি অভুতপূর্ব এক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বন্দীদের জরিমানা স্বরূপ তিনি তাদের ফলবান বৃক্ষ উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে ছিলেন। দুর্নীতিগ্রস্থ আধিকারিক ও সমাজ বিরোধীদের দমনের জন্য তিনি অতিশয় কঠোর ছিলেন। সামাজিক সংস্কারে তিনি যে সকল কাজ করেছিলেন তার মধ্যে মদ, জুয়া, তামাক জাতিয় দ্রব্যাদি, দাস দাসী বেচাকেনা দাসত্বলোপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রতিটি স্তরে তার সংস্কার

মূলক কাজ পরিলক্ষিত হয়। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পঞ্জিকা সংস্করণ, নৌবিভাগে উন্নয়ন, রেভিনিউ বিভাগের উন্নতি প্রভৃতি কাজ খুবই প্রসার লাভ করেছিল তখন। মূদ্রা ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত। সাধারণভাবে মূদ্রা গুলোতে শিব, পার্বতী, সারদা উদাপি কৃষ্ণের মূর্ত্তি খোদিত থাকত। ফার্সিভাষা ও কানাড়া ভাষায় মুদ্রাগুলিতে সংখ্যা লেখা হত।

তার শাসন আমলে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কিছু অসামাজিক প্রথা বিদ্যমান ছিল, যেমন বিশেষ বিশেষ উৎসবে নরবলি, মহিলাদের স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের সাথে জীবনযাপন, স্বল্প নোংরা পোষাক পরিধান প্রভৃতি। টিপু সুলতান এসকল অসামাজিক প্রথা দমন করতে শক্ত হাতে এগিয়ে এসেছিলেন বিশেষ ফরমান জারি করে। আর এ সকল সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি তার প্রজাদের মন জয় করতে পেরেছিলেন। অবশ্য কিছু নিন্দুক তার এই সংস্কারগুলিকে তাদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ বলে অপবাদ দিয়েছেন। তার নানাবিধ কৃতিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জনৈক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন,

> "No wonder that among the multitudinous crowned heads that crowd the alley-ways of Indian history, Tipu's proud head stands out most prominently as a lodestar'.

"ভারতীয় ইতিহাসে যে সকল জনপ্রিয় রাজারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে টিপু সুলতানের নাম ধ্রুব তারার মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে"। টিপু সুলতান ছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী। যোগ্য শাসক এবং, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারক।

বিখ্যাত ভারতীয় বাঙালী ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার টিপু সুলতানের ভূয়ষী প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "Tipu Sultan was a great freedom fighter, an able adminstrator and innovator in social economic and

political sectors"

টিপু সুলতানের সাফল্যের যদি চাক্ষুষ প্রমান পেতে চাই তাহলে Edward Moore -এর লেখা পড়া দরকার। Edward Moore টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে তৃতীয় মইশূর যুদ্ধে এসেছিলেন। টিপুর শাসন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী বাস্তব বিবরণ তার কাছ থেকেই জানা যায়। তিনি লিখেছেন,

> "When a person travelling through a strange country finds it well cultivated, populous with industrious inhabitants, towns increasing and everything flourishing so as to indicate happinesss, he will naturally conclude to be under a form of Government congenial to the minds of the people... This is a picture of Tipu's country, and this is our conclusion in respect of its Government."

"যখন কোন ব্যক্তি কোন দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখবে সেই দেশের চাষাবাদ উন্নত, শিল্প উন্নত, শহর নগর সুসজ্জিত ভাবে গঠিত, বাণিজ্যের বিস্তৃতি নগরগুলো মানুষের জীবনের সুখ সমৃদ্ধির নির্দেশক তখন যে স্বাভাবিকভাবে এটাই সিদ্ধান্ত নেবে যে এই দেশের সরকার প্রজাসাধারণের হিতাকাঙ্খী। এটাই হল টিপু সুলতানের দেশের ছবি। এবং সেজন্যই আমাদের সিদ্ধান্ত এ সরকার ছিল শ্রদ্ধার পাত্র"।

‘ তালাক ’ – বিবাহ বিচ্ছেদ

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুলির মধ্যে ইসলামই সর্বপ্রথম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়মকে সহজ, সরল ও সুন্দর করেছে। কুরআনের নিয়ম অনুযায়ী একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক পবিত্র সমাজিক চুক্তির মধ্য দিয়েই বিবাহ সম্পন্ন হয়। সমাজের বেশ কিছু উপস্থিত ব্যক্তির কাছে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করে। ব্যক্তিগত ভাবে উভয় পক্ষের একটি চুক্তি বা সন্ধী হল বিবাহ। দুজন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে তাদের এই চুক্তিকে। আর সেখানে উপস্থিত কাজি সাহেব কুরআন হাদীস থেকে বিবাহের গুরুত্ব ও দাম্পত্যজীবনের দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন। পরে এই চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়। মুসলিম বিবাহ এরকমই সহজ সরল। সমাজের সকলের দ্বারা চুক্তিটি স্বীকৃত হয় এবং অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কিন্তু ইসলাম মানব মনের দুর্বলতা অনুভব করে। ভবিষ্যত জীবনে দুজনের মধ্যে কোন রকম অসামঞ্জস্য আসতে পারে তাই তাদের জীবন বিছিন্ন করে বেঁচে থাকার পথ ইসলাম প্রদান করেছে। যে পদ্ধতিতে তারা পরস্পর পরস্পর থেকে বিছিন্ন হতে পারে তাকে তালাক বলা হয়। যে কারণেই হোক সাধারণ ভাবে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে, কোন পুরুষ যদি ‘তালাক’ শব্দটি তিন বার উচ্চারণ করে তবে স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এই পদ্ধতিটি বর্তমানে এক হাস্য উদ্রেককারী ব্যাপার হিসাবে পরিগণিত হয়। কিছু অজ্ঞাত পরিচিত মৌলভী এমনও ফতওয়া প্রদান করছেন যে তালাক ফোন, মোবাইল, এস.এম.এস প্রভৃতির মাধ্যমেও কার্যকরী হবে। এমনও শোনা গেছে কোন ব্যক্তি নেশার ঘোরে কিংবা স্বপ্নাবস্থায় তালাক শব্দটি তিনবার বললে তালাক কার্যকরি। সত্যি কথা বলতে বলিউড সিনেমা জগৎও এ ধরণের আচরণে আহত হয়।

কিন্তু এটা ভাবার বিষয়। ইসলাম যেখানে মদ্যপ অবস্থায় নামাজ হয়

না বলে ঘোষণা করেছে সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনাকে কিভাবে মদ্যপ অবস্থায় মেনে নিতে পারে। তাই এটা সহজেই বোঝা যায় যে কিছু স্বার্থবাদি গোষ্ঠী ইসলামকে উপহাস করার জন্য এ ধরণের কাজে সহয়তা করে চলেছে। মুসলিম পারিবারিক আইনকে তারা কলুষিত করার জন্য এই তালাকের অপব্যবহার নীতিকে হাতিয়ার হিসাবে সামনে রাখছে। মদ্যপ অবস্থায় যেমন নামাজ হয় না তেমনি বিবাহ বিচ্ছেদও হতে পারে না মদ্যপ অবস্থায়।

এই তালাকের অপব্যাবহার নিয়ে বেশী করে হৈ চৈ ফেলে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির মিডিয়া। প্রথমতঃ মুসলিম বিবাহগুলো এই ধরণের তালাক ব্যবস্থায় খুব কমই পরিণতি লাভ করে যতটা মিডিয়া করে। সাধারণভাবে এই রূপ ফতওয়া আনপোড় মৌলবিদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তৃতীয়তঃ এরকম তালাক সাধারনত অজ্ঞ মুসলিমরা প্রদান করে। যাদের ইসলামী নিয়ম কানুনের কোন জ্ঞান থাকেনা, চটজলদি তারা নিজেদের স্ত্রীদের এভাবে তালাক দিয়ে থাকে। এটা সত্যিই খুব লজ্জার বিষয়। এর ফলে তাদের তেমন শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়না। যার ফলে ইসলামের নামে কলঙ্ক ছড়াতে মিডিয়া গুলো এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে খুবই তৎপরতার সাথে।

ইসলাম এটা মনে করে যে ব্যক্তিগতভাবে একজন নারী ও একজন পুরুষ ভিন্ন মনোভাবের হতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে তারা তাদের মত বদলাতে পারে। ইসলাম যেমন বিয়ের মাধ্যমে দুটি হৃদয় যুক্ত করার ব্যবস্থা রেখেছে, তেমনি একান্ত প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা রেখেছে। সর্বক্ষেত্রে কিন্তু সর্বশক্তিমান মানব স্রষ্টা আল্লাহর বিধানকে সামনে রেখে এ কাজগুলো করতে নির্দেশ এসেছে। সত্যি বলতে যদি এ তালাক ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক যুগলের জীবন নরকে পরিণত হত নিঃসন্দেহে। কেই কাউকে হত্যা করে যেমন এ সমস্যার সমাধান পেতে পারেনা তেমনি আত্ম হত্যাও করা কখনও সমিচিন নয়। ইসলাম কখনই একজন নারী পুরুষকে বেঁধে রাখতে চায়না, যদি তারা নিজেরা বাঁধা থাকতে না চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি উল্টো কিছু অনুভব করে থাকে তাহলে তাদের জোর করে বন্ধনযুক্ত জীবন মোটেই কাম্য

নয়। সেই জন্যই ইসলাম একজন পুরুষ অথবা নারীর জীবনকে বিবাহ বিচ্ছেদ নীতি বা তালাক ব্যবস্থা প্রদান করে যারপরনাই উপকার সাধন করেছে। সমাজে অন্যান্য সম্প্রদায় যাদের মধ্যে তালাক ব্যবস্থা প্রদান করা হয়নি তাদের নারীদের করুন অবস্থা সবাইয়ের জ্ঞাত। নারীরা যে সেখানে অসহায়ভাবে নানান অত্যাচার সহ্য করে চলবে তা নিসন্দেহ। এমনকি অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যুও খুবই সাধারণ ব্যাপার।

অবশ্য ইসলামী এই তালাক ব্যবস্থা কিছু মুসলিম পুরুষদের দ্বারা মারাত্মকভাবে অপব্যবহৃত হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। ইসলাম যে পরিস্থিতি ও যে পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তা মোটেই মানা হচ্ছেনা।

কিন্তু বাস্তবকথা হল তালাক প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কাছে উৎসাহের নয় বরং ঠেকায় সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। কুরআনে তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নবী সাঃ তালাক সম্বন্ধে বলেছেন,

"আল্লাহর কাছে সমস্ত বৈধ কাজের মধ্যে তালাকই সবচেয়ে অপছন্দের।" তালাকের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কুরআন ঘোষণা করেছে,

> "তালাক দু বার। অতঃপর হয় সোজাসুজি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে অথবা সঠিক পন্থায় তাকে বিদায় করে দেবে। বিদায় দেওয়ার সময় এরূপ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয নয় যে, তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু ফিরিয়ে নেবে। অবশ্য এই অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে পারবে না, তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেওয়া যে স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে– কিছুমাত্র দোষনীয় নয়। বস্তুত এটা হল আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা বিশেষ। এটা অতিক্রম করোনা। যারা আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে তারাই যালেম। (অ া ল কুরআন- ২২৯ বাকারা)

"পুরুষ স্ত্রীলোকদের কর্তা, এই কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। এবং এজন্যে যে পুরুষ তার ধন সম্পদ ব্যয় করে। অতএব যারা সৎ মহিলা তারা আনুগত্যপরায়না হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষানাবেক্ষন ও পর্যবেক্ষনের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে। আর যে সকল স্ত্রীদের বিদ্রোহী ভাবধারা সম্পন্না হওয়ার ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা প্রকাশ করবে তাদেরকে তোমরা বোঝাতে চেষ্টা করবে। বিছানায় তাদের হতে দূরে থাক এবং তাদেরকে মারধরও কর। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে শুধুশুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতো তালাশ করনা। নিঃসন্দেহে মনে রেখ যে ওপরে আল্লাহ রয়েছেন যিনি মহা মহিয়ান"। (সূরা নিসা - ৩৪)

"আর কোথাও যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয় তবে একজন শালিশ পুরুষদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্য হতে এবং আর একজন স্ত্রীদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্য হতে নিযুক্ত কর। তারা দুজনেই সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলমিশের অবস্থার সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ"।(সুরা নিসা - ৩৫)

'কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে এটা পরিস্কার হয় যে কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রয়োজন হয়ে পড়লে সেটি বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য কমপক্ষে সাতটি পদক্ষেপ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ পদ্ধতি মেনে চলা হয় না, সাধারণত কাজি সাহেবরা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তিনবার তালাক উচ্চারণ করাকে যথেষ্ট মনে করে।

কিন্তু নবী (সাঃ) এ ধরণের তালাক দেওয়াকে আল্লাহর আইনের সাথে খেল তামাশা বলে অভিহিত করেছেন। নবী (সাঃ) এর সাহাবী হজরত উমার (রাঃ) শাস্তি প্রদান করেছেন এ রকম তালাক প্রদানকারীকে।

খুলা

মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ নেওয়ার অধিকার

ইসলাম পুরুষদের কেবল তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা প্রদান করেনা। নারীরাও বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইনগত পদ্ধতি নিতে পারেন। মুসলিম মহিলারাও কাজির কাছে তার আবেদন পেশ করতে পারেন নিজ স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য। ইসলাম প্রদত্ত এধরনের ব্যবস্থাকে 'খুলা' নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একজন মহিলাকে 'ইদ্দত' বা 'অপেক্ষা কাল' পূরণ করতে হবে। 'ইদ্দত' বা 'অপেক্ষাকাল বলতে বোঝায়, তিন ঋতুকাল' অতিক্রম পর্যন্ত অথবা গর্ভবতী স্ত্রীর সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা বোঝায়। এই সময় একজন স্ত্রী স্বামীর দেওয়া কাছ থেকে খোর পোষ পেতে থাকবে। এই সময়ের মধ্যে তাদের পুনর্মিলনও হতে পারে। কুরআনে পরিস্কারভাবে রসূল (সাঃ) কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

> "হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রী লোকদেরকে তালাক দেবে। তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও আর ইদ্দতের সময় কাল ঠিকভাবে গণনা কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদের প্রভু।(ইদ্দতকালে) না তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর হতে বহিস্কার কর আর না তারা নিজেরা বের হয়ে যাবে' তবে যদি তারা কোন সুস্পষ্ট অন্যায় করে থাকে তবে অন্য কথা এটা আল্লাহর নির্দ্দিষ্ট সীমা। (কুরআন-৬৫:১)

পুরুষদের জন্য কুরআনের সতর্কবার্তা

কুরআন পুরুষদের জন্য সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়েছে যে, কোন পুরুষ যেন তার বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ করার পথে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে। কুরআনের ঘোষনা,

"তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার কাজ সম্পন্ন কর এবং তারাও তাদের নির্দ্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করে নেয় তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়োনা। যখন তারা সঠিক ও প্রচলিত পন্থায় পরস্পরে বিবাহিত হতে রাজী হয়েছে। তোমাদেরকে এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা কখনই এরূপ কাজ করবেনা। যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। তবে তোমাদের পক্ষে সুষ্ঠ ও পবিত্র কর্মনীতি এ হতে পারে যে, তোমরা এ ধরণের কাজ হতে বিরত থাকবে। বস্তুত আল্লাহই জানে যা তোমরা জাননা।

(কুরআন - ২:৩২)

ফতওয়া

ইসলাম ধর্মতত্ত্বের আইনগত রূপকে ফতওয়া বলা হয়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে লোকেরা এটা মনে করে যে ধর্মীয় শাসকদের এটি একটি চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশনামা। একে লঙ্ঘন করা যায়না। কিন্তু বাস্তব কথা হল বেশীরভাগ সাধারণ মুসলিম কোন ধর্মীয় বুদ্ধিজীবির কাছে কোন বিষয়ের ইসলামী নীতি কি তা জানতে চায় না।

এমনকি ন্যায় বিচারের সাথে ফতওয়া অনেকটা অসামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়। অদ্ভূত ধরণের খাপ ছাড়াও মনে হয় এগুলোকে। কিন্তু মিডিয়া এগুলো হাতছাড়া করেনা। নানান সত্য মিথ্যা এর মধ্যে জড়িয়ে ইসলাম ধর্মের উপর একটা বাঁকা দৃষ্টির পরিবেশ গড়ে দেয়। কোন একটা বিষয়ের উপর হাজার হাজার মাদ্রাসার একাধিক মতামত থাকতেই পারে। আর এগুলোকে একত্রিত করে মিডিয়া মুখরোচক গল্প ফাঁদানোর কলাকুশলতা দেখায়। ফতওয়া শাসন তান্ত্রিক নির্দেশ নামা নয় বরং শাসনতান্ত্রিক মতামত। Shorter Encyclopedia of Islam ফতওয়ার সংগা দিয়েছে নীচের ভাষায়।

> "A formal legal opinion given by a mufti, or canon lawyer of standing, in answer to a question submitted to him either by a judge or private individual'.
>
> "কোন বিচারক কিংবা কোন ব্যক্তি যখন কোন পদে থাকা মুফতি বা আইনজ্ঞকে প্রশ্ন করে তখন তারা উত্তরে যে সাধারণ বৈধ মতামত পেশ করেন তা হল ফতওয়া"

ফতওয়ার ব্যাপারটা আসলে একটি বৈধ সাধারণ মতামত। এটা মোটেই চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যতা নয়। এটাকে কেউ মানতে পারে আবার নাও পারে। ব্যক্তির এটা প্রত্যাখ্যান করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ফতওয়া দিয়ে থাকেন তারা কখনই কাউকে এটা মানতে বাধ্য করেন না। তারা নিজেরাই বলে থাকেন "এটা আপনারা মানবেন কি মানবেন না সেটা আপনাদের নিজেদের ব্যাপার"

অনেক সময় অবশ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন ফতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে অনেকের দ্বারা এবং তা কার্যকরী হওয়ার জন্য গোঁ পেতে বসে থাকেন। এমনই এক ফতওয়া ছিল আয়াতুল্লাহ খোমেনীর। রুশদীর বিরুদ্ধে এরকম ফতওয়া তিনি প্রদান করেছিলেন। ১৯৮৯ সালের মার্চে এক ইসলামী কনফারেন্সে ৪৫টি মুসলিম দেশের সদস্যদের মধ্যে ৪৪ জন সদস্য খোমেনীর এই ফতওয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সৌদি আরবের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখগণ ও আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইসলামী বুদ্ধিজীবিগণও এর বিরোধীতা করেছিলেন সমানভাবে। কারণ মুসলিম আইন কখনই একজনের বিচার না করে শাস্তির কাঠগোড়ায় কাউকে তোলে না। কিন্তু এই সত্যটা কেবল 'আন্তর্জাতিক মিডিয়া জেনেছিল। কিন্তু ঢালাওভাবে সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে সকলকে জানানো হয়নি ইসলামের শান্তির বাণীকে। বরং বেশীরভাগ মানুষ জেনেছে যে রুশদীর রক্তপানের জন্য সারা বিশ্বের মুসলিমরা উদগ্রীব। এইভাবেই সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে মিথ্যার ঢাক বেজেই চলে। সারা বিশ্বের মানুষ এর ফলে ভেবে বসেছিল কি মারাত্মক ইসলাম রে বাবা!

কুফর ও কাফির

কাফির শব্দটির বিরুদ্ধেও আপত্তি উঠেছে। বেশ কিছু মিডিয়া জন সাধারণকে এভাবে বোঝাচ্ছে যে 'কাফির' শব্দটা মুসলমানদের একটা 'গালি গালাজ' বিশেষ, যা অমুসলিমদের দেওয়া হয়ে থাকে। অথবা অমুসলিদের অপদস্থ ও বিদ্রুপ করার জন্য এক হীন শব্দ। এই শব্দটিরও ভুল ব্যাখা জন সাধারণের কাছে অহরহ প্রচার করা হচ্ছে।

'কাফির' শব্দটি মূল শব্দ 'কুফর' থেকে এসেছে। কুফর শব্দটির অর্থ 'ঢাকা দেওয়া' অথবা 'লুকিয়ে রাখা' রাত্রিকে কাফির বলা হয় কারণ এটি দৃশ্যমান সমস্ত জিনিসকে অন্ধকারে ঢাকা দেয়। ঘনীভুত মেঘমালা 'কাফির' যেহেতু এটি দিনের আলো ও সূর্যকে ঢেকে দেয়।

তাই এখানে 'কাফির' ও কাফের' শব্দটি নিয়ে নেতিবাচক কোন মন্তব্য করা চলেনা। তাই অমুসলিম ও কাফির শব্দটা এক নয়। ধর্মীয় পরিভাষায় কাফির শব্দটি মানে কোন কিছুকে অস্বীকার করা। তাই ব্যাপক আকারে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের কাছে 'কাফির', সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী পরস্পর পরস্পরের কাছে কাফির', অবশ্য ইসলামী পরিভাষায় কাফিরের অর্থ ব্যাপক। ইসলামী পরিভাষায় কাফির হল তারাই যারা এক আল্লাহর উপাসনা করেনা। আপরদিকে যারা এক আল্লাহকেই মেনে থাকে সর্বক্ষেত্রে তারাই হল 'ইমানদার বা বিশ্বসী'। কাফির মানে অস্বীকার কারী, কিন্তু তাই বলে কোন গালি নয়। মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে এ স্বাধীনতা দান করেছেন তার কাফির অথবা বিশ্বাসী হওয়ার জন্য। কুরআনের ঘোষনা।

> "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই প্রকৃত সত্য নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা থেকে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। এবং আল্লাহ সব কিছু শ্রবন করেন ও জানেন। (কুরআন - ২:২৫৬)

তাই এখানে এটা পরিস্কার যে যারা বিশ্বাসী তাদের কোন রকম অধিকার নেই অবিশ্বসীদের বিদ্রুপ করার।

মুসলিমরা আমিষ আহারি কেন?

মানুষ মূলত! দুটি উৎস থেকে খাবার সংগ্রহ করে থাকে। প্রথমত উদ্ভিদ জগৎ থেকে– যেমন ফলমূল, দানাশষ্য, শাক-সব্জি প্রভৃতি। অপর দিকে প্রাণী জগৎ থেকে– যেমন মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি। যারা তাদের খাদ্য উৎস কেবল উদ্ভিদ জগৎ থেকে সংগ্রহ করে তাদের বলে ভেজিটেরিয়ান বা শাকাহারি এবং যারা প্রাণীজগতের উপর নির্ভর করে প্রাণ ধারণ করে থাকে তাদের বলা হয় আমিশহারি। কিছু ভেজিটেরিয়ান এমন আছে যারা প্রাণী উৎপাদিত যেমন দুধ, ঘি, মধু ডিম-কোন কিছুই খায়না এদের বলা হয় - ভেজান।

বর্তমানে ভেজান ও ভেজিটেরিয়ান উভয়ে মিলে সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। তারা মূলতঃ প্রাণীদের হত্যা বা কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতি নন। এই দর্শনের উপর নির্ভর করে প্রাণীদের কাছ থেকে কোন প্রকার সুবিধা তারা নিতে চায়না।

ইহুদি ও খৃস্টান ধর্মের মত ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি অনেকটা গ্রাম্য ও ভ্রাম্যমান পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে। এদের পূর্ব পুরুষেরা সবাই প্রায় পশুপালক ছিলেন। এদের নবীরাও পশুপালনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রেখেছিল। প্যালেস্টাইনের আশেপাশের সমস্ত এলাকা ছিল রুক্ষ প্রকৃতির এবং বেশীরভাগ মানুষ পশুপালনকে তাদের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। যে জন্য প্রাণীজ প্রোটিন থেকে জীবন ধারণের প্রবনতা এই তিনটি ধর্মের মানুষদের মধ্যে ঐতিহ্যগত ভাবে চলে আসছে। কিন্তু এর দ্বারা এটা বোঝা যায়না যে এই তিনটি ধর্মের বিশ্বাসগত কোন বৈশিষ্ট রয়েছে যাতে করে প্রাণী হত্যা করে তার থেকে খাদ্যগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে না থাকলেও জনসাধারণকে এরকমটাই বোঝানো হয়।

পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষই খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যাকে অনুমোদন দেয়। তারা কখনই এটা মনে করেনা যে এটা অপরাধ। অবশ্য বেশ কিছু মানুষ এটাকে নিষ্ঠুরতা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু খাদ্যাভ্যাসের এই

আচরণকে কোন সময় নিষ্ঠুরতা বলা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় নিরামিশ আহারীর দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। অপরপক্ষে আমিশ আহারী ব্যক্তির মধ্যে যথেষ্ট দয়া রয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে উদ্ভিদজগতেরও প্রাণ রয়েছে। তাছাড়া তারাও নানা রকম উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরও সুখ দুঃখ রয়েছে। তারা সঙ্গীত সূরও অনুভব করে থাকে। এমনকি বৃষ্টির জলের জন্য কাতর আবেদন করে থাকে। আমেরিকার কৃষি খামারে এমনই এক যন্ত্র 'আবিস্কার হয়েছে যা দ্বারা ফসলের জল চাহিদার আবেদন ধরা পড়ে। তাই এর সাহায্যে সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

ইসলাম এটা বিশ্বাস করে যে এ বিশ্বে সমস্ত কিছুই মানুষের জন্য বৈধ। কিন্তু তা বলে যথেচ্ছ নয়। প্রকৃতির সমস্ত উপাদন সে ব্যবহার করতে পারলেও তার একটা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কোন কিছুই অপব্যবহার করা চলবেনা। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'Sustainable' বলা হয় অর্থাৎ কোন কিছু ব্যবহার করা যা প্রাকৃতিক নিয়মে আবার পূর্ণ হয়ে যায়।

ইসলামী দর্শন এটাই মানুষকে বোঝায় যে এ বিশ্ব প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার একটি কণাও কারোর নয় বরং সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক করে মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই মানুষকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রকৃতির সম্পদ ব্যবহার করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে এগুলোর ব্যবহারের হিসাব নিকাস বুঝিয়ে দিতে হবে। কোন রকম এদিক ওদিক করলে হবে না। কুরআনের ঘোষণা,

> "হে ইমানদারগণ! চুক্তি সমূহ যথাযথভাবে পালন কর। তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরণের সমস্ত জন্তুকেই হালাল করা হয়েছে, সে সব বাদে যা একটু পরেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। (আল কুরআন - ৫:১)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> "আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মধ্যেও এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে– তাদের গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা হতে একটি জিনিস (দুধ) আমরা তোমাদের পান করাই আর তোমাদের জন্য তাতে অন্যান্য বহু রকমের উপকারিতা নিহিত রয়েছে যা তোমরা খাও" (আল কুরআন - ২৩:২১)

বর্তমানে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করেছেন যে মাংস অথবা প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যে এমন আট ধরণের অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে যা শরীর গঠনের জন্য বিশেষ সহায়ক। তাই খাদ্য তালিকায় মাংসের স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া মাংসে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন বি-১ এবং নায়াসিন। কেবলমাত্র উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যের প্রোটিনের মাত্রা প্রয়োজনানুসারে সরবরাহ হয় না। তাই প্রোটিনের অভাবে অ্যাণিমিয়া দেখা দিতে পারে। আর আমাদের ভারতীয় জনগণের মধ্যে এ সমস্যা ব্যাপক।

এমনকি মানুষের মুখের দাঁত কপাটির গঠনগত বৈশিষ্ট দুধরণের খাদ্য গ্রহণকে সমর্থন করে। কামড়ে খাওয়া ও চিবিয়ে খাওয়া দুটোই সম্পন্ন করতে পারে মানুষ। তাই মানুষের খাদ্য যেমনভাবে মাংসাশী হতে পারে তেমনি শাকাশীও হতে পারে। অপর পক্ষে তৃনভোজী গবাদি পশুদের সমস্ত দাঁতের গঠন চ্যাপ্টা যা চেবানোর জন্য সহায়ক। আবার মাংসাশী প্রাণীদের দাঁতগুলি ছেদক ধরণের যা মাংস খাওয়ার একান্ত উপোযোগী। সব কিছু বিশ্লেষণ করে তাই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মানুষের খাদ্য দু-ধরণের হতে পারে। একদিকে মানুষ উদ্ভীজ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে অপর দিকে প্রাণীজ খাদ্যও তার প্রয়োজন। মানুষের পরিপাক যন্ত্রের গঠন ও কাজ উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ ও হজম করার প্রকৌশলে গঠিত। তাই মুসলমানেরা মাংস খায়, অতএব তারা হিংস্র একথা মোটেই সঠিক নয়।

হালাল এবং হারাম

ইসলাম মানুষের জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে বাঁধার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনামা পেশ করে থাকে। যে সকল বস্তু খাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় এবং যে সকল আচরণ সম্পাদন করার অনুমতি পাওয়া যায় সেই সমস্ত কিছুকেই 'হালাল' বলা হয়। ঠিক বিপরীতভাবে যে সকল জিনিসে অনুমতি মেলেনা তাকে 'হারাম' বলা হয়। অবশ্য এই অনুমতি পাওয়া আর না পাওয়াটা আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে হতে হবে। হারাম খাওয়া, হারাম পরা, হারাম আচরণ করা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। আল্লাহর অনুমতি না পেয়ে কোন কাজ সম্পাদিত করলে তা পাপ বলে গণ্য। সমস্ত মুসলিমদের পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা দরকার। যেমন সূদ, ঘুস, জুয়া, শূকর মাংস, নেশা জাতীয় সমস্ত বস্তুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। তাই এগুলো কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়।

পরিধানের ক্ষেত্রে মুসলিম পুরুষদের সোনা ও রেশম বস্ত্র পরতে নিষেধ করা হয়েছে তাই এগুলো হারাম। পাতলা ফিনফিনে পোষাক যা অশালীন পোষাকও হারাম। অবশ্য রেশম অন্যান্য তন্তুর সাথে মিশিয়ে ব্যবহৃত হলে তা পরা যেতে পারে। হালাল ও হারামের পরিধি আচরণ ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হতে পারে। একজন মুসলিমের উপার্জন কখনও চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, ঘুস, জালিয়াতি প্রভৃতির মাধ্যমে হতে পারেনা। একজন মুসলিম ব্যভিচার অশালীন আচরণ থেকে সব সময় দূরে থাকবেন। একজন মুসলিম কোন সময় পরচর্চায় সময় কাটাবেন না। মানুষকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, অসম্মানিত করা বড় ধরণের অপরাধ বলে একজন মুসলিম সব সময় এগুলো এড়িয়ে চলবেন।

হালাল

পশু হত্যার ইসলামী আচরণ বিধি

ইহুদিদের মত মুসলিমরা খাদ্যের জন্য পশু হত্যার অনুমতি পেয়েছে। আর এ জন্য পশুটিকে জবেহ করতে হয়। গলার পাশে দুটি রক্তশিরা, খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী জবেহ প্রকৃয়ায় কেটে দেওয়া হয়। দুটি রক্ত শিরা কাটার ফলে দ্রুত রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে যায় এবং পশুটি দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাছাড়া এখানের শিরা কাটার ফলে দেহের রক্ত জমে যায়না বরং তা স্ববেগে প্রবাহিত হতে পারে। যখন এই জবেহ প্রকৃয়া মুসলিমদের দ্বারা হয়ে থাকে তখন পশুটির মাংস হালাল হয়। অন্যান্য মুসলিমদের খাওয়ার জন্য এতে কোন অসুবিধা থাকেনা।

ইসলামে ও ইহুদি ধর্মে পশুর গলার নিচের দিক থেকে কাটার নির্দেশ রয়েছে। উপরের দিক থেকে নয়। এর ফলে মস্তিস্কের সাথে দেহের বিচ্ছিন্নতা আকস্মিকভাবে ঘটেনা। সেজন্য দেহের কোন অংশে রক্ত জমা থেকে যেতে পারেনা। রক্তমুক্ত মাংস স্বাস্থ্যকর এবং বেশীক্ষন তাজা থাকে। এই পদ্ধতিতে শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী আগে কাটা পড়লেও ড্রোসাল নার্ভ কর্ড শরীরের সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাজ করে। আর যখন জবেহ করার পর পশুটি সম্পূর্ণভাবে নিস্তেজ হয় এবং সমস্ত রক্ত বেরিয়ে যায় তখনই পশুটিকে মাংসের জন্য কাটা হয়ে থাকে।

রক্তের মধ্যেই নানা রকম ব্যকটেরিয়ার বাসা থাকে। তাছাড়া নানারকম জীবানু ও বিষাক্ত পদার্থও থেকে থাকে এই রক্তে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় কোন পশুর মাংস মুসলিমদের যবেহ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যতটা স্বাস্থ্য সম্মত, উপকারি ও সুস্বাদু হয় অন্য পদ্ধতিতে কাটা মাংসে তা পাওয়া যায়না।

জুয়া ও মদ হারাম

কুরআন অতি গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদের জন্য জুয়া ও মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মদ মানুষের বুদ্ধিলোপ করে সেই সাথে সমাজের অনেক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ড্রাগ মূলত অ্যালকোহল, সমাজের বড় বড় ব্যাধির উৎস, মদ্যপ অবস্থায় যানবাহন চালানোর ফলেই মারাত্মক মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় পরিবারে স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা সন্তান সন্ততির মধ্যে কলহ বিবাদ ঘটে থাকে। পরিণামে খুন জখম বধূ হত্যা, আত্মহত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অন্যায় কাজ ঘটে থাকে। আমেরিকায় মদের ঠেক, মদের দোকান যেন সাধারণ দোকানদারির মত গড়ে উঠেছে যত্রতত্র। কুরআন মদ, জুয়া এবং এ ধরণের অন্যান্য কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য নিচের ভাষণ প্রয়োগ করেছে। কুরআনের ঘোষণা,

> "হে ইমানদার লোকেরা মদ, জুয়া এবং আস্তানা ও পাশা এসব অপবিত্র শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (কুরাআন– ৫:৯০)

মদের প্রতি আসক্তি কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকে ও সমাজকে নষ্ট করেনা অর্থের অপচয়ও ঘটিয়ে থাকে ব্যাপাকভাবে। মদাসক্ত ব্যক্তিরা মদের নেশায় বেশী পরিমানে কামুক হয়ে পড়ে। তাই সাধারণত মদাসক্ত লোকেরা পতিতালয়ে গমনে অভ্যস্থ হয়। ধর্ষণ ও খুন মদাসক্ত ব্যক্তিরাই বেশী পরিমানে করে থাকে।

জুয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে কোন প্রকার লাভ হয় না বরং এতে ক্ষতিই বেশী হয়ে থাকে। জুয়ার ফলে পারিবারিক আর্থিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে খুব সহজেই। জুয়া বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। কখনো ঘোড় দৌড়, কখনও খেলাধূলায় হারজিতের উপর, লটারি ধরা, কখনও ভবিষ্যতের ঘটনার উপর বাজি বা জুয়া ধরা হয়ে থাকে। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে সব ধরণের জুয়াই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। জুয়ার ফলে পুরো সমাজই কর্ম ক্ষমতা হারায়। মানুষ কর্মহীন হয়ে হাত পা গুটিয়ে

ভাগ্যের তালাশ করে।

সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটি বড় ধরণের উপাদান। কোন ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে এধরণের অন্যায় কাজে যুক্ত হয়ে পড়লে পরে তাকে এ ব্যাধির হাত থেকে বাঁচানো সত্যিই খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কখন কখন ভাগ্য তাদের প্রসন্ন হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জুয়া তাদেরকে সর্বশান্ত করে ছাড়ে।

National Crime Victimization Survey Bureau of Justice নামের এক সংস্থা একটি পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখেছে যে ১৯৯৬ সালে গড়ে প্রতিদিন আমেরিকায় ২৭১৩ জন ধর্ষণের শিকার হয় বর্তমানে এ চিত্র যে কি বিশাল আকার ধারণ করেছে তাতো আমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি।

ধর্ষণ বা যৌন সন্ত্রাস

ইসলামে ধর্ষণ কোন স্বতন্ত্র পাপ বলে চিহ্নিত হয়নি। তাই এর শাস্তি বিধানে কিছুটা মতানৈক্য বিদ্যমান। কিছু মানুষ ব্যাভিচার কে ধর্ষণ হিসাবে ভুল বুঝেছেন। আসলে ধর্ষণ 'হিরাবা' স্বরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত যা কিনা ভয়াবহ।

'হিরাবা' মানে কিছু মানুষের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে অন্য মানুষের জানমাল লুট করার জন্য বসে থাকা। যা কিনা বলপূর্বক ভাবে সবার সামনে ঘটে থাকে। এখানে বিশেষত অর্থ লুট করে নেওয়ার প্রসঙ্গটা আগে আসে কেননা 'হিরাবা কথাটার সাথে ডাকাতির সহযোগ রয়েছে। কিন্তু এই লুঠেরা অন্যকে ধর্ষণ করার ভয়ও দেখিয়ে থাকে।

ইসলামে বড় বড় পাপের মধ্যে মারাত্মক উল্লেখযোগ্য পাপ হল 'হিরাবা' কুরআন হাদীস কড়াকড়িভাবে এধরনের পাপকে নিষেধ করে। আল্লাহ কুরআনে এধরণের পাপের শাস্তি বর্ণনা করেছেন–

> "যারা আল্লাহ এবং তার রসূলের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো। অথবা তাদের হাত পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা। কিংবা দেশ হতে বহিস্কার করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর চেয়েও কাঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

কিন্তু যারা তওবা করবে (তারা বাঁচবে) তাদের উপর তোমাদের অধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল"। (আল কুরআন – ৫:৩৩-৩৪)

ইসলামী শরিয়তে ধর্ষণ ও ব্যাভিচারের মধ্যে পার্থক্য

প্রাথমিক যুগের ইসলামী পণ্ডিতবর্গ বিশেষ করে আল দাসুকি এবং মহা বিচারক ইবন আল আরাবি ধর্ষণ কে ব্যভিচারের অপরাধ হিসাবে না দেখে বরং তার চেয়ে বড় ধরনের অপরাধ 'হিরাবা' বা সন্ত্রাস হিসাবে দেখেছেন। ইবনুল আরাবি তার রায় প্রদান দিয়ে একটি দলের বর্ণনা করেছেন যাদের মধ্যে একজন নারী ছিল এবং সে ধর্ষিত হয়েছিল। অন্যান্যরা অবশ্য এ ধরণের ঘটনাকে 'হিরাবা' বা সন্ত্রাসের পর্যায়ে ফেলতে চাননি কারণ এখানে কোন অর্থ সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি এবং অস্ত্রসস্ত্রও ব্যবহৃত হয়না। আল আরাবি বিরুদ্ধ বাদীদের মত খন্ডন করতে গিয়ে যুক্তি পেশ করে বলেছেন যে এটা 'হিরাবা' বা সন্ত্রাস কারণ কোন মহিলা তার অর্থ সম্পদের চেয়ে ইজ্জত সম্মান রক্ষা করার জন্য বেশী তৎপর। আল আরাবির যুক্তিটাই বেশী গ্রহন যোগ্য।

এইভাবে ধর্ষণ প্রকৃতপক্ষে 'সন্ত্রাস'। এ ধরণের অপরাধ প্রমান করার জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্তি কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট সেই সঙ্গে অবস্থার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। সব কিছু মিলিয়ে ধর্ষনের শাস্তি প্রদান ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। কেননা এখানে অপরাধির প্রাণদণ্ডের প্রশ্ন রয়েছে। যদি ধর্ষণে অভিযুক্ত কোন অপরাধি এটা প্রমান করতে পারে যে মহিলাটির এতে কোন প্রকার সম্মতি ছিল তা হলে এটি ধর্ষণ না হয়ে ব্যভিচারের পর্যায়ে পড়বে। সেই মত উভয়ের শাস্তি কার্যকরী হবে। কিংবা অভিযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি যদি এ ধরণের কাজ করতে বাধ্য হয় তাহলে তার শাস্তি মকুব হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম দেশ

একটা বড় ধরণের ভুল ধারণা আমাদের সবাইয়ের রয়েছে, তা হল মুসলিম দেশ হল এমন জায়গা যেখানে ব্যক্তিগত ও সরকারী উভয় জীবনেই ইসলামী শাসন মানা হয়। সে জন্য মুসলিম দেশ মানেই ইসলামের পূর্ণ বিকাশ এরকমটাই ভাবা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটা মোটেই ঠিক নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা সত্য হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটি ভ্রান্ত।

অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিটি মুসলিম দেশ একটা দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে ঐ দেশটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ পেতে পারে। যেখানে ইসলামী আইন বা শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকারী ক্ষমতা ইসলামী নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত হবে।

বর্তমানে বেশ কিছু দেশ নিজেদেরকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। এবং সেখানে শরিয়তী নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণ ইসলামী শরিয়ত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে ঐ দেশগুলিতে। বিশেষত শাস্তি প্রদান ও মহিলাদের উন্নয়নের ব্যাপারে ইসলামী শরিয়তের বাস্তবায়ন পিছিয়ে রয়েছে। ইসলামে 'হুদুদ' অঙ্গচ্ছেদ বা বেত্রাঘাত দেওয়ার মত কঠোর আইন গুলো বিজ্ঞাপনের মত ব্যবহার করা হয়। আইন গুলো কেবল বাইরে বজায় থাকলেও এগুলো একেবারে চরম অবস্থাতে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল স্বঘোষিত ইসলামী রাষ্ট্রগুলো সত্য অমান্য করার যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। মুসলিম দেশগুলির বেশীরভাগ দেশ কঠোর অত্যাচারী স্বৈরাচারী, শাসনের অন্তর্ভূক্ত। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও কঠোর। সাদ্দাম শাসন এরকমই ছিল। আল জিরিয়া, সিরিয়া, জর্ডান, পাকিস্তানের মত অল্প কয়েকটি দেশের দিকে নজর দিলে তাদের স্বৈরাচারিতার প্রকাশ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব। এদের দ্বারা মানুষের সাধারণ অধিকার খুব সহজেই লঙ্ঘিত হয়। তাছাড়া সাধারণ স্বাধীনতাও পদদলিত হচ্ছে এই সব স্বৈর শাসিত দেশগুলোতে। এই দেশ গুলোর নির্বাচনে চলে ব্যাপক রিগিং। বিরোধী

পার্টির লোকেদের কারাবাস করতে হয় খুব অল্প স্বল্প কারণেই। হত্যা গ্রেফতারী পরোয়না সব সময় লেগেই রয়েছে দেশের সর্বত্রই। এক একটি পরিবারের সকলেই জেলে যেতে বাধ্য থাকে অল্প কারণেই। জেল বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও করা হয়।

কিন্তু আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা ইসলামী নিয়ম কানুনের সাথে মুসলিম দেশগুলির কাজ কারবারকে গুলিয়ে ফেলবেন না। ইসলামী আইনের ধারা আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেয় যে ইসলাম কখনই অন্যায় অত্যাচারকে সর্মথন করেনা। বরং মুসলিম দেশগুলোতে যা ঘটে থাকে তা ইসলামের বিপরীত।

মুসলিম না মহামেডান ?

মুসলিমরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূজা করে না। মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর একজন প্রেরিত রসূল। তার আগে অন্যান্য নবী রসূল যে আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিও তেমনি মানবদেহ ধারী রসূল, তবে তিনি শেষ রসূল। কিন্তু অনেকের ধারণা মুসলমানরা মুহাম্মদ (সাঃ) কে পুজা করে থাকে আর সেই কারণে তাদের মহামেডান বলা হয়।

মুহাম্মদ (সাঃ) যিশুর (ঈসা আঃ) মত নবী ছিলেন। তার সঙ্গে ঐশ্বরিকতা আরোপ করা পাপ ও অন্যায়। তিনি লোকদের একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সব সময় জোরের সাথে সবাইকে জানাতেন যে তিনি একজন মানুষ। তার অনুসারীরা যাতে তার ঈশ্বর হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার ভুল করে না ফেলে তার জন্য 'আল্লাহর দান ও রসূল হিসাবে' নিজেকে পেশ করতেন এবং তাকে আল্লাহর দান ও রসূল হিসাবে সম্বোধন করার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে তেমন তোষামোদ ,করো না যেমন খৃস্টানরা মেরি পুত্র যিশুকে করে থাকে। আমি আল্লাহর দান ও তার রসূল"।

মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর শেষ রসূল হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন এবং তার বাণী সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। শুধু মাত্র বাণী পৌঁছে দেওয়াই শেষ কথা ছিল না বরং তার সামগ্রিক প্রয়োগও তিনি সমাজে করে দেখিয়ে গিয়েছেন। তার আন্দোলন ছিল ইসলামকে জীবন্ত বাস্তবায়ন করার আন্দোলন। মুসলিমরা তাকে ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন কারণ তিনি ছিলেন অসাধারণভাবে উচ্চ মর্যাদাবান সম্পন্ন চরিত্রবান ব্যক্তিত্ব। আর এটা তিনি হতে পেরেছিলেন এই কারণে কারণ তিনি আল্লাহর কাছ থেকে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে কোন প্রকার ভেজাল ছিল না।

মুহাম্মদ (সাঃ) কে মুসলমানেরা কাঠোরভাবে অনুসরণ করে কিন্তু কোনও ভাবে পুজার আসনে বসান না কখনও। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহ প্রেরিত সমস্ত নবীকে শ্রদ্ধা করতে। তাদেরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মানে তাদের পূজা করা নয়। মুসলিমরা জানে সকল ইবাদত উপাসনা কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য। অন্য কারোর এতে অংশ থাকতে পারেনা।

বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া মুহাম্মদ (সাঃ) বা অন্য কাউকে পূজা করা মহা পাপ। এ পাপ এতটাই জঘন্ন যে এর ক্ষমা নেই আল্লাহর কাছে। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর কাছে কিছু চায় বা তার উপাসনা করে তবে তার মুখে মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতির কোন মূল্যই নেই। ইমানের দাবিই হল একজন মুসলিম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উপাসনা করবে না।

ইসলাম ও মুসলিম শব্দ কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ঘোষনা, "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হল একমাত্র ইসলাম। (৩:১৯) "তিনি তোমাদের নাম পূর্বে মুসলিম রেখেছিলেন বর্তমানেও" (২২:৭৮)। "আদম আঃ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী রসূল এসেছিলেন সকলের বার্তার মূল মন্ত্র ছিল একই " আল্লাহর ইবাদত কর। অন্য কারোর নয়"। এই বার্তার ধারা নবী (সাঃ) পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন রসূল ধারার শেষ রসূল। কুরআনে এটা এভাবে উল্লেখ হয়েছে।

> "আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে কবুল করে নিয়েছি"। (আল কুরআন - ৫:৩)

এটা একেবারে ভুল ধারণা যে ইসলাম মানে মহামেডানিজম এবং মুসলিম মানে মহামেডান। মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলামের প্রবর্ত্তক নন বরং তিনি ইসলামের শেষ নবী ও রসূল।

শিয়া ও সুন্নী মুসলিম

অনেক অমুসলিম ভাই বোন মুসলিমদের কাছে শিয়া সুন্নীর বিভাজন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে থাকে। কিছু মুসলিম তাদের প্রশ্নের উত্তরটা দেয় না, কারণ শিয়া সুন্নীর ব্যাপারে তাদের তেমন কোন জ্ঞান নেই। শিয়া সুন্নীর ইতিহাসটা বলতে গেলে অনেক পুরান কথাই বলতে হয়।

শিয়া সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসে একমত পোষণ করে থাকে। নামায, রোযা, হজ, যাকাত সব কিছুতেই শিয়া সুন্নী উভয়েই বিশ্বাসী, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলত যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হল রাজনৈতিক। আর এই পার্থক্য বা বিভেদ নীতি শুরু হয়েছিল নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর প্রায় দু দশক পরে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিয়া ও সুন্নীদের এই রাজনৈতিক মত পার্থক্য অসংখ্য সমস্যার মূলে নেতৃত্বের প্রশ্ন জন্ম দিয়ে চলেছে।

শিয়া সুন্নীদের মধ্যে এই যে বিভেদ তা হল একটি রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরী হিসাবে কে মনোনীত হবেন? সূন্নীদের মধ্যে বড় বড় ব্যক্তিত্ব এটাই একমত হন যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর পর সেই উত্তরাধিকারী হতে পারেন যিনি সবচেয়ে কাজে দক্ষ ও যোগ্য। সেই মত সবাই হজরত আবু বকর (রাঃ) কে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা বা প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন। 'সুন্নী' সব্দটির অর্থ হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি রসূলের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন।

অপরপক্ষে মুসলিমদের অন্য একটি দল এটাই দাবি করেন যে মুসলিম নেতৃত্ব রসূলের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। বিশেষতঃ নবী (সাঃ) নিজেই তার যে পারিবারিক সদস্যদের উল্লেখ করেছিলেন তাদের মধ্যে। শিয়া মুসলিমরা এটা বিশ্বাস করেন যে নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর রাষ্ট্র নেতৃত্ব তার খুড়তুত ভাই ও জামাতা আলি (রাঃ) এর উপর ন্যাস্ত থাকবে। শিয়ারা কখনই স্বীকৃত মুসলিম কর্তৃত্বকে

মেনে নেয়নি। মুসলিমদের এই সম্প্রদায় এটা মনে করেন যে ইমাম আল্লাহ অথবা নবী দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি হবেন এখানে নিযুক্ত ইমাম কোন সময় ভুল করেন না। শিয়া শব্দটির অর্থ হল "সমর্থন করা দল" সাধারণভাবে শব্দটি "সিয়া-ইত-আলি" থেকে এসেছে যার অর্থ আলির দল। নবী পরিবার আহল-ই-বায়েত নামে পরিচিত।

অবস্থান

সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে সূন্নী সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশী। প্রায় ৮৫% মুসলিম সূন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। পৃথিবীর ৫৬ টা মুসলিম দেশের মধ্যে মাত্র চারটি দেশে শিয়ারা বেশি পরিমানে রয়েছে। এই দেশগুলি হল বাহরাইন, আজারবাইজান, ইরাক ও ইরান। কিছু উল্লেখযোগ্য শিয়া রয়েছে ভারত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, বাহারাইন, সিরিয়া ও লেবাননে।

ধর্মীয় আচরণ বিধিতে পার্থক্য

রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে দুটি সম্প্রদায় পৃথক গোষ্ঠী হলেও পরে এর থেকে ধর্মীয় রীতিনীতি ও অভ্যাসগত আচরণে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ পড়ে। একটা বিষয় স্মরণ রাখা দরকার এই সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামী মৌলিক বিশ্বাসে উভয় সম্প্রদায় একমত পোষণ করে। এখানে পরস্পর ভাই ভাই আচরণ করে থাকেন উভয়েই। বেশীর ভাগ মুসলিমরা নিজেদের আলাদা করে শিয়া কিংবা সুন্নী সদস্য বলে প্রচার করেন না। সেজন্য বেশীরভাগ মুসলিম নিজেদের নিছক মুসলিম বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ধর্মীয় নেতৃত্ব

শিয়া মুসলিমরা তাদের নেতাকে আল্লাহ মনোনীত বলে ভাবেন। তাদের কাছে এই ইমামের প্রকৃতিগত ভাবে কোন পাপ নেই। সে জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ইমামদের অত্যন্ত সম্মান করে থাকেন। আর সেইজন্য তারা তাদের কবর গুলিতে তীর্থযাত্রা সম্পন্ন থাকেন এই

আশায় যে তাদের মারফত আল্লাহর সাথে তাদের অনেক ব্যাপারে সংযোগ ঘটবে।

সুন্নী মুসলিমরা যুক্তি দেখান যে ইসলামে উত্তরাধিকার সুত্রের কোন সম্পর্ক নেই। বংশগত কোন গৌরব দেখিয়ে কোন প্রকার সুবিধা পাওয়া যায় না। ইসলামে পীরত্বের স্থানও কল্পনা করা যায় না। এরা আরও মনে করেন যে নেতৃত্ব জন্ম সূত্রে পাওয়া যায় না। ইসলাম এর অনুমোদনও দেয় না। নেতৃত্ব পেতে গেলে বিশ্বস্থ ও যোগ্য হলেই জনগণের দ্বারা নেতৃত্ব পাওয়া যায়।

বিবাদ ও সংঘর্ষ

শিয়া সুন্নী দুটি সম্প্রদায় তাদের বিভাজন এতটা সম্প্রসারণ করেছে যে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরেও বেশ ভালভাবে পরিলক্ষিত হয় সৌদি আরব, ভারত ও পাকিস্তানে। যেখানে যেখানে আবার গণতন্ত্র রয়েছে যেমন লেবানন, ভারত, পাকিস্তান বিভিন্ন জায়গায় এই পার্থক্য রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৌদি আরব এবং সিরিয়ায় শিয়া সুন্নির সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশ ব্যাপক। ইরাক ও আফগানিস্তানে শিয়া সুন্নী সংঘর্ষটা অস্ত্র সংঘাত পর্যন্ত পৌঁছায়। বিগত দেড় দশকে অবস্থা খুবই উত্তপ্ত হয়েছে। এমন কি লাক্ষ্ণৌ শহরে মহররাম -এর মিছিলকে কেন্দ্র করে প্রায়শঃ এ সংঘাত দেখা দেয়।

এরকম ইস্যুর পিছনে সময় নষ্ট করার কোন দরকার প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের চেতনাকে ঘেরাচোপে বন্দী করার কথা বলেনা। বৈচিত্রপূর্ণ সমাজে ইসলামের সৃজনশীল বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র স্বীকার করেও ইসলাম এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্কৃতির সন্ধান দেয়। ভয়-ভিতির কোন পরিবেশ এখানে বিদ্যমান নেই। কোন ধর্ম বা বিশ্বাস ভূমধ্যসাগরের কাসাব্লাঙ্কা থেকে শুরু করে প্রশান্ত মহাসাগরের ব্রুনেই পর্যন্ত এত বিস্তৃত ভূখন্ডে সাতন্দ্র বজায় রেখে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ইসলাম ছাড়া এ দাবীও কেউ করেনা। তাদের একটাই যোগসূত্র

যে তারা ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলবে। শিয়া-সুন্নীর শুধু এই একটি মন্ত্রেই দূর হতে পারে।

উর্দু কি বিদেশী ভাষা?

ঈন্দো গাঙ্গেয় সমভূমিতে উর্দু এমন একটা উপাদান যা বাদ দিলে মুসলিমদের পরিচয়ই তুলে ধরা যাবে না। কিন্তু এটি একেবারে খাঁটি ইন্দো-অ্যারিয়ন ভাষা। আর এর ব্যাকরণ সংস্কৃত উপাদানে সমৃদ্ধ। মুঘল আমলে মিলিটারি ক্যানটনমেন্ট গুলোতে উর্দু বিকাশ লাভ করেছিল এ দেশীয় হিন্দি, সংস্কৃত, ব্রজভাষা, প্রাকৃত ও পালি ভাষার সাথে।

ভারতবর্ষে সকল মুসলিম উর্দু ভাষায় কথা বলেনা বা একথাও বলা যায় যে যারা উর্দুতে কথা বলে তারা সবাই মুসলিম। উর্দু ভাষার সাহিত্য দারুনভাবে ধর্ম নিরেপেক্ষ বৈশিষ্ট বহন করে। অসংখ্য হিন্দু লেখক, কবি, প্রাবন্ধিক নাট্যকার তাদের রচনায় উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। উর্দু ভাষায় ভগবত গীতা যত বেশী পরিমাণ অনুদিত হয়েছে ভারতের অন্য কোন ভাষায় ততটা হয়নি। বেশ কিছু খ্যাত নামা উর্দু লেখক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এসেছেন যেমন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আনন্দনারায়ন মূল্লা, মালিক রাম, কৃশেন চন্দ্র, বিশ্বেশ্বর প্রদীপ, মনোরমা দিওয়ান, রঘুপতি সাহে, ফিরাক গোরখপুরী, ব্রজনারায়ন চাকবস্ত এবং আরোও অনেকে। মধ্য প্রাচ্য ও আরব জগতের সাথে উর্দুর কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য পাকিস্তান উর্দুকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে জাতীয় স্তরে। কিন্তু পাকিস্তানের চারটি রাজ্য তাদের আঞ্চলিক ভাষায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। সেগুলো হল সিন্ধী, বালুচি, পাঞ্জারি ও পাস্তু। একইভাবে সিন্ধী পাকিস্তানের চারটি আঞ্চলিক ভাষার একটি যা ভারতীয় জাতীয় ভাষার সাথে স্থান করে নিয়েছে। এই সমন্বয় তাই আমাদের ঐতিহ্যগত এক সম্পত্তি। এতটা প্রাপ্তির পরও আমাদের পরস্পর সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। এমন কি এর পার্সিয়ান স্ক্রিপ্টও এটাকে বিদেশী বলে প্রমাণ করতে পারেনা। ভারতীয়রা অন্য তিনটি ভাষা সিন্ধী, পাঞ্জারি এবং কাশ্মিরী ও পার্সিয়ান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে। প্রমানের জন্য ভারতীয় ১০০ টাকার নোট দেখলেই

চলবে। একশ বছরের চেয়েও পুরান 'মস্তানা যোগী' ও উর্দু ভাষায় রচিত। আর এটা পরিচালিত হয় হিন্দুদের দ্বারাই। আর বর্তমানে অমুসলিমদের সাহার গোষ্ঠীর দ্বারা প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় সাহারা' সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় মানুষের কাছে পৌঁছায় যা কিনা উর্দু ভাষার পত্রিকা।

ইসলামে পৌরহিত্যবাদের স্থান নেই

সাধারণভাবে লোকেরা পৌরহিত্যবাদের সাথে মুসলমানদের কাজি, ইমাম, মুফতি ও মৌলবীদের জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু ইমাম কেবল নামাজ পরিচালনার নেতা বৈ অন্য কিছু নয়। মুফতি হলেন তিনি যিনি ধর্মীয় ব্যাপারে তার কোন মতামত পেশ করে থাকেন। অনুরূপভাবে কাজির কাজ হল আদালতে কোন ব্যাপারে বিতর্ক হলে তা মিটিয়ে দেওয়া। মৌলবী ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করে। এদের কারোর সাথে ঐশ্বরিক কোন যোগাযোগ থাকেনা। এরা স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার কোন রকম সংযোগ ঘটায় না। স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যেকার কোন মাধ্যমও এরা নয়। পাপপুণ্যের কোন স্বীকারোক্তি প্রকাশ করতে হয় না কোন ইমাম সাহেবের কাছে। যে কোন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর কাছেই তার অন্যায়ের কথা পেশ করে ক্ষমা চাইতে পারে, তার দুঃখ বেদনা জানাতে পারে, তার বিপদ আপদ থেকে পরিত্রাণ চাইতে পারে।

যে কোন ব্যক্তি কুরআন ভালভাবে পাঠ করতে পারলে সে নামাযের ইমামতি করতে পারে মসজিদেই। বাড়ি বাড়ি দোকানে দোকানে কোন মোল্লা মৌলবী দিয়ে কুরআন পাঠ করানোর কোন দরকার নেই। নিজের ভালর জন্য নিজেই কামনা করতে হবে সর্বাগ্রে, মসজিদে বসার জন্য কারোর আসন আলাদা করে পাতা নেই। এমনকি ইমাম সাহেব আলাদা করে কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নামায ও পড়াতে পারেন না। মসজিদে মুসল্লিরা যে আগে আসবে সে তার পছন্দমত জায়গায় আগে বসার অধিকার পেয়ে থাকে। ইসলামে ইমামও যা খাবেন মুক্তাদিও তাই খাবেন, একই জায়গায় বসবেন, একই পাত্র থেকে সবাই আহার করতে পারবেন। সবাইয়ের এটা মনে রাখা উচিত যে কুরআনের ঘোষনা। আল্লাহর কাজে সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানীয় যে বেশী আল্লাহ ভীরু।

মসজিদ বা মস্ক

1. মসজিদ হল এমন জায়গা যেখানে মুসলমানেরা জড়ো হয়ে থাকে মাথা ঠেকিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে।

2. অনেক মসজিদ মিনার ও গম্বুজে সুশোভিত থাকে।

3. মসজিদের মধ্যে কোন রকম মূর্ত্তি কিংবা ছবি জাতীয় কোন কিছু থাকে না। সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য কোন কারুকাজ থাকলেও কোন প্রকার স্মৃতি স্মারক নিষিদ্ধ। নামায সম্পাদনের সময় কোন প্রকার পবিত্র গ্রন্থও সামনে রাখা হয় না।

4. মসজিদে প্রবেশ অধিকার অবাধ। মসজিদে ঢুকতে গেলে কোন মিষ্ঠান্ন ফলমূল কিংবা সুগন্ধি চাদর কোন কিছু প্রদানের কোন নিয়ম নেই। মসজিদে মুসল্লিরা জড়ো হয় মূলত নামায আদায়ের জন্য।

5. সেই সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষা, ঝগড়া বিবাদের নিঃস্পত্তি, দান খায়রাতের ঘোষণা প্রভৃতির কাজ হিসাবে মসজিদ ব্যবহার হয়ে থাকে।

6. সমস্ত স্তরের মুসলিমরা একই কাতারে দাঁড়ানোর অধিকার পেয়ে থাকে মসজিদে। আগমনকারীদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ রাখা হয় না। সমাজের রাজনেতিক, অর্থনেতিক বা অন্যান্য যে কোন মর্যাদার লোকেরা আগমনের ক্রম পর্যায় নীতি মানতে বাধ্য। পেছনে এসে সামনের কাতারে স্থান খোজা অযৌক্তিক।

7. নামাযের সময়ও নির্ধারিত হয় সাধারণ সুবিধাকে সামনে রেখে হাদীস কুরআনের নীতি মেনে।

ফজরঃ- ফজর এর নামায অনুষ্ঠিত হয় সূর্য ওঠার আগে।
যোহরঃ- যোহর শুরু হয় সূর্য মধ্য গগনে পৌছানোর পর।
আসরঃ- অনুষ্ঠিত হয় যখন কোন বস্তুর ছাঘা তার দৈর্ঘের দ্বিগুন হয়।
মাগরিবঃ- অনুষ্ঠিত হয় সূর্যস্তের পর।
এশারঃ- অনুষ্ঠিত হয় যখন সূর্য সম্পূর্ণ রূপে বিলীন হয়ে যায় এবং সূর্যাস্তের পর ৯০ মিনিট পার হয়ে যায়।

সময় তালিকা কঠোরতার সঙ্গে মেনে চলা হয়। কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য তাতে কোন পরিবর্তন আনা হয় না।

8. যে কোন কুরআন হাদীসের শিক্ষিত ব্যক্তিই ইমাম হয়ে নামায পড়াতে পারেন। তবে আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকলে তিনিই নামাজ পরিচালনা করেন।

9. মসজিদের মধ্য অমুসলিমরা প্রবেশ করলে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

10. মসজিদে নামাযের জন্য কোন রকম পশু জবেহ করার কোন নিয়ম কানুন নেই।

11. মদ্য পান করে মসজিদে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি কাঁচা পিয়াজ, রোশন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে যাওয়ার আগে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

12. নামাযের আগে মুসলমানদের ভালোভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে হাত মুখ ধুইতে বলা হয়েছে যার নাম ওযু।

মসজিদ নির্মান বৈশিষ্ট্য

মসজিদের মূল অংশ হল 'মুসাল্লা' এখানে ইমাম বাদে সমস্ত নামাযী বিশেষ নিয়মে কাতারবন্দী হয়ে নামাযে দাঁড়ায়। কারপেট কিংবা মাদূর দিয়ে ঢাকা থাকে এই অংশ। পরিস্কার মেঝে থাকলে মাদূর বা কার্পেটও বিছানোর দরকার থাকেনা।

মসজিদের ভিতরের কিছু বৈশিষ্ট্য

প্রার্থনা কক্ষ

প্রাথনা কক্ষকে মুসল্লাও বলা হয়। যেখানে প্রত্যেকে সিজদা করে।

মিহরাব

'মুসল্লা' অংশের সামনে দেওয়ালের অন্তর্ভুক্ত ছোট একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্থান থাকে, এটিকে মিহরাব বলে। এটি মক্কার কাবা ঘরকে নির্দেশ করে। সমস্ত নামাযী এদিকেই মুখ করে। নামায পড়ে।

মিম্বার

মিহরাবের অর্ধ অংশ জুড়ে থাকে 'মিম্বার', এখানে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে সাধারনতঃ শুক্রবার ভাষণ দিয়ে থাকেন নামাযীদের উদ্দেশ্যে।

মিম্বার

প্রায় প্রতিটি মসজিদের সাথে চৌবাচ্চা বা ঝরণা রয়েছে যেখানে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নামাযের আগে বিশেষ নিয়মে পুরো শরীর বা হাত মুখ ধুয়ে পরিস্কার করা হয়, একে অজু বা গোসল বলে। সমস্ত মসজিদের আগমনকারী পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন।

সারা পৃথিবীই মসজিদ

নবী (সাঃ) বলেছেন 'সারা পৃথিবীর মাটিই মসজিদ', সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে, নবী (সাঃ) এ কথা বলেছেন। এই কথা দ্বারা তিনি এটা বোঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীর যে কোন অংশে নামায আদায় করা যেতে পারে এখানে পৃথিবীর সব জায়গার মাটিই পবিত্র, এটা পরিস্কার। সেজন্য কোন ব্যক্তি পার্কে, রাস্তার পাশে, সমুদ্র সৈকতে কিংবা রেলওয়ে প্লাটফর্মে সর্বত্র নামাজের সময় হলে নামায আদায় করতে পারেন। পৃথিবীর সমস্ত জায়গাই নামায আদায়ের উপযুক্ত স্থান। নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন জায়গায় নামায আদায় করলে আল্লাহর কাছে তা গৃহীত হয়।

নবী (সাঃ) এর এই সরল কথার পিছনে গভীর ভাবনাও লুকিয়ে রয়েছে। একজন মুসলিম মসজিদকে শান্তিপূর্ণ স্থান বলে ভেবে থাকে কেন। মানুষ পূত পবিত্র মন নিয়ে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে। আল্লাহর কাছে বিনীত বান্দাহ হিসাবে নামাযীরা মসজিদে যায়। মসজিদে ঢুকেই একজন ব্যক্তি মসজিদের সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শান্তি বানী 'আস্ সালামো আলাই কুম" 'আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক বলে, প্রত্যুত্তরে মসজিদের অন্যান্যরাও 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম অরহমাতুল্লাহ' 'আপনার উপরও শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক' বলে থাকেন। এর ফলে সারা মসজিদে শান্তির গুঞ্জন প্রতিধনিত হতে থাকে।

এই ভাবে নবী (সাঃ) মসজিদ ও মসজিদের বাইরের জগত কে এক শান্তিময় পরিবেশ বানিয়ে দিতে চেয়েছেন। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ চায় পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় শান্তি বিরাজ করুক। প্রতিটি মানুষের দৈহিক মানসিক শান্তি একান্ত কাম্য। মসজিদে সকল প্রকার শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব মুসল্লিদের উপর বর্তায়, কারণ নবী (সাঃ) পৃথিবীর সমস্ত মাটিকে মসজিদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তাই মসজিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের যে মহান পরিবেশ রচিত হয় সেই পরিবেশ মসজিদের বাইরেও থাকা দরকার।

আজান

(প্রার্থনার জন্য আহ্বান)

সারা পৃথিবীর সমস্ত মসজিদে পাঁচবার করে সমবেতভাবে নামায আদায় করা হয়ে থাকে। মুসলিমরা সমবেতভাবে মসজিদে নামায আদায় করাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে ভাবে। এই সমবেত নামাজ সমাজের ঐক্যকে মজবুত করে কংক্রিট ঢালা ছাদের মত। সমাজের সবাই সুখ দুঃখের ভাগীদার হতে পারে এই নামাযের মধ্য দিয়ে।

মসজিদে যথা সময়ে সমবেত হয়ে নামাযে যোগদান করার জন্য আজান দেওয়া হয়। মসজিদের উচ্চ স্থান মিনার কিংবা মাইক্রোফোনের সাহায্যে আজানের শব্দ চারিদিকে পৌঁছে যায়।

কিন্তু এই আযানকে অনেক অমুসলিমভাই নামাযেরই অংশ ভাবেন। আবার অনেকে ভাবেন যে এটা লাউড স্পিকারে রেকর্ডিং হয়।আবার অনেকে ভেবে থাকেন মৃত 'আকবর বাদশার' নাম নেওয়া হয়ে থাকে আজানে। মাত্র দু তিন মিনিট সময় নেওয়া হয় আজানের জন্য।

নবী (সাঃ) নিজেই আজানের শব্দাবলী নিদির্ষ্ট করে দিয়েছেন। জাকার্তা থেকে কাসাবলাঙ্কা পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মসজিদগুলো থেকে একই মধুর সূরে আজান প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়। আজানের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট যে এর অর্থ মানুষের বোধগম্য। এটা মন্দির বা গীর্জার শঙ্খধ্বনি বা ঘন্টাধ্বনির মত নয়। আজানে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করা হয় তা নিম্নরূপ।

১) আল্লাহু আকবার– আল্লাহ সর্বোত্তম (চারবার)

২) আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (দুবার)

৩) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদূর রসূলুল্লাহ– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর রসূল। (দুবার)

৪) হাই আলাস স্বলাহ– তোমরা নামাযের জন্য দৌড়ে এস। (দুবার)

৫) হাই আলাল ফালাহ– তোমরা কল্যাণের জন্য দৌড়ে এস। (দুবার)

৬) আল্লাহু আকবার– আল্লাহ সর্বোত্তম। (দুবার)

৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। (একবার)

দেড় হাজার বছর ধরে একই ভাষায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে, তাঁর একত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নবী (সাঃ) যে আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের জন্য রসূল হিসাবে এসেছিলেন তারও স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া নামাযের জন্য আহ্বান দেওয়ার সাথে সাথে কল্যাণের জন্যও আহ্বান জানান হয় আজানের মধ্যে। আর এ আহ্বান চলবে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবী জুড়ে।

আজানের এই কটি বাক্য ছাড়াও প্রভাতে ঘুম থেকে ভাঙ্গানোর জন্য একটি বাক্য দু-বার বলা হয়ে থাকে সেটি হল– 'আস্‌সালাতু খায়রুম মিনাননাউম' নামায ঘুমের চেয়েও উত্তম।

সকালে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য রিমাইন্ডার হিসাবে ইসলামী আজান ব্যবস্থার মতন আর কোন ব্যবস্থা কোথাও পাওয়া যায় না। আজান শোনার পর একজন ব্যক্তি যখন নামাযে যোগ দেয় তখন তার হৃদয় ফুটে ওঠে আধ্যাত্মিকতার জাগরণে। নুতুন স্পৃহা নিয়ে পৃথিবীতে শান্তির কাজে ছড়িয়ে যায় ব্যক্তিটি।

মুসলমানেরা কি কাবার পুজা করে?

পৃথিবীর কেন্দ্রীয় মসজিদ, 'হারাম' শরীফের মসজিদ, এটি মক্কায় অবস্থিত। কাবা শরীফের গঠনাকৃতি ঘনকবাক্সের মতন।

কাবা অতি পবিত্র জায়গা, এখানে হত্যা একেবাবে নিষিদ্ধ কাজ। এমন কি একটা মাছি বা মশা মারারও অধিকার কারোরও নেই। এখানে এমন কি কোন ব্যক্তি যদি তার পিতৃ হন্তাকেও কাবা শরীফের মধ্যে দেখতে পান তাহলেও সে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে হত্যা করতে পারেনা অথবা অন্য কোন ক্ষতি করতে পারেনা। কাবা মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে কেউ কোন ঝগড়াঝাটি, বাক বিতন্ডা– কোন কিছু করার অনুমতি পায় না।

সাধারণভাবে অনেক অমুসলিম ভাইদের প্রশ্ন মুসলিমরা কেন কাবাকে পুজা করে থাকেন কাবায় সিজদা দিয়ে থাকেন। মুসলিমদেরতো দাবি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করেনা। এর উত্তর খুবই পরিস্কার যে মুসলিমরা মক্কায় অবস্থিত কাবা ঘরটিকে তাদের 'কিবলা' বানিয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে যেখানেই থাকনা কেন এই একই দিকে মুখ করে নামায আদায় করবেন। তারা এটাকে পুজা করেন না। মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করে অন্য কারোও বা অন্য কিছুরই নয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

> "তোমার বার বার আকাশের দিকে ফিরে তাকানোকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এখন তোমার মুখ আমি সেই কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি যেখানে থাকনা কেন, তার দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তে থাকবে। আর এসব লোক, যাদেরকে মহাগ্রন্থ দান করা হয়েছে, তারা ভাল করেই জানে যে নির্দেশ তাদের প্রভুর কাছ থেকেই এসেছে এবং তা সত্য। তা সত্ত্বেও তারা যা কিছু করছে আল্লাহ সে সম্পর্কে কিছু মাত্র অনবহিত নন"। (আল কুরআন– ২:১৪৪)

1. ইসলাম ঐক্যকে পালিত করে

মুসলমানেরা যদি এ নির্দেশ না পেত তা হলে নিজেদের ইচ্ছামত এদিক ও ওদিক যার যেমন ইচ্ছা সেই দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। সারা বিশ্বেতো দূরের কথা এক মসজিদে শৃঙ্খলার সাথে নামাজ আদায় সম্ভব হতনা। মুসলমানদের এক ঐক্যতানে বাঁধার জন্য আল্লাহর ইবাদত নামায আদায়ের সময় কাবার দিকে মুখ করে তা পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদি কোন মুসলিম কাবার পশ্চিমে বাস করেন তাহলে সে পূর্ব দিকে মুখ করে নামায পড়বেন আবার যে কাবার পূর্ব দিকে বাস করেন সে পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। এইভাবে কাবার দক্ষিন দিকের লোকেরা উত্তর দিকে এবং উত্তর দিকের লোকেরা দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকেন। সারা পৃথিবীর মানুষের নামাযের অভিমুখে একই দিকে। মহাকাশ থেকে দৃষ্টি আরোপ করলে কাবাকে বৃত্তকেন্দ্র মনে হবে।

2. কাবা প্রদক্ষিণ একেশ্বরের বার্তা দেয়

মুসলমানেরা যখন হজ্ব বা ওমরা সম্পাদন করতে যান তখন বিশেষ নিয়মে কাবা প্রদক্ষিণ করে থাকেন এতে এটা আল্লাহর একত্ব ঘোষণায় সাক্ষি হয়। প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি প্রদক্ষিণ কেন্দ্র একই আর তা হল কাবা।

3. কাবায় উঠে আযান দেওয়া হয়

নবী (সাঃ) এর সময়েই কাবার উপরে উঠে আযান দেওয়া হত। এর দ্বারা এটা প্রমানিত হয় কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায় করা হয়ে থাকলে –এর কোন পুজা করা হয় না। কাবার কাছে কোন কিছু চাওয়া হয় না। বরং কাবার দিকে মুখ করে নামায সম্পন্ন করা হয় মাত্র।

কালো পাথর

‘হাজরে আল আসওয়াদ’ কি মুসলিমদের কাছে পূজ্য?

‘হাজর আল আসওয়াদ’ বা কালো পাথর কাবার পূর্ব কোণে রক্ষিত এক খন্ড পাথর। এই পাথরটিকে মুসলিমরা শ্রদ্ধা করে থাকেন। আর এটি বর্তমানে নয় বরং হজরত আদম (আঃ) ও হজরত মা হাওয়া (আঃ) এর যুগ থেকে হয়ে আসছে। একটি মত অনুসারে কাবা ঘর কোথায় নির্মিত হবে তা আদম ও হাওয়া (আঃ) কে দেখানোর জন্য এ পাথরটিকে জান্নাত থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অন্য মত অনুযায়ী জানা যায় যে কালো পাথরটি কাবা ঘরেরই পাথর। ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ) যে কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন, কালো পাথরই কেবলমাত্র অবশিষ্ট অংশ ছিল সেই কাবার। নবী (সাঃ) আসার পূর্বে কাবা শরীফ বহুবার ধবংস হয় এবং তা আবার পুন প্রতিষ্ঠিত হয় বারবার। কিন্তু বার বার কাবা ঘর ধ্বংস হলেও প্রতিবারই হাজরে আল আসওয়াদ বা কালো পাথরটি টিকে থাকে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আসার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক একই জায়গায় ছিল যেখানে ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ) এটিকে রেখেছিলেন, নবী (সাঃ) যখন হিজরতের পর মক্কায় আসতেন তখন হাজরে আল আসওয়াদ পাথরটিকে চুম্বন দিতেন। হজরত উমার (রাঃ)ও যখন কাবা তওয়াফ করতেন তখন এই পাথরটিকে চুম্বন দিতেন এক সময় তিনি এই পাথরটিকে চুম্বন দেওয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন। “আমি তোমাকে একখন্ড পাথর ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনা, তুমি কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারনা। নবী (সাঃ) কে যদি তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না কখনও।”

এই কালো পাথরটিকে ঘিরে যে সকল ভুল ধারণা জুড়ে আছে তার অপসারণ হওয়া দরকার। এটা কোন উল্কাপিন্ড নয়। এটা একটি সাধারণ

কালো পাথর। এর বাস্তব গুরুত্ব হল যখন কাবা ঘর তওয়াফ করা হয় তখন এখান থেকে শুরু করা হয়। এর নিজস্ব রঙে এটা প্রকাশিত। এ পাথরকে কোন সময় পূজা করা হয়না। মুসলিমরা একে সিজদাও করেনা। মুসলমানেরা কাবা শরীফের প্রতিটি অংশের দিকে মুখ করে নামায পড়ে। এক সময় উমান থেকে কতিপয় দুষ্ট লোক কাবা শরীফ থেকে হাজার আল আসওয়াদ পাথরটিকে লুট করে নিয়ে যায় নিজেদের দেশে। এ সময় কিন্তু মুসলমানেরা নামাযের জন্য তাদের মুখ পূর্বের মত কাবা শরীফের দিকেই রেখেছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মুসলমানেরা কালো পাথরটিকে কোন রকম পুজা করেনা।

মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ কেন?

কিছু অমুসলিম ভাই একটি আপত্তি তুলে থাকেন যে মক্কা শরীফে অমুসলিমদের তীর্থ করতে যাওয়ার অনুমতি নেই কেন? এটা সত্যি যে মক্কা ও মদিনার মধ্যে আইনগত ভাবে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কারণে অমুসলিম ভায়েরা মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ অনুমতি পান না। এগুলোর পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে।

ইসলামে মক্কা ও মদিনা দুটি পবিত্র শহর। মুসলমানেরা এখানে ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করতে যান। কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ কিংবা চিত্তবিনোদনের জন্য কোন মুসলিম এখানে যায় না। তাই কেবল ধর্মীয় কতকগুলো কাজ সম্পন্ন করার জন্য মুসলমানেরা এখানে যায় এবং সেজন্যই তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। অনেক ধর্মের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম মানা হয়ে থাকে। এইভাবে যদি কোন ব্যক্তি "ত্রিপতি থিরুমূলা দেবসত্তনাম" প্রদর্শন করতে যান তখন তাকে তার হিন্দু বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে হয়। কোন অহিন্দুই এই মন্দিরে ঢুকতে পারেনা।

এছাড়াও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে দলিত, মহিলা এবং আমিষ ভোজীদের পূজো দিতে দেওয়া হয় না। এব্যাপারে এই স্থানগুলোতে বেশ কড়াকড়ি নিয়ম মানা হয়ে থাকে।

আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকেও বিচার করলে দেখা যায় নিজের দেশের এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে সাধারণ নাগরিকরা প্রবেশ করতে পারেনা। কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার লোকেরা ছাড়া এই সকল ক্যান্টনমেন্টগুলিতে

সবাইয়ের আসা যাওয়া নিষেধ। পারমানবিক কেন্দ্র, বিশেষ গ্রন্থাগার, গবেষনা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। একান্ত প্রয়োজনে যদি যেতেই হয় তাহলে ঐ সকল ব্যক্তিদের পূর্ব অনুমতি নিতে হয় যথাযথ কতৃপক্ষের কাছ থেকে। উল্ল্যেখযোগ্য ক্যান্টনমেন্ট গুলোতে এরকম নিয়ম বিধি থাকা একান্ত দরকার। ঠিক একইভাবে সারা বিশ্বের মুসলিমদের হেডকোয়ার্টার বা ক্যান্টনমেন্ট মক্কা ও মদিনা। এখানে তাই বিশ্বের সব সাধারণ মানুষের অবাধ যাতায়াতে অসুবিধা থাকবে বৈকি।

কোন এক দেশের নাগরিক অন্যদেশে যাওয়ার জন্য ভিসা ও পাসপোর্টের গুরুত্বকে বর্তমান বিশ্বের কেউই গুরুত্বহীন মনে করেনা। এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের সংরক্ষিত জায়গায় ইচ্ছে মত যাওয়ায় অনেক অসুবিধা থাকতেই পারে। সৌদি আরবের মক্কা মদিনা দুটি স্থানে মুসলমানেরা ধর্মীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য অনুমতি পেয়ে থাকেন। ভিন্ন ধর্মের মতাবলম্বী লোকেরা এখানে প্রবেশ করতে পারেনা এ দুটি স্থানে। তবে ব্যবসা বানিজ্য ভ্রমন যে কোন উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষ সৌদি আরবের মক্কা মদিনা ছাড়া অনত্র সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারেন।

দরগাহ ও মসজিদের মধ্যে পার্থক্য

মসজিদ হল মুসলমানদের ইবাদত গৃহ প্রতিদিন পাঁচবার মুসলমানেরা মসজিদে নামাযে সমবেত হয়। অপরপক্ষে দরগাহ হল মুসলিম সাধু বা ফকিরদের সমাধি স্থান। অবশ্য বেশ কিছু সমাধি স্থান মসজিদের পাশেই রয়েছে। সমাধিস্থ এই সকল সৎ মুসলিম ব্যক্তিরা জীবিত অবস্থায় বহু জন সাধারণের ভক্তি অর্জন করেছিল। সেজন্য মানুষ তাদের ত্যাগ দয়া ভালবাসায় এতটা মুগ্ধ হয়েছিল যে তাকে মন তেকে ভুলতে পারেনি। তারা ছিল সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে। এই সকল মহান ব্যক্তিরা মারা গেলে তাদের ভক্তেরা তাদের কবরে সৌধ গড়লেন। পরবর্তীতে এগুলো দরগাহ এ পরিণত হয়। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাদের বহু সম্পত্তি দরগাহ-এ দানও করে দিলেন। সময়ের প্রবাহে এই সকল দরগাহ তীর্থস্থানে পরিণত হল। আজমিরে এইভাবে খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির কবরকে ঘিরে গড়ে ওঠে ভারতের এক বড় তীর্থ স্থান। পাঞ্জাবে বাবা ফীরদউদ্দিন গাঞ্জে শাখর, দিল্লির নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, গুলবার্গের খাজা বন্দে নওয়াজ, হায়দ্রাবাদের ইউসুফেইন প্রমুখ ব্যক্তির কবরকে ঘিরে বহু মাজার পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত ব্যক্তিরা মানুষকে খুবই ভালবাসত। ভারতবর্ষে এরা শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচারে বিরাট ভূমিকা রেখে গেছেন। এই সকল ব্যক্তিদের সাধারণ কবর পরবর্তীতে দরগাহ এ পরিণত হয়। আর এই দরগাহ-র টানে হাজার হাজার ভক্ত মেলা বসায় এই সমাধি স্থান গুলোতে। ভক্তদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ে সমানভাবে এখানে জড়ো হয়। মুসলমানেরা ভুলে যায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষা শিরক থেকে বেঁচে থাকার কথাকে। এই সব মাজার বা দরগাহকে ঘিরে মুসলমানদের দ্বারাই স্থাপত্ব শিল্প যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি কাওয়ালি, শেয়রির মত সংস্কৃতিও বিস্তার লাভ করেছে জাঁকিয়ে। উর্দু

ভাষায় রচিত শেয়রি বা কাওয়ালি সমাধিস্থ মুসলিম ফকিরদের গুণগান নিয়েই রচিত হয়ে থাকে।

কবর পূজোকে ইসলাম শুধু অনুমোদন দেয়নি তা নয় বরং এটি বড় ধরণের ক্ষমার অযোগ্য পাপ। কারণ এতে ইসলামের যে মৌলনীতি তৌহিদ বা একত্ববাদ রয়েছে তাতে আঘাত পড়ে। কবর পূজার মধ্যে শিরক করা হয় স্পষ্টভাবে। ইসলাম একত্ববাদের ব্যাপারে খুবই কড়া, কোন মতেই এর মধ্যে কোন দুর্নীতি বা দূষিত চিন্তার প্রবেশ ঘটুক ইসলাম তা চায় না। ইসলাম তৌহিদ ও শিরককে বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে। দুটোর সীমারেখা যাতে কোন সময় এক না হয়ে যেতে পারে তার জন্য তীক্ষ্ণ নজর দেয় ইসলাম। এমনকি নবী রসূলেদের কোন সময় পূজ্য করে ফেলা না হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। নবী রসূল নিজেরাই ঘোষণা করেছেন যে তারা মানব অস্তিত্ব ছাড়া কিছু নয় এবং তারাও সাধারণ মানুষের মত অনেক সময় জাগতিক কাজে ভুল করে থাকেন। কুরআন শরীফের প্রথম সূরা 'ফাতিহা'-য় বলা হয়েছে,

> "আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই"। (আল কুরআন- ১:৪)

এইভাবে সহজ সরল পথ সম্বন্ধে কোন প্রকার বোঝাপড়া নেই ইসলামে। ইসলামে ব্যক্তি-হৃদয় সরাসরি আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হয়। আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মাঝপথে কোন মাধ্যম থাকেনা। প্রয়োজন হয় না কোন দালালেরও। আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে গেলে একান্ত অনুগত ও আকাঙ্খী হৃদয় নিয়ে তাকে ডাকতে হবে। এতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। এতেই তিনি তার বান্দার ডাকে সাড়া দেবেন। কিন্তু সাধু ফকিরদের কবরে গিয়ে তাদেরই সাহায্য চাওয়া হয়। ভক্তদের সুখ দুঃখের স্রষ্টা ও ভক্তদের মাঝে তৃতীয় জন এই সকল সৎ ব্যক্তিরা স্থান পায় কবর পুজার মধ্যে। ইসলাম এধরণের অভ্যাসকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। এই সকল সৎ ও মহৎ ব্যক্তিরা জীবিত থাকা কালীন ভক্তদের কোন সাহায্য করতে পারেননি অথচ মৃত্যুর পরে তারা ভক্তদের মনস্কামনাপূর্ণ করবেন এ কথা ভাবাই যায় না। অতএব তাদের কাছে কাকুতি মিনতি করার কোন প্রশ্নই থাকতে

পারেনা। কুরআনের ঘোষনা, "যারা কবরে অবস্থান করছে তুমি তাদের কিছু শোনাতে পারবেনা" (আল কুরআন – ৩৫:২২)

দরগাহগুলোর সাথে অনেক সময় কোন জিনিস জুড়ে দিয়ে তাকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। ভক্তরা সেখানে নানানভাবে সিজদা করে চলেছে। এইগুলো ইসলামের একত্ববাদের সাথে সংঘাতপূর্ণ বিষয়।

দরগাহ যিয়ারত বা দরগাহ দর্শন

মুসলমানদের বড় অংশ এই সকল ফকির দরবেশদের সমাধিস্থ স্থান-দরগাহে ভ্রমন করেন মনস্কমনা পূর্ণ হওয়ার আশায়। আল্লাহর তৌহিদী মতবাদ ইসলাম একে মোটেই সমর্থন করেনা। কারণ মনস্কামনাপূর্ণ করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে যেখানে যেখানে সাধু দরবেশদের সমাধি রয়েছে সেগুলোতে সব ধর্মের মানুষের ঢল দেখা যায়। এই সকল ভক্তরা সমাধিস্থ সুফী, ফকির দরবেশদের ভালবাসা ও সম্প্রীতির কথা প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সুফী দরবেশদের প্রেম ভালবাসা ভক্তদের এতটাই মোহিত করেছিল যে পরবর্তীতে ভক্তরা তাদের হৃদয় আসনে ঐ সকল মহান ব্যক্তিগুলিকে পুজ্য করে তুলে ধরেছে। ধীরে ধীরে তা পূজার রূপ নিয়েছে। ভক্তরা যেমন তাদের প্রেম-ভালবাসা নিয়ে অনেক সত্য কথা বসেছে তেমনি অনেকের দ্বারা মিথ্যা অলৌকিকতার নানান গুণাবলী ও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ সকল ব্যক্তিত্বের উপর। আর এই অলৌকিকত্বের মিথ্যা চাদর চড়াতে চড়াতে ঐ সব ব্যক্তিত্ব সবার অলক্ষে দেবতা হয়েই উঠেছে। সমাধির মৃত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে ভক্তদের মনিকোঠায় জীবন্ত দেবতা হয়ে যাওয়াতে তারা তাদের কাছে সাহায্য চায়। কিছু অসাধু ব্যক্তিও ইচ্ছাকৃত ভাবে সমাধিস্থ মহান ব্যক্তিদের নামে নানান মিথ্যা কাহিনী ছড়িয়ে দেয় পয়সা কামানোর জন্য। খুব দুঃখের বিষয় ভারত উপমহাদেশের দরগাহ পূজা এক বড় ধরণের সংস্কৃতির রূপ নিয়েছে। যা কিনা ইসলামী সংস্কৃতি বলেও প্রচার করা হয়। যা রোধ করার জন্য ইসলামের আগমন তাই

ইসলামী সংস্কৃতি নামে প্রচার?– বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা!

কোন নবীই কখনও কবরের উপর সমাধি মন্দির করতে বলেননি। তারা কোন কবরে ধূপধূনো দিতে বলেননি। চাদর চড়ানোরও কোন সমর্থন নেই। মৃত্যু বার্ষিকি পালন যেমন গর্হিত কাজ তেমনি কাওয়ালি, মশিয়া সম্পূর্ণভাবে ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ। নবী (সাঃ) অতীত জাতির ধংস হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে দুঃখের সাথে বলেছেন,

> "তাদের প্রতি অনুতাপ! তারা তাদের নবীদের কবরকে পূজার স্থান বানিয়েছিল। তোমরা আমার কবরকে পূজার স্থান বানাবেনা।"

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে হীন দৃষ্টিতে দেখা হয় কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত পক্ষপাত পুষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা। আর তাদের এই হীন দৃষ্টিকে ডামাডোল পিটিয়ে ময়দানে ছড়িয়ে দেয় কিছু অশুভ মিডিয়া। যারা মাদ্রাসা সমন্ধে অরুচিকর মন্তব্যগুলি করে থকেন তাদের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকারের গভীর জ্ঞান নেই। মাদ্রাসাগুলোতে কি পড়ানো হয়? কি তাদের পাঠ্যসূচি কিংবা কেমন পদ্ধতিতে মাদ্রাসায় পড়ানো হয়? কোন কিছুর পূর্ণ জ্ঞান নেই এইসব সমালোচকদের। এই সকল সমালোচকেরা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন খোজ খবর না নিয়ে আগে থেকেই ভেবে বসে আছেন মাদ্রাসায় শিক্ষা বলতে 'জিহাদ' ও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা পড়ানো হয়।

ইসলাম আগমনের প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলাম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এমনকি নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের উত্তর উপকূলে কেরলে ইসলাম এসে গিয়েছিল। এক শতাব্দী পরে উত্তর ভারতে সিন্ধু প্রদেশের পথ ধরে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে এবং উভয় স্থানেই ইসলামের যথেষ্ট প্রসার লাভ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসে। এই সময়ে উভয় স্থানের শত শত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। এই সকল নব দীক্ষিত মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন ছিল ইসলামী শিক্ষার তাই সেই তাগিদে মুসলমানেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পেয়েছিল প্রথম থেকেই।

'মাদ্রাসা' কথার অর্থ হল যেখানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষন দেওয়া হয়ে থাকে। ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের কাছে School কথাটা বলতে যা বোঝায়

মাদ্রাসাও সেই একই অর্থবহ। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক, মাধ্যমিক লেবেল থেকে বিশ্ব বিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামী দেশ গুলোতে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা বলতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বোঝায়। পশ্চিম বাংলায় বিখ্যাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান হল আলিয়া। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়ে 'আলিয়া ইউনিভার্সিটি' নাম নিয়েছে। এই মাদ্রাসা সকল ধর্মের ছাত্রদের জন্য খোলা। রাজা রামমোহনের মত বহু ব্যক্তিত্বও এক সময় আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি যেমন সংস্কৃত ও হিন্দু ধর্মের পন্ডিত ছিলেন তেমনি আরবি ও পার্সিয়ান ভাষায় তার পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

অনেক ক্ষেত্রে এই মাদ্রাসাগুলো ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার সাথে সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারও ঘটিয়েছে দারুন ভাবে।

দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা সংখ্যা কুড়ি হাজারের কাছাকাছি এবং এগুলোতে ছাত্র সংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের চেয়েও বেশী। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৬ সালে ভারতের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মাত্র ৩% মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। হত দরিদ্র মুসলিম বাচ্চাদের জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কি ফেলনা? ভারতবর্ষের গ্রাম গুলোতে বসবাসকারী মুসলিমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র। সেই সঙ্গে অশিক্ষিততো বটেই। এসকল শিশুদের খাওয়া পরার কতই অসুবিধা নিজেদের চোখে না দেখলে অনুভব করা যায়না। এই রকম শিশুদের জন্য মাদ্রাসায় স্থান পাওয়া সত্যিই বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মাদ্রাসায় কেবল ধর্মশিক্ষার সুবিধাটা পেয়ে থাকে এটা ভাবা ভুল। কারণ বর্তমান মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষা যেমন মাতৃভাষা, অংক, বিজ্ঞান প্রায় সব কিছু পড়ানো হয়। তাছাড়া ফ্রি খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা হয় এই সকল শিশুদের।

সব মাদ্রাসার পরিকাঠামো এক ধরণের হবে এটা ভাবা ভুল। মাদ্রাসার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিভাগ থাকে তাকে মক্তব বলে। এখানে প্রথমে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পরের পর্যায়ে আরবি ভাষা, কুরআনের

ব্যাখা, হাদীস প্রভৃতি পড়ানো হয়। তার পরের স্টেজ হল, গ্রাজুয়েট পর্যায়ের। এখানে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। মহাবিদ্যালয় পরের স্তর হল জামিয়া বা বিশ্ব বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে অধিবিদ্যা, দর্শন, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা বিদ্যা প্রভৃতি পাঠদান করা হয়ে থাকে। এই রকম জামিয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Qarawiyin University সবচেয়ে প্রাচীন, এটি মরক্কোর ফেযে ৮৫৯ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে মিশরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়।

মাদ্রাসা থেকেই প্রতাপশালী ব্যক্তিরা চারশ বছর আগে যে পাঠ্যক্রমের কথা ভেবেছিলেন বর্তমান আধুনিক যন্ত্রিক যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা একবারে হারিয়ে যায়নি। যে কারণেই হোক মাদ্রাসাগুলোর বিশাল বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও এই সকল পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে বহু মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে কম্পিউটারের মত আধুনিক বিজ্ঞান পঠন পাঠনের স্থান পেয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহও মাদ্রাসাগুলোতে রয়েছে। বর্তমানে ভারত সরকার এই সকল মাদ্রাসাগুলোর উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষারও সম্প্রসারণ ঘটছে খুব দ্রুততার সাথে। সব দিকে থেকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সকল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসাগুলোতে যেমন আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে তেমনি এই মাদ্রাসাগুলো আধুনিক চিন্তাভাবনা সম্পন্ন ছাত্র সরবরাহ করছে।

বর্তমানে NCERT (National Council for Education Research and Training) স্বীকার করছে যে মাদ্রাসাগুলোতে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষারই ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের কেরল ও পূর্ব ভারতের কলকাতায় একথা অনেকটা সত্য। মাদ্রাসাগুলোতে কোন প্রকার জাতীয়তা বিরোধী পাঠ্যসূচী বা কার্যকলাপ হয়নি তা এখন সবাইয়ের কাছে জানা বিষয়। মুসলিম এলাকাগুলোতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান গুলো গড়ে ওঠার জন্য বেশ কিছু যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে। (1) সাধারণতঃ মুসলিম এলাকা গুলোতে

কোন মাদ্রাসা ছাড়া অন্য কোন বিদ্যালয় নেই। (2) আলাদা করে বালিকা বিদ্যালয়ের ও অভাব। এমনকি মহিলা শিক্ষিকাদেরও দুষ্প্রাপ্যতা লক্ষ্য করা যায়। (3) আধুনিক শিক্ষার ব্যয় বহুলতা ও সরকারী বিদ্যালয়গুলির দূরবস্তা। (4) সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিম্নমান। (5) কিছু গোঁড়া মুসলিম আপত্তি করেন যে বিদ্যালয়গুলিতে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-বেস পাঠ্যক্রম রয়েছে তাই মাদ্রাসার প্রয়োজন।

মাদ্রাসা ও মক্তব

অনেকে মাদ্রাসা ও মক্তবকে গুলিয়ে ফেলেন। মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিকতার কথা তাদের মাথায় না এলেও মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষাকে তারা অনেকটা রক্ষনশীল কাজ কারবার বলে ভেবে থাকেন। কারণ সাধারণভাবে মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষাটাই দেওয়া হয়ে থাকে আর মক্তবের শিক্ষা করার পর বেশীর ভাগ শিশুরা পড়াশোনায় ইতি টানে। তারা আর শিক্ষার অগ্রগতি ঘটাতে পারেনা। সেজন্য তাদের মধ্যে রক্ষনশীলতা অনেকটাই কাজ করে। আসলে মক্তব হল আংশিক সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা। প্রচলিত শিক্ষায় এটা এক রকমের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

আল্লাহ এবং রসূলের কোন প্রতীক নেই কেন?

বেশীরভাগ ধর্মাবলম্বী লোকেরা তাদের দেবদেবীদের একটি মূর্ত্তি বা ছবি ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে রেখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে মহাপুরুষদের ছবি কিংবা মূর্ত্তিও তারা পূজোর ঘরে রাখেন। যে স্থানে এগুলো তারা রাখেন সে স্থানটিও তারা যথেষ্ট পবিত্র অবস্থাতে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমানেরা তাদের মসজিদে কিংবা ঘরে এধরণের কোন ছবি বা মূর্ত্তি রাখেন না। এই কারণে অনেক লোক মুসলিমদের কাছে তাদের কোন মূর্ত্তি বা ছবি না রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করে থাকেন।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ কর্তৃক শেষ নবী হিসাবে সমগ্র মানুষদের পথ প্রদর্শনকরার জন্য প্রেরীত হয়েছিলেন, তিনটি মৌলিক জিনিসকে নবী (সাঃ) ভিত্তি করে ইসলাম প্রচার করেছিলেন। প্রথমতঃ এক আল্লাহর

সর্বভৌমত্বের প্রচার দ্বিতীয়ত নব্যুয়ত এবং তৃতীয়ত পরকালীন জিজ্ঞাসাবাদের ধরণা।

নবী (সাঃ) জন সাধারণের কাছে সরলভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেছিলেন যে তিনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ঐশ্বরিক সত্ত্বা নন। ঐশ্বরিক সত্ত্বার সাথে কোনভাবে তিনি জড়িত ছিলেন না এবং তিনি বার বার তার অনুসারীদের একাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। ইসলামে স্রষ্টা-সত্ত্বা ও রসূল-সত্ত্বা দুটো একবারে আলাদা আলাদা জিনিস। অন্যান্য ধর্মে রসূলদের যেমন অবতার হিসাবে স্রষ্টা সত্ত্বার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামে তা মানা হয় না। আল্লাহ হলেন চিরন্তণ। মৃত্যু তার কখনও হয় না। অপর পক্ষে রসূলরা জন্মগ্রহণ করেন। তারা মৃত্যুর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য। অন্য মানুষেরা যেমন মৃত্যু এড়াতে পারেন না তেমনি নবী রসূলরাও মৃত্যুকে জয় করতে পারেনা কখনও। এজন্যই মুহাম্মদ (সাঃ) তার মূর্ত্তি গড়তে বা ছবি বানাতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা পরর্তীতে এই মূর্ত্তি বা ছবি ঈশ্বরের স্থান নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তের পথে চালাবে। কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী নবী রাসূলরা সবাই মারা যান কিন্তু আল্লাহ সব সময় জীবিত। কোন সময় তিনি ঘুমান না অথবা তন্দ্রাচ্ছন্নও হননা।

ইসলাম সে জন্য আল্লাহকে ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। তার কাছেই সমস্ত প্রার্থনা করতে হবে। তৌহিদবাদের এই ধারণা কোন ভাবে লঙ্ঘন করা মুসলমানদের দ্বারা সম্ভব নয়। ইসলামের এই মৌলিক চিন্তার প্রেরণায় আল্লাহ কিংবা রসূলদের মূর্ত্তি নির্মান করা হয়না। ছবি বা মূর্ত্তিকে মানুষ আসল স্রষ্টা ভেবে বসেন এবং এই ধারা বজায় থাকার ফলে অল্পদিনের মধ্যে আসল স্রষ্টা আল্লাহকে মানুষ ভুলে যায়। মানুষের অতীত ইতিহাস এর বহু প্রমাণ পেশ করে। প্রায় চার হাজার বছর আগে ইব্রাহিম (আঃ) ও তার পুত্র ইসমাইল (আঃ) এর চেষ্টায় কাবা ঘর নির্মিত হয়েছিল। এই কাবাঘর ছিল তৌহিদ প্রচারের কেন্দ্রভূমি। এখান থেকে তৌহিদের সূর ঝংকৃত হয়েছিল সারা বিশ্বে। কিন্তু কালের করাল গ্রাসে এই পবিত্র কাবা গৃহেই দীর্ঘ দিন ধরে স্থান করেছিল ঐ ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আঃ) এর মূর্ত্তি। সেই সঙ্গে আরোও তিন শতাধিক মূর্ত্তিও পূজিত হত কাবা

গৃহে। এক একটা মূর্ত্তি বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটণা নিয়ন্ত্রনের নিয়ন্ত্রক ভাবা হত। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এ সকল মূর্ত্তিগুলি অপসারিত হয় নবদীক্ষিত মুসলমানদের দ্বারাই। এইভাবে ইসলাম তৌহিদের সমস্ত দিক যেমন সুদৃঢ় করেছে তেমনি মূর্ত্তি বা ছবি পূজোকে একেবারে নিষিদ্ধ করেছে।

সারা পৃথিবীতে মসজিদগুলোতে কোন প্রকার মূর্ত্তি বা ছবির স্থান দেওয়া হয়না। মসজিদ মূলতঃ সাধারণ ভাবে নামাজ আদায়ের জায়গা। এখানে একমাত্র পরম প্রভু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করা হয়। মুসলমানেরা এই আল্লাহর কাছে যা কিছু চাওয়ার তাই চান, মুসলমানেরা ভেবে থাকেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন কিছু দিতে পারেন না। সেজন্য নবী (সাঃ) তার কোন প্রকার ছবির অনুমতি দেননি। তিনি তো আল্লাহ থেকে আলদা। বরং তিনি ছিলেন মানুষকে সুধরানোর জন্য আধ্যাতিক নেতা, এক মানবিক সত্ত্বা। তিনি ছিলেন সংস্কারক, সেই সঙ্গে সতর্ককারী। তাই নবী (সাঃ) এর কোন মূর্ত্তি, আবক্ষ, ছবি প্রভৃতির রূপ গ্রহণ একেবারে অন্যায় কাজ, অপরপক্ষে নবী (সাঃ) এর কোন কার্টুন বা ব্যাঙ্গচিত্র বানানো খুব বড় অন্যায় কাজ।

নবী (সাঃ) এর এধরণের দৃশ্যযোগ্য কিছু বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে কোন কোন গোষ্ঠী উপস্থিত হন। এর প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা করে থাকেন। সম্প্রতি একজন ডাচ কার্টুনিস্ট নবী (সাঃ) কে কার্টুন ছবিতে প্রকাশ করেন এমনকি সেটা Jylland Posten নামে একটি ডাচ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। মুসলিমরা অবশ্যই এই ধরণের কাজকে 'ব্লাসফেমি' বলে মনে করেন। একাজ তাদের কাছে ধর্ম নিন্দার সমতুল্য বলে মনে হয়। পশ্চিমা দেশ গুলিতে যিশুখৃস্টকে এরকম চিত্রে প্রকাশ করাকে যেমন অন্যায় ভাবা হয়েছে মুসলমানেরাও এটাকে সেই রকম অন্যায় ভেবে থাকেন। পশ্চিমের দেশে যিশুকে নিয়ে এরকম নাটককে বন্ধ করা হয়েছে। খৃস্টান ভাইদের প্রতিবাদে। মহান মানুষেরা ধর্মের সম্পদ। তাদের নিয়ে কোন সময় কৌতুক করা উচিত নয়।

স্বাধীনতা মানে কোন সময় এই নয় যে তার দ্বারা কোন পবিত্র জিনিস

অপবিত্র হবে। স্বাধীনতার নামে কোন ধর্মের মানুষের উপর যেমন আঘাত দেওয়া ঠিক নয় তেমনি যাতে কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও কোন রকমভাবে অসম্মানিত না হয় তা খেয়াল রাখা দরকার। এটা সত্যি যে স্বাধীনতা কোন সময়-এ অধিকার প্রদান করেনা যাতে কারোর কোন ধর্ম লেখা, আচরণ বা কথা দ্বারা বিঘ্নিত হয়। প্রতিটি জাতি তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলোকে যাতে মর্যাদার সাথে পালন করতে পারেন তার অধিকার রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাচ কার্টুনিষ্ট কিভাবে নবী (সাঃ) এর ব্যঙ্গচিত্র অংঙ্কন করতে পারলেন তা ভাবার বিষয়।

সারা মুসলিম দুনিয়ার কেউই নবী রসূলদের ছবি আঁকেন না। যিশুখৃস্টের পিতা ছিলেন না বলে মুসলমানেরা মনে করেন। পবিত্র কুরআন অন্য ধর্মের দেবদেবীদের কোন প্রকার গালমন্দ করা, অশ্রদ্ধা করা কিংবা বিকৃত করাকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। এধরণের আচরণ অপর ধর্মের সাথে করা হলে পরক্ষনেই তা নিজের ধর্মের প্রতি করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও দিনের পর দিন অবস্থার আরো অবনতি ঘটছে।

নবী (সাঃ) কি তরবারির জোরেই ইসলাম প্রচার করেছিলেন?

প্রতিটি নবী-রসূল তাদের নিজস্ব নিয়মে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা– ইসলাম প্রচার করেছেন। সময়ের বিভিন্নতা ও স্থান ও পরিবেশের বিভিন্নতায় নবীদের ইসলাম প্রচারের কৌশলও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছিল। এক নবীর সময় ও স্থান অন্য নবী থেকে ভিন্ন ছিল তাই তাদের মিশনের ধারাও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এটা সত্য যে ইসা (আঃ) ইসলাম প্রচারের জন্য কোন যুদ্ধ করেননি, কারণ যুদ্ধ করার কোন পরিস্থিতি তার সামনে উপস্থিত হয়নি। কিন্তু নবী (সাঃ) সত্য ধর্ম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, নবী (সাঃ) তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কোরাইশদের শান্তির বৈঠকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোরাইশরা তার কথায় কোন প্রকার কর্ণপাত করেননি। বরং উল্টে তার প্রতি অমানসিক ব্যবহার করেছে। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের ঘর থেকে বহিস্কার করেছে। এমন কি তিনি এবং তাঁর সাথীরা বাধ্য হয়েছেন নিজ মাতৃ ভুমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে। কুরাইশরা দৈহিক ও মানসিক ভাবে কি চরম অত্যাচার করেছিল তা ইতিহাস ভুলতে পারবে না। ইসলামে আমন্ত্রিত হয়ে যখন লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তখন তাদের প্রতি যেমন গালিগালাজ দেওয়া হয়েছিল তেমনি তাদেরকে দৈহিক শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল নির্মমভাবে। মদিনায় গিয়েও মুসলিমরা শান্তিতে থাকতে পারেনি। বিভিন্ন ভাবে মদিনাবাসীদের চাপ দেওয়া হচ্ছিল যাতে করে মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলিমদের তাদের হাতে ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু কোরাইশরা এ চেস্টায় যখন ব্যর্থ হল তখন মদিনার আনসার গোত্রের প্রধানদের বললেন তারা যেন নবী (সাঃ) কে হত্যা করেন নচেৎ তারা মদিনা আক্রমন করবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে তাদেরকেও ধ্বংস করে ফেলবে। এরকম পরিস্থিতিতে হয় মরতে হবে নচেৎ ইসলামকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নবী (সাঃ) প্রতিরোধ

ব্যবস্থাই গড়ে তুললেন।

এই হল নবী (সাঃ) এর যুদ্ধ গল্প। ইসলামের শত্রুরা জোর করে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপরে যুদ্ধবাজ বলে দোষারোপ করে থাকে। আসলে নবী (সাঃ) এর দ্বারা প্রচারিত ইসলামী মিশনকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ইসলামের শত্রু পক্ষেরা। তাই তিনি যুদ্ধ করতে বধ্য হয়েছিলেন।

দায়িত্বশীল কোন নেতার কখনই উচিত হবেনা শত্রুপক্ষের আক্রমণের হুমকিকে লঘু করে দেখার। অন্ততপক্ষে নবী (সাঃ) কে শত্রুপক্ষের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী উত্তরসূরী আদর্শ নেতাদের জন্য এক সাহসী নজির সৃষ্টি করার একান্ত দরকার ছিল। নবী (সাঃ) যে যুদ্ধ নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করেই। আর এতে সবচেয়ে কম ক্ষতি করে মানবতার বৃহত্তম সফলতা তিনি দেখিয়েছিলেন। মানব সমাজের ক্রমবিকাশে যুদ্ধ সব সময় বর্তমান ছিল। কিন্তু ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যায় মাঝে মাঝে এ যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে সংরক্ষণ করেনি বরং তা ধংস করেছে মারাত্মক ভাবে। কিন্তু নবী (সাঃ) এর জীবনে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে মানব সভ্যতার সংরক্ষণ ঘটেছে বেশী। ক্ষতির পরিমান নগন্য।

দশ বছরে যুদ্ধের জন্য তিনি ব্যয় করেছেন মাত্র কম বেশী তিন মাস। এক একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মাত্র একদিনেরও কম সময় নিয়ে। আর দশ বছরের প্রায় ৩৫৫৫ দিন তিনি সময় ব্যয় করেছেন পৌত্তলিক অধঃপতিত এক সমাজের বৈপ্লবিক সংস্কারের কাজে। অধঃপতিত এক সমাজকে তিনি পরিবর্তন করে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলার যে পরিবেশ রচনা করেছিলেন তা নজির বিহীন ঘটনা। সারা আরব উপদ্বীপের অন্ধকার যুগের সমাপ্তি তিনি ঘটিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যায় নীতি ও সত্যের সাম্রাজ্য। যেখানে বিরাজ করেছিল সততার এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। সমাজের যতরকম পাপ ছিল তা বিদায় নিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে। নবী (সাঃ) সারা জীবনে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে প্রাণহানি ঘটেছিল মাত্র ১০১৪ জনের। তাও আবার নিজ পক্ষের প্রাণ গিয়েছিল ২৫৫ জনের। যুদ্ধে যত জন যোগদান করেছিল তার মাত্র ১.৫% লোকই প্রাণ হারিয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন যুদ্ধ

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে প্রাণ হানির সংখ্যা কত বেশী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ গিয়েছিল ১.৭ কোটির মত। এবং সেই সাথে সাধারণ নাগরিকের প্রাণ যায় ৫.৪৮ কোটি।

কিন্তু যেকেউ প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন তুলতে পারেন সেই সময়ে ও সেই অবস্থাতে নবী (সাঃ) কি কোনওভাবে সফল হতে পারতেন যুদ্ধ ছাড়া প্রাথমিক অবস্থাতে মিশনকে সফল করতে। তিনি যতটা সম্ভব সংঘর্ষকে এড়িয়ে গেছেন। তখনকার অবস্থাতে যুদ্ধ পরিচালনার শক্তিও যেমন তার ছিলনা তেমনি রসদও ছিলনা পর্যাপ্ত পরিমাণে। হিজরত করার পর মদিনায় তিনি তার মিশনের মিলিটারি শক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইসলাম প্রাক-যুগে যুদ্ধ বিগ্রহে এমন নীতি সংযোজিত হয়েছিল যেখানে লুট-পাট, হত্যা ধর্ষণ, ফসল হানিকরণ প্রভৃতি যোদ্ধাদের সাধারণ আচরণ হিসাবে জুড়ে গিয়েছিল। তাই এরকম পরিবেশে নবী (সাঃ) কে তার মিশন বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধনীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল প্রাসঙ্গিকভাবে।

কুরআনে যুদ্ধের ব্যাপারে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তা আলোচনা করলে অবাক হতে হয়। নৈতিক যে সকল নিয়মাবলী জেনেভা চুক্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে তার সবটাই কুরআন থেকে নেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। ইসলামের যুদ্ধনীতিতে পরিস্কার ভাবে জানানো হয়েছে যে যুদ্ধ কেবল প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত হবে। সাধারণ নাগরিক, নারী, শিশু, বয়স্কদের কোন সময় আক্রমণ করা উচিত হবে না। ধর্মীয় স্থান– তা মন্দির, গীর্জা, মসজিদ প্যাগেডা বা সিনাগগ যাই হোক না কেন, তা কোন দিন ধংস করা যাবেনা। জীবজন্তু, পশুপাখি, মাঠের ফসল কিংবা জল সরবরাহ– উৎসও নষ্ট করা যাবে না। শত্রুপক্ষ যখনই শান্তি চাইবে তখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। মুসলমানেরা সব সময় বেশী বেশী করে শান্তি সহিষ্ণুতার সাথে অন্যান্য ধর্মাবালম্বী মানুষদের নিয়ে বসবাস করতে চায়। অন্য ধর্মের মানুষদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে কোন সময় আঘাত করতে চায় না।

ইসলাম কি বলপূর্বক প্রসার লাভ করেছিল?

ইসলাম বলপূর্বক প্রসারলাভ করেছিল– এ কথা একেবারে বলা যেতে পারে না। কুরআনের ঘোষণা,

"ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তা ধারা থেকে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ইমান আনল সে এমন এক রজ্জু ধারণ করল যা কখনই ছিঁড়ে যাওয়ার নয়। আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন" (কুরআন– ২:২৫৬)

কিন্তু জনপ্রিয় একটা মিথ্যা রটনা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে যে সারা পৃথিবীতে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটেছে তরবারির দ্বারাই। রাজনৈতিক খপ্পরে পড়ে কিছু পাঠ্য ইতিহাস এবং কিছু পক্ষপাত দুষ্ট মিডিয়া এই ধরণের মিথ্যা কথাটিকে খুব দক্ষতার সাথে ছড়িয়েছে। ভারতে এ কাজটি করেছে কিছু কট্টর পন্থি রাজনৈতিক দল। মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে ভোটের মেরুকরন করাই তাদের লক্ষ্য। ইতিহাসের বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে জাতির সর্বনাশ করার জন্য তাদেরকে ধিক্কার দেওয়া দরকার। অবশ্য এই সকল কট্টর রাজনৈতিক দলগুলো কেবল ঔপনিবেশিক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মিথ্যা ইতিহাস অন্ধের মত গিলেছে। ইংরেজরা যে প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যকে ভাঙ্গার জন্য মিথ্যা নীতিটা গ্রহণ করেছিল তা এই রাজনৈতিক দলগুলো অনুভব করতে পারছে না। বাস্তব ঘটনা, মুসলমানেরা ৬৫০ বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেছে তথাপি

বর্তমানে ভারতে ৮০% হিন্দু বসবাস করছে। যদি তরবারির জোরে মুসলমান করা হত তাহলে ভারতে একজনও তো হিন্দু থাকার কথা ছিলনা। 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে'। একথা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কথা। এটি প্রমাণ করতে এই উদাহরণই যথেষ্ট।

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশ গুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব বিশ্বে ৭ বিলিয়ন মানুষের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ১.৭ বিলিয়ন, আবার এদের মধ্যে আরবরা মাত্র ২২%। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মুসলিম জনবসতি ইন্দোনেশিয়ায়। এটির অবস্থান অবশ্য ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র আরব থেকে একবারে উল্টো দিকে। দূরত্ব অর্ধপৃথিবী পাড়ি দেওয়ার পথ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ গুলোতে মুসলামনদের বাস ৪০০ মিলিয়ন তার মধ্যে ভারতে বাস করে থাকে ১৫০ মিলিয়ন মুসলিম। বাংলাদেশের মত একটা দেশ যেখানে হিন্দু সংস্কৃতিই প্রধান সেখানে মুসলিম জনসংখ্য ১২০ মিলিয়ন।

বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ৩০% মুসলিমরা সংখ্যালঘু পর্যায়ের। ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড স্টেট, ইউনাইটেড কিংডম, ইউরোপ এবং রাশিয়ার দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিমরা সবাই সংখ্যালঘুদের দলে। আফ্রিকা মহাদেশগুলোতে বেশ ভাল ভাল দেশে মুসলিম জনবহুল হলেও সেখানকার শাসকরা মুসলিম ছিলেন না কখনও। অপর পক্ষে স্পেন ও ফিলিপিন্স মুসলমানেরা দীর্ঘ দিন শাসন করলেও সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা খুবই নগন্য। তবে এটা খুব চাঞ্চল্যকর খবর যে গণতান্ত্রিক উন্নত পশ্চিমাদেশ গুলোতে যেমন ইউনাইডেট স্টেট, ইউকে, স্কান ডিভিয়ান ন্যাশন্স, ফ্রান্স ও জার্মানিতে ইসলাম দ্রুত প্রসারশীল ধর্ম হিসাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

ঐতিহাসিক গবেষণায় এটা প্রমানিত যে ইন্দোনেশিয়া এবং মালএশিয়ায় মুসলমানেরা কখনও কোন সৈন্য প্রেরণ করেনি। এসব দেশগুলোতে সমুদ্রপথ বেয়ে ইসলাম পৌঁচেছে। সাধারণত মুসলিম নাবিক ও মুসলিম ব্যবসায়ীরা এ সকল দেশে ইসলাম পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু পরে এখানকার বাসিন্দারা ইসলামকে ভালবেসে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানকার পূর্বকালীন বেশভূষা, খাদ্যাভাস, ভাষা ইত্যাদি অপরিবর্তীত

থেকে গেছে দারুনভাবে।

ইসলামের ইতিহাস এটা সাক্ষী দিচ্ছে যে ইসলাম যে দেশ গুলোতে বিজয়ী হিসাবে প্রবেশ করেছে সেখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম অবস্থা বিরাজ করছে। ইসলাম কেবলমাত্র সাম্রাজ্য দখল করতে যায়নি, সেখানকার মাটিও যেমন তারা জয় করেছিল তেমনি মানুষের হৃদয়ও তারা জয় করেছে। মুসলমানেরা তাদেরকে ধর্মীয় নিরাপত্তা দান করেছিল যারা তাদের পূর্ব ধর্মমতে বিশ্বাসী থাকতে চেয়েছিল। এর উদাহরণ মিশর ও লেবানন। ইসলাম কখনও এদের ঐতিহ্যগত সম্পদ বা সম্পতিকে ধংস করেনি। স্ফিংস, ফারাওদের মন্দির এবং পিরামিড আজোও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইরানে পার্সেফোলিস এখনও সংরক্ষিত।

ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু মন্দির বরবুদূর ও বালি মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায়। আর এগুলো পরিদর্শন করার জন্য লক্ষ লক্ষ পর্যটক সারা পৃথিবী থেকে পাড়ি দেন এখানে।

এখন ভারত উপমহাদেশের দিকে একটু লক্ষ করা যাক। এর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আরবের সাথে লেগে থাকা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সাথে জুড়ে আছে। এটা সত্য যে ইসলাম-ভারতবর্ষে সৈন্য নিয়ে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করে সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কেরল উপকূলের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে নবী (সাঃ) এর আমলেই মুসলমানেরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। এই সকল মুসলমানেরা ভারত উপদ্বীপের কূল ধরে বসবাস করেছিল দীর্ঘ সময় ধরে। একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদের বসবাস সম্বন্ধে ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনকি দিল্লির মুঘল শাসকরাও ততটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না এই সকল মুসলমানদের সম্বন্ধে। কেরলে ইসলাম প্রবেশ করেছিল আরব বণিকদের দ্বারা। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা এই সকল বণিকদের অনেক দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন কারণ তারা সমুদ্র উপকুলে ছোট নদীগুলিতে নৌকা যোগে ব্যবসা চালাতেন যেগুলো ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে নিষিদ্ধ ছিল। যেহেতু এই

সকল রাজ্যগুলিতে নৌবাণিজ্য অনেক উন্নতি সাধন করেছিল সেজন্য দেশীয় রাজারা এই সকল বণিকদের অনেক কাজে উৎসাহ দিতেন, এমনকি দেশীয় লোকেদের মুসলামানদের সাথে মেলামেশা করতে কোন রকম বাধা দিতেন না যাতে করে দেশীয় লোকেরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে মৎস্যজীবিরা ইসলাম গ্রহণ করলেও শাসকদের কোন প্রকার আপত্তি থাকতনা। তারা এটা মনে করত যে সমস্ত মৎস্য জীবি এক মুসলিম পরিবার থেকেই এসেছে। ইবনু বতুতার বর্ণনায় এ ধরণের অনেক সাক্ষ্য মেলে যখন তিনি ভারতে এসেছিলেন ও মালদ্বীপ ভ্রমণ করেছিলেন।

এমনকি ভরতবর্ষের উত্তরাঞ্চল যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশী লোকেদের মধ্যেও সেখানে ইসলামের প্রভাব পড়েছিল। এখানে কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেছিলেন। তিনি সিন্ধুবাসীদের অগাধ ভালবাসা পেয়েছিলেন। রাজা দাহিরের অত্যাচারি শাসনের মধ্যে যে সকল লোকেরা বাস করত তারা সকলে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সাদর সম্ভাষন জ্ঞাপন করেছিলেন। খলিফা সুলাইমিন ইবনে মারওয়ানের আদেশে মুয়াবিয়া ইবনে মুহাল্লাবের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে দামাস্কাসে বন্দী হিসাবে প্রেরণ করা হলে সমস্ত সিন্ধু বাসীরা কেঁদেছিলেন। এমন কি তারা তাকে এতটাই ভালবেসেছিল যে তার একটি স্ট্যাচুও নির্মান করেছিল। (Ref. Jackson A.V. History of India Vol-5, The grokier Society, London, Boroda Edition 1907 Page- 14) মুহাম্মদ বিন কাসিম তার সৈন্য বিভাগে জাঠ এবং মেহদিদের নিযুক্ত করেছিলেন যারা ভীষণভাবে রুষ্ট হয়েছিলেন রাজা দাহিরের শাসনে। রাজা দাহিরের শাসনে তারা এতটাই বিরক্ত ছিলেন যে একজন আগুন্তুকের হাত শক্ত করতে তারা কোন রকম দ্বিধা দেখাননি। রাজা দাহিরের শাসনে তাদের কোন মর্যাদা দেওয়া হত না বরং নানান দিক থেকে অত্যাচার চালান হত তাদের উপর। তারা ঘোড়ায় চড়তে পারত না, মাথায় শিরস্থান পরা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি ভদ্র পোষাকও তারা পরতে পেতনা। তাদেরকে দিয়ে জল তোলা এবং কাঠ কাটানোর কাজ করানো হত কঠোরভাবে। (Ref. Eswari Prasad,

History Medieval India)

ইসলাম প্রথমে সেই সব জায়গাগুলোতে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল যেখানে বৌদ্ধরা বাস করছিল, যদিও তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের বিশাল অংশে বৌদ্ধরা বাস করত তখন। সে সময় ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৌদ্ধরা মারাত্মকভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল। একইভাবে বাংলা, উত্তর পশ্চিমে সীমান্তবর্তী রাজ্য গুলি এবং পাঞ্জাবে বসবাসকারী বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে। ভারতবর্ষের মাটি থেকে বৌদ্ধরা অলৌকিভাবে উধাও হয়ে যায়নি। বরং অত্যাচারের মুখে পড়ে তারা দেশ ছেড়েছে অথবা ইসলাম গ্রহণ করে আশ্রয় পেয়েছে। এতে তারা দ্রুত অনেক সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে। যখন খলিফা দ্বিতীয় উমার উমাইয়া শাসনের খলিফা হয়েছিলেন তখন তিনি সিন্ধু প্রদেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দাহিরের পুত্র ইসলামের বৈশিষ্ট ও কৃষ্টির কথা বুঝেছিলেন এবং পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(Ref. William Jackson A.V.(ed) History of India vol.-5 Page- 15)

দিল্লির সুলতানদের প্রতি অনেক অভিযোগ আছে যে তারা জোর করে বহু লোককে হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমান করে নিয়েছিলেন, আলাউদ্দিন খিলজি ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ বেনিয়া হিন্দুরা নাকি জিজিয়া ফাঁকি দেওয়ার জন্য এরকম কৌশল অবলম্বন করে থাকত। বেনিয়া শ্রেনির এরকম চাতুরি বন্ধ করার জন্য আলাউদ্দিন খিলজি এ ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

আকবরকে ইতিহাসে মুসলিম শাসক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে ইসলামে তিনি তার প্রজাদের দীক্ষিত করারই কথা। কিন্তু বাস্তবে তিনি অনেক সংস্কার করেছিলেন হিন্দু নিয়ম মেনেই। তিনি এমন অনেক সংস্কার করেছিলেন যা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্বাভাবিকভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণে তিনি যেটাকে আপত্তিকর মনে করেছেন সেটাকে তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তিনি বাল্য বিবাহ, আগুনের উপর হেঁটে অগ্নি পরীক্ষা দেওয়া এবং

পশুবলি নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ ও স্বেচ্ছায় সতী হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেননি এই কারণে যে পাছে সর্বত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিয়েতে বর ও কনে স্বাধীন সম্মতিরও তিনি অনুমোদন করে ছিলেন। (Ref. William Jackson Av History of India Vol- IV)

কোন মুসলিম শাসকই তাদের কোন প্রজাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেননি, বরং মুসলিম সাধু সন্তারা ছিলেন অতিশয় দয়ালু। তারা অসুস্থ, দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য যে সকল সেবামূলক কাজ করেছিল তা নজির বিহীন। তাদের এই মানবিক কাজ দেখেই দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আজমিরের দরগাহ, মেহবালি এবং নিজামউদ্দিন বস্তির সেবামূলক কাজ অসংখ্য ভক্তের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। মুসলিম সাধু সন্তরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করলেও দরিদ্র মানুষেরা তাদের দরজা থেকে কোন সময় ফিরে যায়নি। এই সকল মহৎ মানুষেরা সকালে কি খাবে তা না ভেবে সন্ধ্যায় ভাঁড়ার শূন্য করে অসহায় জনসাধারনের জন্য ঢেলে দিয়েছেন। অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্যও তারা নিয়োগ করেছিলেন স্বাস্থকর্মী যারা বিনা পয়সায় রোগীদের চিকিৎসা করতেন। ইতিহাস বলছে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সময়ে দিল্লির সুলতানি আমলে দিল্লি বেশ কয়েক বার বিরোধী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এ সময় নিজামউদ্দিন আউলিয়ার স্বাস্থনিবাস ও খানকাহ কোন সময় আক্রান্ত হয়নি।

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মির মুসলমান অধ্যুসিত রাজ্য। কিন্তু এখানকার লোকেরা মধ্য এশিয়ার সুফি সন্তদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এগুলো হিন্দু রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম শাসিত রাজ্যে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ১২%। ১৯৪৮ সালে যখন এটি ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয় তখনও এটি মুসলিমদের শাসনে ছিল এবং দীর্ঘ চারশ বছর ধরে মুসলিমদের শাসনেই চলছিল।

জলন্ধরের হিন্দু সম্প্রদায়ের জাঠেরা সুলতানি জাঠ নামে পরিচিত ছিল। কারণ তারা সুলাতন সাকি সারওয়ারের ভক্ত ছিল। যার দরগাহ

বর্তমানে পাকিস্তানে পড়েছে। এই সকল জাঠেরা কেবল হালাল মাংসই খেত এবং হুক্কা দ্বারা ধূমপান করত। তারা তাদের গ্রামের প্রান্তে তাঁর মাজার প্রতিষ্ঠা করে তা প্রতি বৃহস্পতিবার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করত এবং সাজিয়ে দিত আলোর মালায়। সাকোতে অবস্থিত সুলতান সাকি সারওয়ারের মাজারে তারা যাত্রাপালাও বসাতে খুব ধুম করে।

একবার শিখ শাসন আমলে মূলতানের গভর্নর সাডানমল এই যাত্রাপালা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন। এই মেলায় যোগ দানকারী প্রতিটি হিন্দুর প্রতি ১০০ টাকা লেভি বসানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যাত্রাপালা চলতে থাকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

দীর্ঘ আলোচনায় ভারতবর্ষের মুসলিম শাসক ও হিন্দুদের সুসম্পর্কের কথা আলোচনা হয়েছে। এখন আমাদের কিনিয়া তানজেনিয়া ও মাদাগাস্কার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। এসব জায়গায় মুসলামন আক্রমনের ঘটনা কোন সময় ঘটেনি। তবুও মুসলমানদের জন সংখ্যা এখানে প্রচুর। তানজেনিয়ার মুসলিম জন সংখ্যা ৭০%। কিন্তু এ এলাকা সব সময় খৃস্টান শাসিত ছিল।

ইসলাম গভীরভাবে ইউরোপের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে পেরেছিল। পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চল গুলোও অটোম্যান তুর্কিদের দ্বারা দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে শাসিত হয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া অন্যান্য স্থানে মুসলিম জন সংখ্যা বেশী হয়নি। আলবেনিয়ায় যেখানে ৯০% মুসলিম ছিল সেখানে বসনিয়া ও হরজগভিনা ছিল যুগশ্লাভিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ডমিনেন্ট রাজ্য। আর এটা স্থিতি লাভ করেছিল সেদিনও পর্যন্ত যতদিন বসনিয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত না হয়েছিল।

অপরপক্ষে স্পেন যেটি আট শতাব্দী ধরে মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা নগন্যই। কোন সময়ই মুসলিম সংখ্যাগুরু স্থান লাভ করেনি। স্পেনের এই মুসলিম শাসনে খৃস্টান ও ইহুদি উভয়েই তাদের পূর্ব ধর্মের সব কিছু আচার আচরণ করতে পারত স্বাধীনভাবে। কাহিনীগুলো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু যখন সেখানে খৃস্টান

শাসন কায়েম হল তখন ইহুদী ও মুসলমান উভয়কেই জোর পূর্বক খৃস্টান করা হল ব্যাপকভাবে। যারা খৃস্টান হতে চাইলনা তাদের দেশ ত্যাগ করতে বলা হল অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হল অমানবিকভাবে।

বর্তমানে আরব দেশগুলিতে খৃস্টানরা উল্ল্যেখযোগ্য ভাবে বাস করছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে এখানেও ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা হয়নি কখনও।

মুসলিমদের ইসলাম প্রচার কিভাবে হয়েছে তা আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক স্যার টমাস আরনল্ড লিখেছেন,

> "ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে মুসলিম যোদ্ধারা যে একহাতে কুরআন ও অপরহাতে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়েছিল তা এক অলীক কাহিনী বরং কোরআনের শিক্ষা ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র দিয়েই ইসলাম প্রচার লাভ করেছিল।"

ইউরোপের মানুষের কাছে ইসলামের আমন্ত্রণ ছিল খোলাখুলি ও পরিস্কার। তারা ইসলাম সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশোনা করেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার পর ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের কোন আপত্তি ছিলনা। বর্তমানে খোঁজখবর নিলে দেখা যাবে নুতন ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া জন সংখ্যার ৭০% হল মহিলা। এ ঘটনা থেকে ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার হয়েছে-কাহিনীটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন শত্রুতাই বর্তমান ঘৃণা

পাশ্চাত্যের দ্বারা ইসলামকে রুঢ় কঠোর বলে প্রচার করার পেছনে অনেক বড় ইতিহাস রয়েছে। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে লড়াই চলেছে। আরব উপদ্বীপে ইসলাম উত্থান লাভের পর মাত্র একশত বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ইউরোপের দ্বারগোড়ায় তার মহান আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছিল। ৭১২ খৃস্টাব্দ নাগাদ উমাইয়া জেনারেল তারিক বিন জিয়াদ স্পেনের ইবেরিয়ান উপদ্বীপ জয় করেন। এবং তারপরে প্রায় আট শতাব্দী ধরে স্পেন মুসলিমদের শাসনে থাকে। এখানেই ইসলাম তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করে চলেছিল। আর তৎকালীন সভ্য জগত বলতে মুসলিম শাসনকে বোঝাত। গ্রানাডা এবং কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার গুলো মিডল ইস্ট, আফ্রিকা ও ইউরোপের জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের পন্ডিতদের আকর্ষণ করে। তারা তাদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য জড়ো হয়েছিল কর্ডোভা ও গ্রানাডার ঐ সকল শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে।

ইসলামের তৌহিদ বা একত্ববাদ খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদের চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য বলে এই সব পন্ডিতেরা বুঝতে পেরেছিলেন। কুরআন যে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ছিল মৌলিকভাবে সংরক্ষিত। বিশেষত ইসলামে যে স্বাধীন চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে তা মানুষের কাছে এর আবেদনকে আর্কষণীয় করে তুলেছিল। শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে ইসলাম যে কত উদার তার প্রকাশ্য বিকাশ অন্যেরা দেখেছিল মুসলামানদের স্পেন শাসনের মধ্য দিয়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে খৃস্টানরা অনেকটা হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে। তাই তারা ইসলামের আদর্শগত ও ধর্মীয় উভয় নীতির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল খুব কৌশলের সাথে। প্রথমেই তারা নবী (সাঃ) এর ব্যক্তিত্বের দোষ

খুঁজে বের করতে চাইল। গালাগালি ও নিন্দাবাদ প্রচার করার জন্য তারা নবী (সাঃ) এর বাহুবিবাহ ও যুদ্ধ সম্বন্ধে নানান মিথ্যা কথা রটিয়ে প্রচারে নামল, ঠিক এই সময়ে ক্রুসেড যুদ্ধের পতন, সালাহ উদ্দিন আইবির উত্থান, এবং পূর্ব ইউরোপে তুর্কিদের প্রবেশ ইত্যাদি পাশ্চাত্যদের হিংসায় ঘৃতাহুতি দিল। আর এরই মোকাবিলায় ইসলামের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা বদনাম ছড়াতে লাগল সকল দিক থেকে। বর্তমানে মুসলমানেরা নানান দিক থেকে তার গৌরব হারাতে বসেছে। মুসলমানেরা আজ নানান ভাগে বিভক্ত, অন্য দিকে পশ্চিমিরা মধ্য প্রাচ্যের তেল হরনের জন্য লালসার বন্দুক উঁচু করে রেখেছে সব সময়ের জন্য। আরোও অনেক কারণে পাশ্চাত্য ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও বিদ্বষকে দ্বিগুণ করে তুলছে বর্তমান দশকগুলোতে। এর পরে বলতে অপেক্ষা রাখেনা কেন পাশ্চাত্য মিডিয়াগুলো ইসলামের প্রতি এত খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছে। তাদের ঘৃণা বর্তমানে রাগে রূপান্তরিত।

বর্তমানে ঐতিহাসিক আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে যে কি কারণে পাশ্চাত্য এবং ইসলামের সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতা বর্তমান। এ ব্যাপারে পন্ডিত জিয়াউদ্দিন সরদার আমাদেরকে গাইড করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> "Muslims became a 'problem' for Europe right from the birth of Islam. First, Islam was a theological problem. What was the purpose of an Arabian Prophet some 600 years after the crucifixion and resurrection of God's own son? Second, when Islam arrived - within a few decades of its inception - at Europe's borders, it became a political problem. Third the scholarly achievements of Muslim civilization made Islam an intellectual problem as well. Each aspect of the problem of Islam was tackled by specific means".
>
> Theologically, Christian Europe could only denounce Islam, its Prophet and its followers. Politically, Eu-

rope launched a series of Crusades against Islam. When these failed, it embarked on full-fledged colonization of the Muslim world. Intellectually, it created a series of disciplines to contain Muslim thought and history".

"ঠিক জন্ম লগ্ন থেকেই ইসলাম ইউরোপের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমতঃ ইসলামের আধ্যাত্মিক মতবাদ ইউরোপের কাছে ছিল এক সমস্যার। খৃস্টানদের নিকট এটা বিশ্ময়ের বিষয় ছিল যে খৃস্টের জন্মের ৬০০ বছর পর আবার একজন রসূলের দরকার হল কেন যখন খোদ ইশ্বর তার সন্তানকে ক্রুশবিদ্ধ করে সমস্ত পাপকে ধারণ করেছেন? দ্বিতীয়তঃ ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে কয়েক দশক পরে যখন এটা ইউরোপের সীমান্তে পৌঁছেছিল তখন দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক সমস্যা। তৃতীয়তঃ মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞানের পারদর্শিতা ও সভ্যতার বিকাশও বুদ্ধিগত সমস্যা বলে ইউরোপের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল।

আধ্যাত্মিকভাবে ইউরোপের খৃস্টান জগৎ ইসলাম, ইসলামের নবী এবং তার অনুগামীদের নিন্দা করেছে। রাজনৈতিকভাবে ইউরোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ চালিয়েছে একাধিকবার। আবার যখন এদিক থেকে ব্যার্থ হয়েছে তখন মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। আর বুদ্ধিগত ভাবে এটা একাধিক নীতিমালা প্রেরন করেছে যা কিনা মুসিলম ইতিহাস ও চিন্তা ধরে রেখেছে।"

1. ইসলামের উপর কালিমা লেপন

ইসলামের খুব প্রাথমিক লগ্নে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ) কে খুব নগ্নভাবে আক্রমন করার ধারা শুরু হয়েছিল। পল আল-ভারাস Book of Daniel নামে একটি বই ব্যবহার করতেন যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) খৃস্টানদের শত্রু ছিল বলে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। 'এটার সময়কাল ছিল নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর ঠিক পরেই। তারপর নানান সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে এবং এই ধরণের সাহিত্য 'Chanson de geste' নামে

পরিচিত হয়েছিল। এখানে নবী (সাঃ) এর প্রতি এতটাই ঘৃণা উদ্রেক করা হয়েছিল যে তাকে মাহাউন্ড বলে নিন্দা করা হত। (নাউজো বিল্লাহ মিন জালেক) পরবর্তীকালে এই সকল বিদ্রুপাত্মক রচনা নানান সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে থাকে এবং মধ্যযুগে দারুন প্রভাব ফেলে ইতালিয়ান, জার্মান, স্পেনিস, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি সাহিত্যের উপর। আর এ ধারা সপ্তদশ শতক পর্যন্ত একইভাবে চলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ ধারা একটু স্থিমিত হলেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অল্প কিছু দিন আগে সালমান রুশদীর মুহাম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদাকে নিয়ে নিন্দাবাদের ঝড় তোলে। এ সব নিন্দাবাদই Chansons Literature এর পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

2. ধর্মযুদ্ধ

১০৯৫ এর নভেম্বরে ক্ল্যারমোন্ডের বিখ্যাত Peace of god council -এ পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু করেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে War of god নামে আহ্বান জানানো হয়েছিল এই যুদ্ধে। এ আহ্বান ছিল জেরুজালেমকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা। খৃস্টানদের এই ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ইহুদিদের হত্যার মধ্য দিয়ে।১০৯৯ খৃস্টাব্দে ১৫ জুলাই ৪০ দিন অবরুদ্ধ করার পর ক্রুসেডাররা জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিল। মুসলিম ঐতিহাসিক আল আমীরের মতে তারা হত্যা করেছিল ৯০০০০ জনকে এদের মধ্যে নারী পুরুষ শিশু সবাই ছিল। প্রত্যক্ষদর্শী Raymund Aguiles এর বর্ণনা করেছে নিচের ভাষায়,

> "Wonderful sights were to be seen. Some of our men (and this was more merciful) cut off the heads of their enemies; others shot them with arrows, so that they fell from the towers; others tortured them longer by casting them into flames. Piles of heads, hands and feet were to be seen in the streets of the city. It was necessary to pick one's way over the bodies of men and horses. But these were small

> matters compared to what happened at the Temple of Solomon, a place where religious services are normally chanted. What happened there? If I tell the truth it will exceed the powers of belief. So let it suffice to say this much, at least, that in the Temple and porch of Solomon, men rode in blood up to their knees and bridle reins. Indeed it was a lust and splindid judgment of God that this place should be filled with the blood of the unbelievers since it had suffered so long from their blasphemies."

"ভয়ানক এক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল সে সময়। আমাদের কিছু লোক শত্রুপক্ষের লোকেদের মাথা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। কিছুলোক তাদেরকে বর্শায় বিদ্ধ করেছিল। মনে হচ্ছিল তারা যেন কোন টাওয়ার থেকে পতিত হয়েছে। কিছু লোক তাদের ধরে ধরে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করছিল দীর্ঘ সময় ধরে। লোকেরা যাতে দেখতে পায় সে জন্য শত্রুপক্ষের কাটা হাত পা ও মাথা গুলো রাস্তার ধারে ধারে স্তুপ করে রাখা হয়েছিল। মানুষকে হাঁটতে হলে মৃত ঘোড়া ও সব দেহের উপর দিয়ে পথ করে চলতে হত। কিন্তু এ সকল ঘটনা অনেকটা ম্লান হয়ে যাবে যদি আমরা মন্দিরের মধ্যে যা ঘটনা ঘটেছিল তা পুরোটাই বর্ণনা করি। সত্য ঘটনা যদি আমি বর্ণনা করি তা হলে তা এত লোমহর্ষক হবে যে তা বিশ্বাস করানো যাবেনা। অথচ মন্দিরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ধর্মীয় মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। কি ঘটেছিল মন্দিরে? অল্প বললেই যথেষ্ট হবে। মন্দিরের মধ্যে এতটা রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল যে লোকেদের হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ডুবেছিল। ঘোড়ার রেকাব পর্যন্ত রক্ত স্রোত পৌঁছেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে অবিশ্বাসীদের রক্তে মন্দির স্নাত হোক। যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে মন্দিরটি নিন্দাবাদের শিকার হয়েছিল।"

সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ক্রুসেডাররা রান্না করার পাত্রে মুসলমাদের সেদ্ধ করেছিল। শিশুদের নিয়ে তারা আগুনে রোষ্ট পর্যন্ত করেছিল। আর সারা দেশে ঘুরে ঘুরে স্যারাসিন মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছিল।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় খলিফা উমার (রাঃ) যখন ইসলামী শাসক ছিলেন ও ৬৩৮ খৃস্টাব্দে জেরুজালেম জয় করেছিলেন। তখন ইহুদি ও খৃস্টানদের পরম সম্মান জানিয়েছিলেন। কারোর কোন ক্ষতি সাধন করা হয়নি। যখন তিনি খৃস্টান প্যাট্রিআর্কের সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন তাকে এ আশ্বাস দেওয়া হল যে সমস্ত নগরবাসীর জীবন ও সমস্ত পবিত্র জায়গার নিরাপত্তা ও সম্মান দেওয়া হবে। হলি সেপালচারের চার্চের মধ্যে উমার (রাঃ) যখন প্রবেশ করলেন তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল, উমার (রাঃ) নামাযের জন্য প্যাট্রিআর্কের কাছে অনুমতি চাইলেন। প্যাট্রিআর্ক উমার (রাঃ) যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই নামায আদায় করার কথা বললেন। এতে উমার (রাঃ) বলে ফেললেন 'যদি আমি এখানেই নামাজ পড়ি তাহলে মুসলমানেরা ঠিক এই স্থানই দাবি করবেন তার পর তিনি নামাযের মুসাল্লাহাতে নিয়ে বাইরের উঠানে গেলেন এবং সেখানে খোলা জায়গায় নামায পড়লেন।

১১৮৭ খৃস্টাব্দে ২রা অক্টোবর খলিফা সালাহউদ্দিন আউবি যখন জেরুজালেম পুনরায় উদ্ধার করেছিলেন তখন দৃশ্য অন্য রকম ছিল। তিনি কঠোরভাবে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে করে কোন খৃস্টান ভাইদের স্পর্শ পর্যন্ত যেন না করা হয়। এবং পবিত্র জায়গাগুলোর যেন অমর্যাদা না হয়। তিনি ঘোষণা করলেন যে সকল খৃস্টান থাকতে চায় তারা নির্বিঘ্নে থেকে যাক আর যারা চলে যেতে চায় তাদের উপরেও কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অনেকেই চলে গিয়েছিলেন যাওয়ার সময় তারা লুটের সম্পদও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে ছিলেন।

হলি সেপালচার চার্চের সম্পদ লুট করেছিলেন আর্চ বিসপ নিজেই। এবং তা তিনি নিজেই নিয়ে পালিয়েছিলেন। যে সকল সম্পদ তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল অসংখ্য স্বর্ণখচিত কার্পেট, তাছাড়াও ছিল বহু মূল্যবান সম্পদরাশি।

সালাহউদ্দিন আইউবির সঙ্গি সাথিরা নানান দিক থেকে নিন্দিত হয়েছিলেন, যার ফলে তারা সালাহউদ্দিনের প্রতি বিক্ষুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তার কোষাধ্যাক্ষ ইমাম আল দ্বীন আল আসফানি আউবিকে

পরামর্শ স্বরূপ বলেছিলেন, "এই প্যাট্রিআর্ক কমপক্ষে দুলক্ষ দিনার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ নিয়ে যেতে অনুমতি দিতে পারি কিন্তু চার্চের সম্পদ নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারিনা। আপনি কখনই তাকে এঅনুমতি দেবেন না" কিন্তু সালাহউদ্দিন আইউবি উত্তর দিলেন, "আমরা আমাদের সন্ধী পত্রে যা স্বাক্ষর করেছি তা মানব যাতে করে কেউ না অভিযোগ তুলতে পারে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে। তারা যেন না বলতে পারে মুসলিমরা সন্ধী শর্ত লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে খৃস্টানরা সর্বত্র আমরা যে তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছি তা স্মরণ করবে।

কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় খৃস্টানরা সর্বত্র ছড়িয়েছে সালাহ উদ্দিন ছিলেন দুধর্ষ শত্রু, যিনি শিশুদের ভক্ষণ করেছেন, খৃস্টান নাইটদের হত্যা করেছেন এবং খৃস্টানদের সব পবিত্র ভূমি ধুলিস্মাত করেছেন।

ক্রুসেডাররা ইউরোপবাসীদের উপর ইসলামের ধারণাকে বিকৃত করে তুলেছিল দারুনভাবে। তারা ইউরোপে ইসলামকে অন্ধকার পাপ বলে তুলে ধরেছে। পরবর্তীতে এই বাঁধাধরা বিকৃত কুচিত্রই পরিবেশিত হয়েছে ইউরোপের কাছে। তাই সারা ইউরোপ ইসলামকে এক বর্বর, গোঁড়া, কামুক, লম্পট, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম হিসাবে জেনেছে। সারা ইউরোপীয় ইতিহাসে, সাহিত্যে ও খবরে ইসলাম মানে দুধর্ষ আক্রমণ ও লুন্ঠন ছাড়া কিছু প্রকাশ পাইনি। আর ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার কারণে ইসলামের বিকৃত রূপের পরিচয়ও সারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে যায় অনায়াসেই। এবং তাই এই ইসলামের এই বিকৃত চিত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সর্বত্র ফুটে ওঠে নোংরা লোকদের হাত ধরে বিভিন্ন সময়ে।

3. প্রাচ্য করণ

বিশেষ নিয়মনীতি বিবর্তিত হল যাতে করে মিথ্যা ইসলামী ধারণাকে একটি শিক্ষাগত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারা যায় তার উদ্দেশ্যে। নৃতত্ত্ববিদরা গবেষণায় রত হল পাশ্চাত্যের বাইরের সমস্ত খারাপ সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনার জন্য। আর তাদের হাতে ইসলামের প্রতি যে খারাপ

আচরণ হওয়ার সম্ভবনা ছিল তাই হল। তারা ইসলামের উপর যতটা ভয় ছড়াল ততটা ঘৃণাও ছড়াল।

পাশ্চাত্য পাদ্রী লেখকেরা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাসের বিকৃত রূপ পরিবেশন করে চলেছিল। আর তাদের বর্ণনায় ফুটে উঠেছিল মুসলমানদের চরিত্রের এক বিকৃত রূপরেখা, কুরআনকে দেখান হল প্রতিশোধ নেওয়ার এক যন্ত্র হিসাবে। অপরদিকে মুহাম্মদ (সাঃ) কে দেখান হল লম্পট চরিত্র হীন হিসাবে। মুসলিমদের চিন্তা ভাবনা ও শিক্ষাদীক্ষার অবদান চেপে দেওয়া হল বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাস থেকে।

পাশ্চাত্যকরণ মূলত কোন গবেষণা ছিলনা বরং তা ছিল ইসলামকে অবমাননা ও হীন করার ষড়যন্ত্র মাত্র। ইউরোপীয় লেখক, ভ্রমণকারী, ঔপন্যাসিক এবং শিল্পীরা তাদের লেখায় ও কাজে ইসলামকে বর্বর, যৌন কাহিনী, যাদু, কুসংস্কার প্রভৃতি বলে কটাক্ষ করেই চলল দীর্ঘ দিন ধরে। যে সকল ব্যক্তিরা এই হীন কাজে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে রিচার্ড বাটন, ইসাবেলা, ইবার হাট ও টি.ই লরেন্সের নাম উল্লেখযোগ্য।

4. ইউরোপে মুসলমি শিক্ষা বিস্তার

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত রকম উন্নতি ইসলামের হাত ধরেই এসেছিল। মুসলিম পন্ডিতদের সমস্ত রকম গবেষণাপত্র গুলো ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনবরত অনুবাদ হচ্ছিল এবং সারা ইউরোপে জ্ঞানের প্রসার ঘটাচ্ছিল। এই সকল অনুদিত গ্রন্থ ইউরোপের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ম্যানুয়াল ও পাঠ্যপুস্তকের স্থান পেয়েছিল বলা যেতে পারে।

ইউরোপের গবেষক ও পন্ডিত লোকেরা জড় হত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র কর্ডোভা, ফেজ, কায়রো, বাগদাদ, সমরকন্দ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঠিক যেমন করে বর্তমানে মুসলিম ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ছুটছে। বিজ্ঞান ও সমস্ত রকম সংস্কৃতির উন্নতির কথা আরবী ভাষার মধ্য দিয়েই চর্চিত হচ্ছিল সবার কাছে। যে সকল ব্যক্তিরা

শিক্ষা গবেষণার কথা ভাবছিলেন তারা সবাই মুসলিম পন্ডিতদের পোষাক পর্যন্ত পরিধান করতে কোন প্রকার দ্বিধা করেননি। ইউরোপের নবজাগরণে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, মানবতাবাদ যা কিছুর উন্নতি হয়েছিল তা মূলত মুসলিম চিন্তাবিদ ও পন্ডিতদের কাঁধে ভর করেই হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে ইউরোপের নবজাগরণ কোন দিন সম্ভব হত না যদি মুসলিম মনিষীদের অবদান ইউরোপীয়রা না পেতেন। এই আসল ধ্রুব সত্যটা কোন সময় ভুললে চলবেনা। কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় মুসলমানদের এই অবদানকে সব সময় পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। ইচ্ছাকৃত ভাবে এ সত্যকে গোপন করে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সব সময় মুসলিম অবদানকে নীচু করে দেখান হয়েছে এবং বিকৃত করা হয়েছে। যাতে করে মুসলিম অবদানকে কেউ না জানতে পারে তার সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে সকল দিক থেকে।

ইসলামের প্রতি ইউরোপীয়দের ভয়

মিনো রিভস্ তার বই 'Muhammad in Europe' এ লিখেছেন।

> "Islam was not only a military thread to Europe but also an ideological and moral challange because it enunciated an alternative Vision. In intellectual and cultural spheres the Arab world could mock at Europe. The Islamic world was far ahead of the Christian West in medicine, mathematics and in some aspects of physics such as optics, in astronomy, chemistry, botany and other natural sciences. With the adoption of the Indian zero, the Arabs had greatly simplified arithmetical exercises and had developed new disciplines in mathematics such as algebra, analytical geometry and spherical trigonometry. Until 1600 the chief medical textbook in Europe was the Canon of Medicine of Avicenna, an eleventh-century Perisian scientist and philosopher whose home-

land had become part of the rapidly expanding Islamic Empire. The Arabs established colleges of translation in Spain and Sicily which made the wealth of knowledge in Greek, Syriac, Persian and Sanskrit writings, abailable in Arabic. They were in turn translated into Latin. Great halls of science with libraries and astronomical laboratories were created alongside the translation colleges to promote research. Spain and Sicily thus became two major centres for intellectual and scientific exchange between East and West, contributing significantly to the emergence of European Humanism and the Renaissance."

"ইসলাম ইউরোপের কাছে শুধু স্বৈর শক্তির ভয় নয় বরং তা আদর্শগত ও নৈতিক চ্যালেঞ্জও বটে। কারণ এটি পরিবর্ত চিন্তার একটি সুদৃঢ় ঘোষণা। বুদ্ধিগত ও সংস্কৃতিগত বিষয়ে ইউরোপ আরব সাম্রাজ্যের তুলনায় নগন্য। বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেমন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চায় ইসলামী জগৎ ইউরোপের চেয়ে এগিয়ে ছিল তখন। ভারতীয়দের কাছ থেকে শূন্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে আরবরা পাটিগণিতের বিশাল সরলীকরণ সূত্র এনেছিলেন। এবং এর মধ্য দিয়ে গণিতের মধ্যে বিশাল নীতি নির্ধারণ নিয়মের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল আরবরা। আর তার ফলে জন্ম নিয়েছিল বীজগণিত, বিশ্লেষক জ্যামিতি, ও গোলকীয় ত্রিকোনমিতি। ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যে শাস্ত্র পড়ান হত তার নাম Canon of Medicine এটির লেখক ছিলেন আবিসিনা। ইংরেজরা তার নাম অ্যাভিসিনা বলে প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন একাদশ শতাব্দীর একজন পার্সিয়ান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তার আমলেই তার গৃহভূমিই ইসলামী দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তারকারী পীঠস্থান হয়েছিল। স্পেন ও সিসিলিতে আরব মুসলিমরা বিখ্যাত বিখ্যাত অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ছিলেন যেখানে গ্রীক, সিরীয়া, পার্সিয়ান ও সংস্কৃত ভাষার

নানান জ্ঞান বিজ্ঞানের বই অনবরত আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত করার ব্যবস্থা ছিল। এগুলো আবার পরে ল্যাটিন ভাষায়ও ভাষান্তরিত করা হত। আবার এই সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বা কাছাকাছি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মান মন্দির। এইভাবে স্পেন ও সিসিলি এমন এক কেন্দ্রস্থল হয়েছিল যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের একটি মজবুত সেতুর কাজ করেছিল। আর এর ফলে ইউরোপে মানবতাবাদী এক নব জাগরণের উন্মেষ সবাই দেখতে পেয়েছিল।"

মিনো রিভস আরোও লিখেছেন,

> But how could these Bedouin men of the desert, whose civilization had begun in tribalisn, achieve such high levels of sophistication and knowledge in such a short time? The Answer is simple. The freshness or the new religion had enabled the Arabs to extend their faith beyond the boundaries of the Arabian Peninsula into the highly civilized world of the Persians, the Greeks and the Byzantines. They had inherired the dazzling riches of Persian and Greek philosophies and had been remarkably apt in- imitating the courtly manners habits and traditions of the Persian nobility, aspects of which they introduced to southern Europe. The Europeans thus became more and more convivced of the superiority of Muslim culture, which made them envious and resentful. Consequently, Prophet Muhammad as the initiator and inspirer of this ever-growing success began to haunt them in all walks of life. Medieval Europe's (In European history, the Middle Ages, or Medieval period, lasted from the 5th to the 15th century. It began with the collapse of the Western Roman Empire) fear of Islam drove it to demonizing Prophet

Muhammad.

> Muslims would-do well to reflect why Europe, which had borrowed a lot: from them, forged ahead, while Muslim states stagnated. Historically, the intellectual stagnation in the Muslim world preceded Western colonialism and made resistance to its march difficult. In the West, the campaign of calumny of Islam and its Prophet Muhammad, which had begun when the Muslim world was resurgent, did not stop as Europe gained ascendaney. It acquired a sharper edge and greater assurance which, in turn, fuelled Muslim anger.
>
> (Minou Reeves, *Muhammad in Europe: A Thousand Tears of Western Myth-Making,* NYU Press, 2001)

"কিন্তু কেমন করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম বেদুইন মানুষেরা সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন? তাদের জ্ঞান শৈলীতো উচ্চ পর্যায়েরই ছিল। কিন্তু তাদের এ সভ্যতা শুরু হয়েছিল উপগোত্রীয় জীবন থেকেই। সাধারণভাবে বলা যায় নূতন ধর্মের তেজ দীপ্ততা এ আরবদের বিশ্বাসকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দিয়েছিল একটি বিশেষ নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধনে। যার ফলে তারা সমর্থ হয়েছিল তাদের জ্ঞানকে আরব উপদ্বীপের বাইরে পারস্য, গ্রীক ও বাইজানটাইনে বিস্তার করতে। তারা অর্জন করেছিল গ্রীক ও পারস্যের অত্যাশ্চর্য দর্শন। পারস্যের মহানুভবতা তাদের আচার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছিল দারুণভাবে। পরে তারা এগুলোকে দক্ষিণ ইউরোপে বিতরণ করেছিল দ্বিধাহীন চিত্তে। এইভাবে ইউরোপবাসী মুসলমানদের সবচেয়ে ভালভাল গুণগুলো গ্রহণ করেছিল। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন ইউরোপ বাসীদের অনুপ্রেরনাকারী শক্তি। মধ্য যুগের ইউরোপে ইসলাম ভীতি তাই মুহাম্মদ (সাঃ) কে দানবিক বানিয়েছিল।....."

5. ঔপনিবেশিকতাবাদ

একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই প্রায় একই কায়দায় মুসলিমদেশ গুলোর উপর উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এদের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড ছিল অগ্রগামী। এবং সবাই যে নীতি নিয়েছিল তাহল 'ভাগ কর এবং জয় কর'। উদাহরণ স্বরূপ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে সহজে মুঘল সাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে পারত। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধই ছিল ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু এটি ব্যর্থ হয়েছিল শোচনীয়ভাবে। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদূর শাহ জাফর মুক্ত বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন না। আর ব্রিটিশ বেনেরাও ব্যবসায় কোন প্রকার ছাড় পাক সেটাও চাইতেন না। ইংরেজদের ব্যবসায় ছিল তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ। কিন্তু পরবর্তী কালে তার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রথমেই ইংরেজরা ভারতীয়দের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাহাদূর শাহের পরিবারের সদস্যদের শিরচ্ছেদ করে রূপোর বাক্স ভর্তি করে তাকেই উপহার দিয়েছিল। পরে তাকে রেঙ্গুনে দেশান্তরিত করা হয়। চরম দরিদ্রতার সাথে তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এরকম চরম অবস্থার মধ্যে থেকেও তিনি লিখেছিলেন বেশ কিছু বিখ্যাত উর্দু কবিতা।

ঔপনিবেশিক ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্বে এনে পাশ্চাত্যের বেনিয়া দেশগুলো মুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষা ও দক্ষতাকে লুণ্ঠন করে নিয়েছিল। উপনিবেশীয় শাসকরা প্রথমে মুসলিমদের সমস্ত রকম বুদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়। উদাহরণ হিসাবে ডাচদের আচরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে এরা ইন্দোনেশিয়ায় সমস্ত মাদ্রাসা, কলেজ, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছিল। অপরদিকে ডাচরা নিজেদের জন্য যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছিল সেখানে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দীক্ষার কোন প্রবেশ অধিকার দেওয়া হয়নি। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে তারা কোন রকমে দেশীয় ছাত্রদের

প্রাইমারি শিক্ষার অধিকার দিলেও মাধ্যমিক শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। পরে যত ইসলামী চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র ছিল তা ধংস করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একজন ফ্রেঞ্চ ডাক্তার তিউনিশিয়ার মুসলিম ডাক্তারের কাছে গবেষণার অনুমতি পায়। ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম গবেষকদের আবিস্কৃত ওষুধ পত্রকে দ্বিতীয় শ্রেনির বলে লেবেল আঁটলেন, এবং নির্মমভাবে মুসলিম চিকিৎসা গবেষণাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। এমন কি মুসলিম দুনিয়াগুলোতেও এই গবেষণা লব্ধ ঔষুধগুলো কদর পেল না।

ঔপনিবেশিকতাবাদের উৎপাদন

ঔপনিবেশিক শক্তিধরেরা বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলি থেকে সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। আর এর জন্য তারা এমন সব কৌশল রচনা করেছিল যারফলে উপনিবেশ গুলি থেকে কাঁচামাল নিজেদের দেশে চলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য কাপড় কারখানা। কিন্তু এসব কারখানার জন্য কাঁচামাল অকালেই বন্ধ হয়ে যায়। আর এর পরিণতিতে ভারতের শিল্প বিপ্লবের স্বপ্নও মার খায়।

ইউরোপীয়রা তাদের শাসন কাজের জন্য ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে কিছু দেশীয় বাবু শ্রেনির ব্যক্তিদের তৈরি করেন, যারা জন্মগত ভাবে স্বদেশী হলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল চাটুকার শ্রেণির আর এই প্রচেষ্টা অল্প দিনের মধ্যে সর্বত্র কার্যকরী হয়েছিল যখন ম্যাকলে ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে Minutes of Indian Education লিখলেন,

> "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in opinion, in morals, and in intellect."

'বর্তমানে আমরা আমাদের সবচেয়ে বেশী চেষ্টা চালাব একটি বিশেষ

শ্রেণি তৈরি করার জন্য যারা আমাদের মধ্যে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের আমরা শোসন করি তাদের মধ্যে একটা মাধ্যমের কাজ করবে। আর এই শ্রেণিটি হবে রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, নীতিতে এবং বুদ্ধিমত্তায় হবে ইংরেজ'

ম্যাকলের এই গুরুত্বপূর্ণ চালাকির কথাটা সারা পৃথিবীতে তাদের শাসিত ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে সমভাবেই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ম্যাকলের এই কথাকে বিশ্লেষণ করে জিয়াউদ্দিন সরদার লিখেছেন,

> "The British East India company and the Dutch East Indies Company were free market ventures in the Muslim world. They were given concessions by various muslim rulers to trade freely. But their trade included conquests and annexations.
>
> Muslim societies became an experimental ground where all sorts of ideas of brave new modernists missionaries with civilizing zeal, believers in science, progress and White Man's burden', tested out new, utopian and innovative educational, social and cultural policies on Muslim societies.
>
> Colonialism dismantled Muslim civilization brick by brick. It occupied not only the bodies but also the 'minds' of Muslims. It equated anything that could remotely be described as Islamic with inferiority and low moral worth. It altered the cultural priorities of Muslim societies. It drained the Muslim countries of every source of wealth. And it reduced the Muslim people to abject poverty.
>
> The Western attempts to solve the 'Problem' of Islam have produced a catalogue of crimes and injustices against institutionalization of Islam and Muslims as the 'Demonised Other' in European thoght

and history."

(Ziauddin Sardar, *Introducing Islam, 2009,*
Mational Book Netwark, Icon books ltd, London)

"ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিম বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যে সুবিধাবাদী ছিল। বিভিন্ন মুসলিম দেশ গুলোতে তারা ব্যবসা চালাত অনেক রকম ছাড় পেয়ে। কিন্তু তাদের এই ব্যবসার বিস্তার দিন দিন করে জয় ও অধিকার আদায়ের সুযোগ করেনিয়েছিল। এইভাবে মুসলিম দেশগুলি ধীরে ধীরে কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্রেস্থল হয়ে গিয়েছিল এই সব ঔপনিবশিক শাসকদের দ্বারা। তারা তাদের রুচি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, ধর্মীয় চিন্তা, তাদের শিক্ষা – সবকিছু সুবিধামত মুসলিম দেশগুলির উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে চলল।

এইভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ধীরে ধীরে মুসলিম সভ্যতার এক একটি ইট খসিয়ে দিল সময়ের সাথে। এটা মুসলিম বিশ্বের দেহে শুধু প্রভাব ফেললনা বরং মন মানসিকতায়ও প্রভাব ফেলল দারুনভাবে। ইসলামী আচার-আচরণে, নৈতিকতাকে মূল্যহীন ও ছোট করে দেখার প্রবনতা বাড়ল ধীরে ধীরে আর এতে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করল মুসলমানেরা। ঔপনিবেশিক শাসকদের চালাকির প্রভাবে বদলে গেল মুসলমানদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য। আর এর ফলে মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত সম্পদ চলে যেতে থাকল ঐ সকল শাসক দেশগুলোতে। ফল ফলল বিষময়, মুসলিম দেশগুলো নিস্ব থেকে নিস্ব হয়ে পড়ল একেবারে। তাই দরিদ্রতা তাদের ঘিরে ধরল সবকিছুতে।

পশ্চিমিরা ইসলামের এই তথাকথিত সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের অজস্র দোষ ত্রুটির তালিকা পেশ করেছে যা এখানে আলোচ্য-বিষয় নয়। আর তাদের এই বর্ণনায় ইউরোপীয়দের ইতিহাসও মন মগজে মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামকে দানবিক রূপ দিয়েছে।

আধুনিক ঘৃণার রূপ

সময় গড়িয়ে চললেও পশ্চিমিরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল তা মুছে যায়নি বরং তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে আজকের আধুনিক বিশ্বের মানুষের কাছে। পূর্বের ছড়ানো ঘৃণা বিদ্বেষ আজ কেবল মাত্র রূপ পরিবর্তন করেছে। যে কোন প্রকারে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আজও পশ্চিমা দেশগুলো মুসলিম ও প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর লাঠি ঘুরিয়ে চলেছে। এই তো কিছু দিন আগে পাশ্চাত্যের শাসকেরা তাদের লাঠি ঘোরাল আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর। দুটো দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালেন সেই সঙ্গে তাদের উন্নতির সমস্ত পরিকাঠামো বিধ্বস্থ হয় পশ্চিমিদের অমানবিক আচরণে। তাদের এই ব্যবহার ইসলামের উপর চাপানো বদনামকে একটু হালকা করেছে। কিন্তু এতে কিছু নূতন মুসলিম জেনারেশান যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে মাত্র। এটা না ইসলামের জন্য ভালো হয়েছে না ভালো হয়েছে বিশ্বের জন্য। কেননা হিংসা দিয়ে কখনো গোড়ামীকে দূর করা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর হিমায়িত পাশ্চত্য অহংকার তার ক্রেতা খুঁজে চলেছে ভারতবর্ষ, মায়ানমার ও অন্যান্য দেশগুলোতে। মধ্যযুগে মুসলিমরা যখন শাসন করত তখন পাশ্চত্য এগুলিতে থাবা বসাতে পারেনি। ইসলাম পাশ্চত্যের উপর কোন সময় আক্রামনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ইসলাম কেবলমাত্র খৃস্টবাদের ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছে তাই এটা আমাদের জানা দরকার যে শান্তি ও পুনর্মিলন কেবল পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়েই সম্ভব। পূর্বের আত্মগরিমা কখনও শান্তি ফেরাতে পারেনা।

শরীরকে মুক্ত কর
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ থেকে

মার্কান্ড কাটজু – *

ভারতবাসীকে অবশ্যই একটা কাজ করতে হবে তা হল ধর্মীয় বিদ্বেষকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে হৃদয় থেকে। বর্তমানে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে পারস্পরিক ঘৃণা ছড়াতে দেখা যায়। এটা এখন ভাইরাসের মত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের আগে আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে এ রোগ ছিলনা। তখন মুসলিমরা যেমন হিন্দু উৎসবে তাদের বাড়িতে যেতেন তেমনি হিন্দু ভায়েরাও মুসলমানদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করত বিবাহ শাদি, ইদ ও মহররমের মত নানা অনুষ্ঠানে। সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে মিলন ঘটত ভাই বোনের মত। কিন্তু এটা ভাবা যায় না কেমন করে ১৫০ বছর পরে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা না হলেও ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি হল, আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে। ভাবতে অবাক লাগে, একজন মুসলিম হিন্দু বাড়িতে ভাড়া পায় না। যখন এই ভারত ভূমির কোনও স্থানে কোন বোম্ব বাস্ট হয় তখন কয়েক ডজন নির্দোষ মুসলিমই ধরা পড়ে যদিও নেপথ্যে থাকে অন্যদের হাত। আসল দোষীদের ধরতে পুলিশি অবহেলা সহজেই চোখে পড়ে। কিছু দিন পরে কোর্টের রায়ে এ মুসলিমরা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইতি মধ্যেই বেশ কয়েক বছর জেলাবন্দী জীবন

---

* লেখক সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি এবং প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি।

কাটাতে হয় এই নিরীহ মুসলমানদের। এর ফল বড় খারাপ হয়েছে ভারতে, মুসলমানেরা বড় একাকীত্ব অনুভব করছে রাষ্ট্রের এই আচরণে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা আরোও খারাপ। তারা একাধারে রাস্ট্রীয় সন্ত্রাস উগ্রবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত।

বিভাজন রেখা

১৮৫৭ সাল থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রথম দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক বিভাজন। এর আগে সাম্প্রদায়িক কোন সমস্যাই ছিল না। যার ফলে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাও কোথাও সংঘটিত হয় নি। সত্যি বলতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য ছিলনা। যে পার্থক্য ছিল তা একই পিতার পুত্র কন্যাদের মত। তখন হিন্দু মুসলমান শান্তির সাথে বাস করত। একে অপরের বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত কোন রকম দ্বিধা না করে।

এটা নিসন্দেহ যে মুসলিমরা যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন তখন তারা বেশ কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিল, কিন্তু তারা আমাদের ভারতেরই শাসক হয়েছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। ঐ সকল শাসকদের এতে অনেক স্বার্থ ছিল। যেহেতু যে জনগোষ্ঠীকে তারা শাসন করত তার বেশীর ভাগ ছিল হিন্দু সম্পদায়ের। তারা এটা বুঝেছিল যদি হিন্দু মন্দির গুলো ধংস করে দেওয়া হয় তা হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে। এটা কখনই তাদের কাম্য ছিলনা। তাই ভারতবর্ষের মুঘল, অযোধ্যার নওয়াব, মুর্শিদাবাদ অথবা আরকট, টিপু সুলতান অথবা হায়দ্রাবাদের নিযাম– কোন শাসনেই সম্প্রীতি ভাঙ্গা হয়নি। বরং নানান উপায়ে তা গড়ে তোলা হয়েছে।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন সর্বত্র ছাড়িয়ে পড়েছিল তখন হিন্দু মুসলিম সবাই এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এই বিদ্রোহে ভাঁটা পড়লে ইংরেজরা যে কৌশল নিয়েছিল তা হল বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা। তৎকালীন ইংরেজ প্রতিনীধি স্যার চার্লস উড ইংলণ্ডের ভাইসরয় লর্ড এলিনকে লিখেছিলেন,

> "We have maintained our power in India by playing off one community against the other and we must continue to do so. Do all you can, therefore, to prevent all having a common feeling."

"আমরা ভারতবর্ষে আমাদের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করছি এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের পেছনে লাগিয়ে। আমরা অবশ্য এ নীতি চালিয়েই যাব। আপনি স্বাভাবিক অনুভূতি চেপে দেওয়ার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেবেন"।

ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে ভিসকাউন্ট ক্রস গভর্নর জেনারেল ডাফরিনকে লিখেছিলেন,

> "This division of religious feeling is greatly to our advantage and I look forward for some good as a result of your Committee of Inquiry on Indian Education and on teaching material."

"এই ধর্মীয় বিভাজনের অনুভূতি আমাদের জন্য বড় ধরণের সুবিধা। আমি সামনের কিছু সুবিধাও লক্ষ্য করছি তা হল আপনার কমিটি ভরতীয় শিক্ষা এবং শিক্ষা দানের মালমশলার উপর তদারকি চালাচ্ছে।"

জর্জ হ্যামিলটন গভর্নর জেনারেল কার্জনকে লিখেছিলেন,

> "I think the real danger to our rule in India.... is the gradual adoption and extension of Western ideas... and if we could break educated Indians into two sections [Hindus and Muslims]... we should, by such a division, strengthen our position against the subtle and continuous attack which the spread of education must made upon our system of government. We should so plan education textbooks that the differ-

ences between the two communities are further enhanced."

"আমি ভাবছি আমাদের ভারত শাসনে আসল সমস্যা হল পাশ্চত্য শিক্ষা ও ধারণা ধীরে ধীরে এখানে প্রসার লাভ করছে। আর যদি আমরা ভারতীয় শিক্ষিত লোকদের হিন্দু ও মুসলিম দুটো ভাগে ভাগ করে দিতে পারি আর সেটাই আমাদের করা উচিৎ– তাহলে প্রতিনিয়ত শিক্ষার উপর আকস্মিক আক্রমণ গুলো আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাই আমাদের উচিৎ এমন এক পরিকল্পনা করতে হবে যাতে করে দুটো সম্প্রদায়ের বিভাজনের জন্য পাঠ্যপুস্তকগুলো ভিন্ন প্রকৃতির হয়।"

এইভাবে ১৮৫৭ সালের পরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ আনার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে নূতন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল আর এ কাজ সাধন করতে নানান উপায়কে কাজে লাগান হয়েছিল সুকৌশলে। এ হীন কাজ সমাধা করার জন্য ইংরেজ কালেক্টরেরা হিন্দু পন্ডিতদের ঘুস দিতে লাগলেন মুসলিমদের বিরুদ্ধে কথা বলতে অপরপক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলবীদেরও ঘুস দিলেন হিন্দুদের গালাগালি দেওয়ার জন্য।

সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতে ইতিহাস বিকৃত

সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টি করার জন্য ইংরেজরা যে বড় কাজটি করেছিল তা হল ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। আগেই বলা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম আগমন কারীরা কিছু মন্দির ধংস করেছিলেন। কিন্তু তাদের উত্তর সূরীরা মন্দির ভাঙ্গা নয় বরং মন্দির গড়ার কাজে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন, তারা মন্দির নির্মানের জন্য অনেক সময় বহু অর্থ মঞ্জুর করেছেন। রামলীলা স্থাপন করেছেন সেই সঙ্গে হোলির মত নানা হিন্দু উৎসবের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছেন। ইতিহাসগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম শাসকদের আক্রমণ দেখান হয়ে থাকলেও তাদের উত্তরসূরীদের সম্প্রীতির কথা আলোচনা করা হয়নি কোন সময়ে। যেমন আকবর ছিলেন বাবরেরই উত্তরসূরী। মন্দির ধংস করাতো দূরের কথা তিনি হিন্দু মন্দিরগুলোর জন্য অনেক দান মঞ্জুর করেছিলেন। আমাদের

শিশুদের কেবল এই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যে গজনীর মাহমুদ সোমনাথের মন্দির ধংস করেছিলেন। কিন্তু এ শিক্ষা দেওয়া হয়নি যে মুঘল সম্রাটরা হিন্দু মন্দিরের উন্নতির জন্য সব সময় অর্থ মঞ্জুর করতেন এবং নানা ধরণের হিন্দু উৎসবের বিকাশ সাধন করেছিলেন। B.N. Pande-এর লেখা History in the service of Imperialism গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতায় অবাধ সুড়সুড়ি

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো প্রায় সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বাধানো হত। যেমন হিন্দুরা মুসলিমদের আজানের সময় ঢাকঢোল পিটিয়ে এক রকম গোণ্ডগোলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। আবার কোথাও কোন মুসলিম হিন্দুদের মূর্ত্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে দিত। ফলে একটা অশান্তির পরিবেশ আপনা হতে সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু মজার ব্যাপার ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে এধরণের কোন অপ্রীতিকর ঘটণা হিন্দু মুসলিম কারোর মধ্যে দেখা যায়নি।

সাম্প্রদায়িকতার এ বিষ ইংরেজরাই আমাদের ভারতবাসীর মনে ঢেলেছিল। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এমনকি তা চলেছিল ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়া পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত আমাদের অনেক আচরণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্তরায়। আমরা এমন অনেক কাজ করে থাকি যাতে পরস্পরের ধর্মে আঘাত লাগে।

যখনই কোন বোম্ব ব্লাস্ট হয় তখনই নিউজ চ্যানেলগুলো খবর সরবরাহ করে যে SMS কিংবা E-mail মারফত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, জয়সি মুহাম্মদ, বা হরকত-উল-জিহাদ আল ইসলামিয়ার মত কোন সংগঠন -এর দায় স্বীকার করেছে। কিন্তু এ ধরণের SMS কিংবা E-mail তো যে কোন ব্যক্তি পাঠাতে পারে। তদন্তের আগে সমস্ত দেশবাসীর কাছে একটা ভুল সংবাদ পৌঁছায় যে মুসলমানেরা এ ধরণের জঙ্গি কাজের জন্য দায়ী। কিন্তু এটাতো ভাবা দরকার যে ৯৯% মানুষ তো শান্তিকামী, বাবরী মসজিদ ধংসের সময় বিশেষ করে হিন্দি মিডিয়া কর সেবকই বনে গিয়েছিল।

এই সময়ই ভারত দেখল যে এর পেছনে রয়েছে বেশ কিছু দুষ্ট

চক্রের হাত। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। বৈচিত্র এর প্রধান বৈশিষ্ট। তাই এর উন্নতি ও ঐক্যের জন্য দরকার সবাইকে সমান ভাবা এবং সবাইকে সম্মান জানান। এতে যোগ দেওয়া দরকার সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে। তা হলে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধির ভারতকে দেখতে পাব অল্প সময়ের মধ্যে।

জিহাদ

জিহাদ শব্দটির অর্থ সব সময় ভুল করা হয়ে থাকে। জিহাদের অর্থ করা হয় 'ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ' – যেখানে গন্ধ থাকে অত্যাচার ও অরাজকতার। সম্ভবত অন্যান্য কোন ভাষা এমনকি আরবিতেও এরকম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শব্দ আর খুজে পাওয়া যায় না। ইসলাম ও পাশ্চত্যের মধ্যে জিহাদ শব্দটাকে নিয়ে বিতর্ক বেশ বড় ধরণের। এমন কি একটাও দিন বাদ যায়না যেদিন কোনও না কোন মিডিয়া জিহাদ নিয়ে অপ প্রচার করেনি। আর এই জিহাদকে নিয়ে কত না অপবাদ।

কিন্তু বুদ্ধিজীবিদের কাছে আমার অনুরোধ জিহাদের ব্যাখা প্রথমে কুরআন থেকে নেওয়াই উচিৎ। তারপর এর বিচার হাদীসের আলোকে করতে হবে। আরবি জিহাদ শব্দটির মানে হল 'সংগ্রাম করা'। অথবা আমি চেষ্টা করব আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে' এই সংগ্রাম যেমন বুদ্ধিগত হতে পারে তেমনি হতে পারে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকি শারীরিক ক্ষেত্রেও। এর পরিধি বড়ই ব্যাপক। সময়, স্থান, পরিস্থিতি ভেদে এর রূপ পরিবর্তিত হয়।

বৃহত্তর জিহাদ

নবী (সাঃ) এর একটা হাদীস থেকে জানা যায় নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ, আর তা হল নিজের লোভ, অহংকার, খারাপ আকাঙ্খা এবং খারাপ কাজের বিরুদ্ধে, আর তা কেবল নিজের থেকে নয় বরং তা সমাজের পক্ষ থেকেও।

জিহাদের চরম লক্ষ হল সমষ্টিগত জীবনে শান্তির জন্য সংগ্রাম করা

যার দ্বারা আগ্রাসন, অপচয়, অনৈতিকতা বিদায় নেয়। আর এর পরিবর্তে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ইসলামের অর্থ যদি শান্তি হয়ে থাকে তাহলে জিহাদ হল এটি অর্জন করার পদ্ধতি।

আধুনিক দৃষ্টিতে জিহাদ সমাজে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। কিন্তু এখন এটি দুটো দিকে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত বিনম্রতার জন্য এটি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও, বৃহত্তর দৃষ্টিতে জিহাদের অর্থ ব্যাপক। বেইরুটের একজন মুসলিম পন্ডিত লিখেছেন "বড় জিহাদ হল কোন ব্যক্তির নিজের পাশবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই প্রবনতা বাইরের চেয়ে ভিতরে বেশী হওয়া দরকার। আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে নিজের পাশবিকতাকে জয় করতে হবে। যদি নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে না আনা যায় তাহলে নিজেকে ভয়ঙ্কর পশুতে পরিণত করা হবে। নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারাটাই জিহাদ। মানুষ নিজেকে বড় মনে করে আর আধ্যাত্মিক শক্তিকে নীচু করে দেখে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল প্রকৃতি ও অন্যকে শোষণ করা। জিহাদ হল এই প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা।"

নবী (সাঃ) যখন হুনায়িনের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিলেন তখন বলেছিলেন, "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম," এটা শুনে একজন সাহাবী বললেন "হে আল্লাহর রসূল! বড় জিহাদটা কি? নবী (সাঃ) উত্তর দিলেন "এটা হল খারাপ প্রবণতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা"। এইভাবে নবী (সাঃ) বড় জিহাদের ধারণা আমাদের সমনে পরিস্কার করেছেন। মুসলিম অথবা অমুসলিম সবাইয়ের মধ্যে ভালমন্দের এই জিহাদ চলতেই থাকে। সকলের পক্ষে ভাল মন্দের অন্তর্দন্দে মন্দকে পরাভুত করে ভালোর জয় সাধন করা খুব কষ্টকর কাজ।

জিহাদের চরম পর্যায়

জিহাদের চরম রূপগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল অত্যাচার এবং অত্যাচারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।কুরআনের শিক্ষায় আমরা এটাই বুঝতে পারি যে প্রতিটি মুসলমানের উচিত অত্যাচারির বিরূদ্ধে কথা বলা এবং

অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানো। কুরআনের ঘোষণা,

> "কি কারণ থাকতে পারে যে তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবেনা যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদের এই জনপদ হতে বের করে নাও। যার অধিবাসী অত্যাচারী এবং তোমার নিজের কাছ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (আল কুরআন– ৪:৭৫)

অপেক্ষাকৃত ছোটজিহাদ

ছোট জিহাদ সমন্ধে নবী (সাঃ) এর প্রকৃত সংগা হল 'মিলিটারি শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিটারি শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা, যাতে করে ইসলাম ও ন্যায় বিচারের সংরক্ষন হয়।'

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এ নীতিমালা গ্রহণ স্বীকৃত। প্রতিটি রাষ্ট্রের এ অধিকার রয়েছে যে সে নিজেকে রক্ষা করবে। কোন রাষ্ট্র নিজেকে রক্ষার জন্য, লেখা, মিডিয়া, ডায়ালগ, কূটনীতি, চুক্তি, শান্তি প্রকৃয়া প্রভৃতি গ্রহণ করতে পারে।

একেবারে শেষ পর্যায়ে যখন শান্তি অর্জনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তবুও শত্রু পক্ষের হুমকি অব্যাহত থাকে, তখন রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ দেশকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র সগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে। এটি যে কোন দেশের বৈধ অধিকার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আন্তর্জাতিক আইনই বিচার করে, কোন দেশ অন্যের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কতটা অস্ত্র রাখতে পারবে।

ইসলাম কোন সময় আগ্রাসন বা সাম্রাজ্য অজর্নের জন্য যুদ্ধ চায়না। এটা হল প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধ যাতে করে ইসলামে বিশ্বাসী সকল মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে। অতি কঠোর নিয়ম মেনেই দায়িত্বশীলতার সাথে জিহাদ গ্রহণ করার অনুমোদন দেওয়া হয়। যার ফলে নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গ,

নারী, শিশু, সাধারণ নাগরিক কেউই ক্ষতি গ্রস্থ হয় না। অথবা কোন সময় পরিবেশ ও ধর্মীয় স্থান ধংস হয়না জিহাদের দ্বারা। আর সেজন্য, পণবন্দী, যত্রতত্র বোমা বিষ্ফোরণ, এলোপাথাড়ি গোলাগুলি বর্ষণ প্রভৃতি ন্যাক্কার জনক কাজকে ইসলাম ঘৃণাই করে। এটা কোন জিহাদই নয়। এগুলো মূলত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম যা কিনা অবিবেচক হত্যাকান্ড ছাড়া কিছু নয়।

আবার হঠাৎ যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা তথাকথিত ইসলামী জিহাদ গোষ্ঠীর কোন অধিকারও ইসলাম দেয়না সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করার জন্য। তাছাড়া এদের এ ধরণের কাজকে ইসলামী জিহাদ বলা মোটেই সঙ্গত হবেনা। এই ধরণের নির্বোধ কাজ যারা ঘটাচ্ছেন তাদের দিয়ে ইসলামী জিহাদ ব্যবস্থাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশই নেই। মুসলিমদের হট্টগোল পাকানোর কোন অধিকারই ইসলাম প্রদান করে না।

প্রাক্তন পপ গায়ক ক্যাট স্টিভেন বর্তমানে নব মুসলিম। যিনি ইউসুফ ইসলাম নাম নিয়েছেন, তার মতে,

> "It is wrong to judge Islam in the light of the behaviour of some deviant Muslims who are always shown in the media. It is like judging a car to be bad if the driver is drunk and he crashes it into a wall'.

"মিডিয়ায় দেখানো বেশ কিছু বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের চরিত্র দেখে ইসলামকে বিচার করা যায় না। এ ধরণের ধারণা ঠিক যেন একজনের ভাল গাড়িকে দোষ দেওয়া যার মদখোর ড্রাইভার কোন দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে দুর্ঘটণা ঘটায়।"

সামাজিক জিহাদ

সামাজিক সংগ্রামও এক ধরণের জিহাদ, যেটা আধুনিকতার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। যদি সমাজে কোন পরিবর্তন আনতে হয় তবে সেখানেও কিছু সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। আর এটা করতে গেলে কোন ব্যক্তি বা

ব্যক্তি সমষ্টিকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এটা নীরব কিন্তু এক লাগাতার প্রচেষ্টা যা কিনা মানুষের আচরণে পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। আর এই জিহাদ বা সংগ্রাম ঘটানোর জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষা, সচেতনতা, নৈতিকতা এবং স্থির লক্ষের। সামাজিক জিহাদ করার জন্য নানা রকম অভিযানে লিপ্ত হতে হয়। শিশু মৃত্যুর হার কমানোর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাও সামাজিক জিহাদের প্রসারিত রূপ। এছাড়াও রয়েছে পরিবেশ, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, স্কুলছুট প্রবণতা কমানো, মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমকে আধুনিকিকরণ, শ্রমিকদের অধিকার প্রদান, শৌচাগারের প্রসার, পানীয় জলের যথাযথ সরবরাহ, প্রতিবন্ধীদের বাঁচার ব্যবস্থা, নারী ও শিশুর স্বাস্থ পরিচর্যা, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প প্রভৃতি হল সামাজিক জিহাদের অংশ। কুরআনের শিক্ষা – মানুষের প্রতি সহানুভুতি দেখাও যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহানুভুতি দেখান। এখন মুসলমানদের ভাবার সময় এসেছে সামাজিক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য, যাতে করে সমাজ থেকে দূরীভূত হয়ে যায় নিরক্ষরতা, মাদক দ্রব্য গ্রহণের অভিশাপ। দরিদ্রতা, স্বাস্থহীনতা বেকারত্ব প্রভৃতি অকল্যাণকর জিনিসগুলি।

এই আলোচনা থেকে যে মূল সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে তাহল ইসলাম আমাদের অনুমতি প্রদান করে যাতে করে সামাজিক দায়দায়িত্বকে আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি। সমস্ত মুসলিম জানে যে ইসলামের মৌলিক অভ্যাস নামায, রোজা, হজ, যাকাত সবাইকে পালন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ করাবার যা আল্লাহকে স্মরণ রেখে করা হয় তা সবকিছুই ইবাদত ও শোকর। আমরা কুরআন থেকে জেনেছি যে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাজ ইমানের সাথে সম্পৃক্ত। এই ভাবে বিশ্বাস এবং মানুষের কাজকারবার পরস্পরের সহায়ক। আর মানুষের কাজ কারবার নানা ধরণের হতে পারে। সমাজে অন্যায় প্রতিরোধ করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান হয়েছে কুরআনে,

> "তোমরা ইমান আন আল্লাহ ও রসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন ও ধন সম্পদ নিয়ে। এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম। যদি তোমরা জানতে" (আল কুরআন- ৬১:১১)

জীবনের এ ধরণের সংগ্রামের জন্য এখানে মুসলিমকে অবশ্যই নিজের জান মাল নিয়ে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিস্তৃত অর্থে আল্লাহর পথে একজন মানুষের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা যা সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন ধারায় –যেমন শিক্ষা বিস্তারে, দরিদ্রতা মোচনে, ব্যধি নির্মূলীকরণে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায়, মানুষের জীবনে অধিকার প্রদানে কাজ করে তা সব কিছুই জিহাদের পর্যায় পড়ে। আর এই প্রচেষ্টা একেবারে একটানা চলা দরকার জীবনের জন্ম প্রান্ত থেকে মৃত্যু পান্ত পর্যন্ত। সমাজে প্রতিটি মুসলিম এ প্রচেষ্টার অংশীদার হবে এটা ইসলামের দাবি।

কজন মুসলিম ব্যক্তিই বা ঘরের দোরগোড়ায় যে সকল প্রচেষ্টা চালান সম্ভব হত তা আল্লাহর জন্য করে থাকে? বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও না কোন গুপ্ত অভিপ্রায় তার মধ্যে কাজ করে থাকে। প্রতিটি দেশের সংগ্রাম সাধারণত নিজ এলাকা, নগর ও শহর প্রভৃতির জন্য হয়ে থাকে। তাই মিশরের সংগ্রামি নেতা হাসানুল বান্না বলেছিলেন, আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করা কঠিন কাজ কিন্তু আল্লাহর পথে বেঁচে থাকা আরোও বড় কঠিন কাজ।" এই সংগ্রাম জীবনের জন্য সংগ্রাম যাতে করে প্রতিটি মানুষ তার অধিকার পেতে পারে। ইসলামের সমগ্র বার্তা হল প্রয়োজনীয় সাফল্যের জন্য জিহাদ অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

যুদ্ধ সম্বন্ধে নবী (সাঃ) যা বলেছিলেন

একেবারে চরম বাস্তবতা স্বীকার করে ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদন দেয়। অবশ্য যুদ্ধের অনুমতি তখনই পাওয়া যাবে যখন তা অন্যায়কে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে হবে। বৈধ, ব্যক্তি-নিরাপত্তা ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করা যেতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা,

> "তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর। যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করো না। কেন না আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"
> (আল কুরআন–২:১৯০)

ব্যক্তি নিরাপত্তার জন্য যেমন যুদ্ধ করার অনুমতি আছে তেমনি নিজ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্যও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা,

> "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা নির্যাতিত, আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম, এরা সেই সব লোক যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কৃত হয়েছে, অপরাধ ছিল শুধু এই টুকু যে তারা বলত, আমাদের রব তো আল্লাহ! আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ করতে না থাকতেন তা হলে খানকা সমূহ, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহর যিকর বেশী করে করা হয় তা চুরমার করে দেওয়া হত। আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল।"
> (আল কুরআন - ২২:৩৯-৪০)

স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে একটা প্রবণতা কাজ করে যে সে প্রভুত্ব বিস্তারে আগ্রহী হয়। পরের ধন সম্পদ কেড়ে নেওয়ার মানসিকতাও তার প্রবলভাবে থাকে। প্রতিশোধ স্পৃহা গ্রহণ মানুষের আদিম নেশা বলা যেতে পারে। তাই ইসলাম এ সকল বিষয়ে মানুষ যাতে ভুল পদক্ষেপ না নিয়ে ফেলে তা খেয়াল রাখতে নির্দেশ দেয়। এক কথায় কোন রকম আগ্রাসন ইসলাম সমর্থন করেনা তা ব্যক্তির প্রবৃত্তিকে যতই তাড়না দিকনা কেন।

যুদ্ধনীতি

যুদ্ধনীতিতে একেবারে নূতন শব্দ "জিহাদ ফি-সাবি-লিল্লাহ"– শব্দটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধনীতিকে 'ফি-সাবি-লিল্লাহ'-র পথে পরিচালিত করার ফলে যুদ্ধ কোন ধংস, অহংকার, প্রেস্টিজ

বাঁচানো, কিংবা অপরকে দাস বানানোর প্রকৃয়া হয়নি। এই বিশ্বাস তাই যুদ্ধকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলেছে। যুদ্ধের এই নূতন ধারণা থেকে নবী (সাঃ) যুদ্ধনীতিতে একটি সামঞ্জস্যশীল নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন, যা যুদ্ধের আচরণ বিধির উপর নানান বিষয়ে নিয়ন্ত্রন রাখে। তাই আক্রমণের ধারা, সন্ধী চুক্তি, বন্দীদের সাথে ব্যবহার, আহতদের প্রতি করণীয়– সব বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের প্রদান করেছেন।

যুদ্ধনীতিতে দশটি আদেশ

একেবারে শুরু থেকে আরব মুসলিম যোদ্ধারা, যারা ছিলেন ইসলামের যথাযথ অনুসারী, অবিশ্বাসী ও পরাজিত ব্যক্তিত্বের সাথে অত্যন্ত সুব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু এ সময় মানুষ কোন রকম অরাজকতার কুফল সম্বন্ধে কল্পনাও করত না। হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রথম উত্তরসূরী আবু বকর (রাঃ) নিজেই মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুদ্ধ আইনগুলো যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করেছিলেন। পূর্ব আরব লিভেন্টে সৈন্য প্রেরণের সময় খুব কড়াকড়ি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

> "শিশু, নারী ও দুর্বল বয়স্কদের হত্যা কর না। ফলবান গাছ কেটে ফেল না। মানুষের বসতবাড়ি ধংস কর না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গবাদি পশু হত্যা কর না। মৌমাছিদের বাসায় আগুন লাগাবে না। অথবা তাদের তাড়িয়ে দেবে না। যুদ্ধকে খারাপ পথে পরিচালিত করবে না।"

উপরের এই বর্ণনা থেকে এটা পরিস্কার যে এখানে যুদ্ধ সম্বন্ধে দশটি আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র অযথা প্রাণহানি রোধ করা নয় বরং প্রাকৃতিক সম্পদও কোন যুদ্ধে যাতে না নষ্ট হয় তার জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই আদেশ মালায়। জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ সব কিছুর দিকে লক্ষ রাখতে হবে যুদ্ধের সময়। আমাদের একথাটা মনে রাখা দরকার যে এটি বলা হয়েছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছরেরও

আগে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগেও যদি প্রতিটি সৈন্য যুদ্ধের এই নীতিমালা মেনে নিতেন তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তির আবহাওয়া বইতো বৈকি? বর্তমানে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপতো আমরা নিজেরা নিজেদের চোখে দেখছি। আজকের যুদ্ধ মানেইতো ধ্বংসলীলা ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের জৈব একাত্মতা হল একটা বিষয়, এ ব্যাপারে নবী (সাঃ) বলেন,

> "ওগো আল্লাহ আমি এই সাক্ষীই প্রদান করছি যে সমস্ত মানবজাতিই পরস্পরের ভাই বোন।"

"আমরা এই ঐক্যের জাজ্বল্য প্রমান দেখেছি মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনে। এক সময় নবী (সাঃ) তার কিছু সঙ্গী সাথীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় একটি জানাজার মিছিল সেই স্থান থেকে অতিক্রম করছিল। নবী (সাঃ) তা দেখে মৃত ব্যক্তিটার সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সাথী মুসলমানেরা এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তারা তৎক্ষনাৎ নবী (সাঃ) কে জ্ঞাত করালেন যে এটি এক ইহুদির জানাজা। নবী (সাঃ) তাদের বললেন "মর্যাদার দিক থেকে সে কি এক মানব সত্ত্বা ছিলনা?"

কুরআন থেকে জানা যায় যে ইসলাম সমগ্র মানুষের জন্য কি মর্যাদাই না দান করেছে। কুরআনের ঘোষণা,

> "---যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল, আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল....." (আল কুরআন– ৫:২৭-৩২)

কুরআনের এই মহান আদেশনামা থেকে নবী (সাঃ) সমস্ত মানব জীবনের যথার্থ মর্যাদা ও মূল্য প্রদান করেছিলেন। তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত মানুষের– তা মুসলিম ও অমুসলিম যাই হোক না কেন– সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

এক যুদ্ধে দুর্ঘটনা বশতঃ শত্রুপক্ষের কিছু শিশু যুদ্ধের ময়দানে ঢুকে

পড়ে এবং তাদের হত্যা করা হয়। নবী (সাঃ) যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তিনি অত্যাধিক মর্মাহত হলেন। তখন একজন বলে ফেললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ওরাতো অমুসলিম শিশু ছিল।" এ কথা শুনে নবী (সাঃ) লোকটিকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, "ওরা অমুসলিম হয়েও তোমার চেয়ে ভাল ছিল, শিশুদের হত্যা করবে না। সাবধান! কখনই শিশুদের হত্যা কর না। প্রতি আত্মাই আল্লাহর প্রকৃতির উপর জন্মায়।"

অপর পক্ষে আমেরিকার ঔদ্ধত্য লক্ষ করুন যা সে ইরাকের উপর দেখিয়েছে। ইরাকের অর্ধ-মিলিয়ন শিশুকে মারা হয়েছে। ইউ.এস.এ. স্টেট সেক্রেটারি মেডেলিনকে এ ব্যাপারে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন এতে লাভ কি হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেন আমরা মনে করি অনেক লাভ হয়েছে।

জিহাদ প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

'জিহাদ' আরবী এমন এক মূল শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ সংগ্রাম বা সংগ্রাম করা, জিহাদের সংগা হল কোন কিছু পেতে চরমতম প্রচেষ্টা চালান। সময় ও স্থানের পরিপেক্ষিতে এর প্রয়োগ কৌশল নানা রকম হতে পারে। সাধারণভাবে উর্দুতে জাদ-ও-জিহাদ অর্থ সংগ্রাম করা। আরবিতে প্রবাদ বাক্য রয়েছে 'ইয়ামিল বি জাকা, অলা ইয়ামিল বি জাহাদা কাসিবা'– দক্ষতার সাথে কাজ কর অপ্রয়োজনীয় কঠোর পরিশ্রম কর না"।

বর্তমান আধুনিক আন্দোলনেও 'জিহাদ' শব্দটা প্রতিনিয়ত ব্যবহার হয় যেমন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ, দূষণের বিরুদ্ধে জিহাদ, মহিলাদের অধিকার সংরক্ষনে জিহাদ প্রভৃতি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্লোগান তোলার জন্য জাতির জনক গান্ধীজী প্রায় সব সময় আরবী জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করতেন। তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বারগুইবা জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন সেখানেও তিনি জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। একথা

সবার জানা তিনি একজন কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ নেতা। যারা বর্তমানে নারীবাদী নানান আন্দোলন চালাচ্ছেন তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের আন্দোলনকে জিহাদ বলে তুলে ধরছন। জিহাদের ধারণা সাধারনত মুসলিম সৈন্য অভিযানকে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশ অন্য মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে সৈন্য অভিযান চালিয়েছে। এখানে ইসলামের কোন ভূমিকাই নেই। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর অবিসংবাদিত সুদান নেতা মাহদি অটোমান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তখন তিন সমস্ত তুর্কীদের মৃত্যু চেয়েছিলেন। ইসলামী দেশগুলোর চরমপন্থি কিছু দল অন্য সমস্ত মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব সময় জিহাদের ডাক দেয়। এবং এতে পরস্পর ইসলামের বাণী আওড়ায়।

কিছু চরম যুক্তিবাদী দল কুরআনের 'জিহাদ' শব্দটাকে সংগ্রামের জন্য যথোপযুক্ত শব্দ বলে মনে করেন। মুসলিম দুনিয়ার সাথে সূর মিলিয়ে স্বদেশী রাজনীতিতে বিরোধীদের সাথে লড়তে তাদের কাছে এ শব্দটি বড়ই চমকপ্রদ। তাদের কাছে তাদের সংগ্রামি কাজ কর্মের পরিকল্পনা জিহাদ নামেই পরিচিত। যদি নাইজিরিয়া, নাইজার, সোমালিয়া, মালি, আফগানিস্তান এবং লেবাননের দিকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে হাইজ্যাক বা কিডন্যাপিং এর মত কর্মসূচীকেও জিহাদ বলছে। তাই সব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় দেশে দেশে জিহাদের সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে অপব্যবহারও কম হচ্ছেনা। নাম যাই বলা হোক না কেন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আন্তর্জাতিক আইন কিন্তু নিজের দেশের মানুষদের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অস্ত্র সংরক্ষনের অনুমতি দান করে। পাশ্চাত্য শক্তিও এই প্রতিশব্দ তাদের অনুকুলে বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। আফগানদের উপর রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ শব্দটি বিশাল আন্দোলনের রূপ নিয়ে কাজ করেছিল।

ইউ. এসের সেন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আফগান প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সসস্ত্র সৈন্যকে কাজে লাগিয়েছিল। যাদেরকে আর্থিক ও কূটনৈতিক

সাহায্যও দেওয়া হয়েছিল। এই Central Intelligence Agency বহুদূরের আলজিরিয়া, ইয়েমন, চেচনিয়া এবং সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলো থেকে বহু যুক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর মিডিয়া তৎপরতায় এখন সম্পূর্ণ ভাবে মুসলিম শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন মুজাহিদিন, জিহাদ শহিদ প্রভৃতি।

কিসিংগারের মত বড়ই আশ্চর্যের "এশিয়ানদের দ্বারাই এশিয়ানদের আক্রমণ কর। এবং যোদ্ধাদের কাজে লাগাতে ইসলামী পরিভাষায় উদ্বুদ্ধ কর" বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট সম্পন্ন মাদ্রাসা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তে গড়ে উঠেছে। ঘুরপথে এরা ইউ এসের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত কিন্তু এদের শেখানো হয় শোভিয়েত বিরোধী চিন্তাধারার শোভিয়েত বাসীদের নিসংকোচে হত্যা করাকে বিরাট পূণ্যের কাজ বলে তাদের শেখান হয়। এমনকি সোভিয়েত বাসীদের মারলে জান্নাত তাদের জন্য নিশ্চিত এটাও শেখান হয়। কিন্তু আসলে এটি আমেরিকার বিরাট চাল, আর এ চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে প্রাক্তন ন্যাশান্যাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের বক্তব্যে।

> "The CIA gave arms and ammunition to muzahideen..... using these weapons and sophisticated training in the art of terror, these men successfully drove out the Soviets, but also waged terrible war on their own people killing at least 45,000 people in Kabul alone." (Ninan Koshy WOT, pp. 62-63).

CIA সংস্থা মুজাহিদিনদের অস্ত্রসস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল, আর এগুলো এবং উন্নত ধরণের সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ পেয়েই মুজাহিদিনরা রাশিয়ানদের তাড়াতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ সংঘর্ষে শুধু কাবুলবাসী কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে।

এই দলের দ্বারা কেবল সোভিয়েতবাসীরা বিতাড়িত হয়নি, বরং আমেরিকার অস্ত্রসস্ত্র ও প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আছে বিগত প্রায় এক দশক ধরে। যদিও এক দশক আগে সোভিয়েত সৈন্যরা

পাত্তাড়ি গুটিয়ে নিয়েছে। ১৯৯৫ নাগাদ এই দলটি খুবই শক্তিশালী হয়েছিল। এরপর তালিবানদের উত্থান ঘটে এবং তারা কাবুলের ক্ষমতার শীর্ষে পৌছে যায়। তারা তাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটিয়েছে যেমন মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষা সংকট, বৌদ্ধমূর্তি ধংস, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমান হাইজ্যাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে। আর এর সব কিছুর মূলে ছিল আমেরিকার প্রশিক্ষন প্রাপ্ত মুজাহিদিনরা। অবশেষে মুজাহিদিনদের চরম শক্তি প্রয়োগ হয়েছিল আমেরিকারই টুইন টাওয়ারের ধংসের মধ্য দিয়েই। মুজাহিদদের বন্ধুক যখন আমেরিকানদের দিকে ঘুরে গেল তখন সন্ত্রাস হয়ে গেল সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বুশের ঘোষিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইতিহাসে স্থান করে নিল।

এক সন্ত্রাস অপর সন্ত্রাসের জন্মদেয়। ইউ.এস. এর ইরাক ও আফগানিস্তানের উপর চালানো দুটি আক্রমণ কেবল আরো বেশী প্রতিশোধের প্রকৃয়া মাত্র। এর ফলে সারা মিড্‌ল ইস্টের দেশগুলো শুধু বোম্বিং ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। পরে ইউ. এসের হস্তক্ষেপ সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকেও উত্তপ্ত করে। এই তথাকথিত সন্ত্রাস নির্ভর যুদ্ধ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এক মিলিয়নেরও বেশী ইরাকিদের, আফগানিস্তানের ভবিষ্যত কি, তা অজ্ঞাত। পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে মানুষ ভয়ের দিন গুনছে।

এগুলোকে কি জিহাদের ক্যাটাগরিতে ফেলা যাবে? সন্ত্রাস ও অরাজকতা কোন সময় জিহাদের অংশ হতে পারে না। জিহাদ হল ব্যক্তি ও সমাজকে পরিছন্ন করার লাগাতার এক প্রচেষ্টাধারা। সমাজের অনাকাঙ্খিত যে সকল দুর্নীতি বাসা বাধে তা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রচেষ্টা হল জিহাদ। জিহাদ কখনও সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটাবেনা। সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করাও তার লক্ষ্য নয়। ইসলাম ভিন্ন অন্য মতাবলম্বী মানুষদের শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও জিহাদের মধ্যে থাকতে পারেনা। জিহাদ কোন মানুষের হৃদয়ে ভয় ধরাবে না বরং আসার আলো ফোটাবে। যুদ্ধ অবশ্য জিহাদের চরম অবস্থা। এটা শুরু হয় মানুষের হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূরীকরণের মধ্য দিয়ে। জিহাদ অনেক ঘটে থাকে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা ভুলপথে পরিচালিত হয়। ইসলামী উচ্চতর মূল্যবোধের সাথে এরকম জিহাদ খাপ খায়না।

ধর্মের অপব্যবহার

বার বার এক কথা ঘুরিয়ে বলা হয়ে থাকে যে মুসলিম চরমপন্থীরা যখন সন্ত্রাসবাদী কাজ চালায় তখন ধর্মের কাছে আর্তি জানায় তাদের একাজ সফল হওয়ার জন্য। তারা ধর্মের আশ্রয় নেয় বলে বলা হয় সন্ত্রাসবাদী কাজের সাথে নিশ্চয় ধর্ম জড়িয়ে আছে, এটা কেমন করে হতে পারে?

যদিও বলা হয় শুধু মুসলমানরাই এটা করে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সন্ত্রাস ছড়িয়ে আছে সবার মধ্যে। এমনকি স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ধর্ম নির্ভর অনেক শ্লোগান দিতে দেশবাসীকে দেখা গেছে। আর গত দু'শতাব্দী ধরে দেশবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে ধর্মীয় সূর কম বাজেনি। তাই ইসলামী চিন্তার এই শিকড় আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সমর্থনকে নাড়িয়ে তোলে জনপ্রিয় সমর্থন পেতে। আগে যেমন বলা হয়েছে এটা কেবল মুসলমানদের মধ্যে কি সীমাবদ্ধ তা ঠিক নয়।

এব্যাপারে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য August C. Krey-এর লোখা গ্রন্থ The First Crusade: The Accounts of Eye Witnesses and Participants এর নীচের উদ্ধৃতিটিতে নজর দেওয়া দরকার।

> "In November of 1095, pope Urban II initiated the first European attempt at colonizing the Muslim world, known in the West as the Crusades: Herein he calls Muslim people infidels and barbarians, and he commands the Christian people of Erope to empty their lands to go and murder them - one and all - in the name of Christ, in fact as a command of christ.

"১০৯৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় পোপ আরবান প্রথম ইউরোপীয়দের মুসলিম বিশ্বের উপর উপনিবেশ কায়েম করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের লোকেরা একে ধর্মযুদ্ধ হিসাবে জেনেছিলেন, মুসলিমদের তিনি নরাধম ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করে খৃস্টানদেরকে মুসলমানদের নিজ নিজ বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন এবং এক এক করে সবাইকে হত্যা করার আদেশও দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন তোমরা এ কাজ খৃস্টের নামে কর কারণ যিশুখৃস্ট এরকমই আদেশ দিয়েছেন।" এই গ্রন্থে আরোও লেখা হয়েছে।

> "Jerusalem was conquered on the 15th of July 1099 by the Crusaders who were also known as the Christian Knights, more than 70,000 inhabitants, both Jewish and Muslim, were slaughtered in cold blood.
>
> It should be further understood that no one survived this carnage on the side of the Muslims, or the Jews. Babies, children, women, and the elderly all fell under the swords of the Christian knights who then went to say "thank you" before the tomb of Christ. Should Christianity be judged by such events? Of course no Christian, in fact not even a civilized and just non-Christian, would agree to that. So then it can only be fair that Islam should not be judged for the far smaller minority of extremists who kill innocent people in the name of God.
>
> Another point which is worth remembering here is how the killing and looting in the name of Cristianity has in most cases been initiated, instituted and supported by governments and the church alike- what would be termed "institutional terrorism". On the other hand, the work of individuals without the sup-

port of any recognized or established government and likewise without the support of Muslim leadership.

Some members of the Baptist Christians denomination twisted their scriptures to support and carry out numerous abortion clinics bombing wherein many innocent people were killed?"

"১০৯৯ খৃস্টাব্দে ১৫ই জুলাই যখন খৃস্টান নাইট নামে পরিচিত ধর্ম যোদ্ধরা জেরুজালেম জয় করল তখন সত্তর হাজারেরও বেশী মুসলিম ও ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছিল ঠান্ডা মাথায়। আরোও চিন্তার বিষয়, কোন মুসলিম অথবা ইহুদি এই হত্যাকান্ডে বাঁচতে পারেনি। দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধবনিতা সবাই সেদিন খৃস্টান নাইটদের তরবারির শিকার হয়েছিল দলে দলে নির্মমভাবে। অথচ এই সকল নাইটদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল যিশুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নানা উচ্ছাসিত ভাষা। আর তারা জড়ো হচ্ছিল খৃস্টের সমাধি স্থানে। খৃস্টবাদের এই ঘটণাকে কি বলে ব্যাখ্যা করা উচিত? অবশ্যই কোন খৃস্টান অথবা অখৃস্টান কেউই এর সাথে একমত হতে পারে না। তাই আমাদের ভাবা উচিত যে বর্তমানে যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদী জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে তা আদৌ ইসলাম সমর্থন করেনা। সন্ত্রাসবাদী এ সব কাজের সাথে ইসলামকে জুড়ে দিলে মারাত্মক ভুল হবে, এটা আমাদের জানা দরকার। যতই ইশ্বরের নাম নেওয়া হোকনা কেন সন্ত্রাসবাদী কাজ কোন দিন ইসলাম সমর্থন করে না।

আর একটি মূল্যবান বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে এই রকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল সরকার ও চার্চের মিলিত প্রচষ্টায়। অপরক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারা যে সকল সন্ত্রাসবাদী কাজকারবার ঘটছে সেগুলো ক্ষুদ্রগোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা। এখানে কোন মুসলিম সরকার ঘটনার সাথে জড়িত নেই বলা যেতে পারে এমন কি বিশেষ কোন ধর্মীয় নেতার দ্বারাও এরা প্রভাবিত হয় না।

বাপটিস্ট খৃস্টান সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য তাদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশও বদলেছে যাতে করে বৈধতা মেলে অসংখ্য গর্ভপাতের ক্লিনিকে বম্বিং ঘটিয়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার মত অপরাধেরও"।

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তৃতীয় রিচের সৈন্যদের দ্বারা নিজেকে লেনিন আক্রান্ত দেখেছিলেন তখন তিনি এটা জেনেছিলেন যে মার্কসবাদ ও লেনিন বাদ কোনটিতেই মানুষের হৃদয় গলেনি। তাই তিনি রাশিয়ার জাতীয়তাবাদের দিকে মুখ ঘোরান, পরে তিনি Orthodox Church-কে আলিঙ্গন করেছিলেন। এটা ছিল Holy Mother Russia এর প্রতীক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বতন জাপান সম্রাট এমন এক উপায় খুঁজেছিলেন যাতে করে জন সমর্থন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। সেজন্য মিন্টো রিলিজিয়ন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আহ্বান জানান হয়েছিল জাপানিদের মনের পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে।

শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্মে প্রভাবিত সিংহলিরা বিছিন্নতাবিদী তামিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে মানুষের মন জয় করার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসিদের কাজে লাগিয়েছিল।

জার্মান নাজী স্বৈর শাসক হিটলার যিনি খৃস্টানভক্ত ছিলেন। তিনিতো চার্চগুলোর সাহায্য নিয়েছিল ইহুদি নিধন যজ্ঞে। আর এর ফলে প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রায় ছয় মিলিয়ন ইহুদিদের। এমনকি ইউনাইটেড স্টেটসের জাতীয় আন্দোলনে চার্চের পাদ্রী প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথোলিক ও ইহুদিদের ভূমিকা বেশ ভালভাবে পরিলক্ষিত হয়।

একই নিয়ম দেখা যায় ভারতেবর্ষে চরম ডানপন্থি শক্তি ও হিন্দু প্রতীকের উপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। এইভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবাবেগ সব সময় কার্যকরি ভূমিকা নিয়েছে যে কোন জন সমাজকে আন্দোলনমুখি করার জন্য। কিন্তু এটার মানে এই নয় যে কোন অভিযান, কোন যুদ্ধ বা কোন আন্দোলন ধর্মের সমার্থক। ধর্মকে বাদ দিয়েও এগুলো চলতে পারে।

অত্যাচার ও সন্ত্রাসের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

সন্ত্রাস ধর্মীয় কোন বিষয় নয়। এটা নানাবিধ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই হয়ে থাকে। এল.টি.টি.ই, আইরিস পাবলিকান আরমি, আলফা প্রভৃতি এরকম আরোও অনেক সংগঠন আছে যারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করে। অভিনব ভারতের মত অনেক সংগঠন আছে যারা হিন্দু আদর্শে জুড়ে আছে। এরাতো ধর্মীয় চরমপন্থি ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে এক সংযোগের উপর আলোকপাত করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে এটা মিডিয়ার অপপ্রচারে ইসলামের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। মিডিয়ার দৌলতে অনায়াশে সন্ত্রাসবাদকে 'ইসলামী সন্ত্রাস' রূপে প্রতিভাত করা হয়।

অবিচার ও অত্যাচার যখন মানুষের প্রকৃত অধিকারকে হরণ করে নেয় তখন অত্যাচারিত ও বঞ্চিত মানুষদের মধ্য থেকে সন্ত্রাস ফেটে পড়ে। যদি তারা বিশেষ কোন বিশ্বাসের অধীন হয়ে থাকে তখন এটা আশ্রয় নেয় ধর্মীয় অনুপ্রেরণার। এটা প্রায় সবাই জানেন যে এর সক্রিয় কর্মী ও যোদ্ধারা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের। তেমনিভাবে Irish Republican Army-যারা Northern Ireland-এর মানুষদের অধিকারের জন্য লড়ে যাচ্ছে তারা মূলত ক্যাথলিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পাশ্চত্য মিডিয়া তাদের ব্যাপারে সত্যটা প্রকাশ করতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে অনেকে সংগ্রাম করলেও সবাই সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত হয় না। উদাহরণ হিসাবে সরদার ভগৎ সিং এর কথা বলা যেতে পারে। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে হিরো। তিনি সব

যুগের যুবকও বিপ্লবীদের কাছে আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি। বিপ্লবীদের এক অংশ ব্রিটিশ পুলিস অফিসার জন সাউন্দার কে হত্যা করেছিল। ভগৎ সিং নিজেই অ্যাসেম্বলিতে বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়েছিল। কিন্তু এতে কোন প্রাণ হানি ঘটেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বড় বড় বিপ্লবীদের মধ্যে ভগৎ সিং একজন। কিন্তু ব্রিটিশরা তাকে সন্ত্রাসবাদী বলে লেবেল এঁটেছিল। যখন এরকম কোন গোষ্ঠী ব্যাপক প্রতি হিংসা পরায়ণ কাজ করে তখন পাশ্চাত্যের নির্বাচিত সরকারও এরকম সন্ত্রাসবাদী দলকে আশ্রয় দেয়। ব্রিটিস সন্ত্রাসবাদী পিটার ব্লিচ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার অস্ত্রবর্ষনের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং সাত বছরের জেল হাজতও খাটেন। অর্ধপথে তাকে কলকাতার জেলে আনা হয়েছিল। টনি ব্লেয়ার নিজেই টেরোরিস্ট নামে বেশ পরিচিত। এমন কি তিনি একাজে বেশ দক্ষ বলে পরিচিত। খুব বিস্ময়ের ব্যাপার কলকাতার জেলে আরোও পাঁচজন রাশিয়ান জেল বন্দী ছিলেন। এরকমভাবে আমেরিকার সন্ত্রাসবাদী রেমন্ড ডেভিস লাহোরে সন্ত্রাস ঘটানোর জন্য তালিবান নিয়োগ করেছিলেন। লাহোরে তালিবানদের দ্বারা দুজনের মৃত্যুর ফলে তাদের আত্মীয়দের 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিয়ে আমেরিকাও ঐ তালিবানদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭৬ সালে কিউবার উপর আমেরিকা যে বোম্বিং চালিয়ে ছিল সে কথাতো এই তো সেদিন ২০০৫ সালে গণমাধ্যম প্রকাশ করল। আর এর ফলে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে 'Posada' ছিল CIA এজেন্ট যিনি তিয়াত্তর জন কিউবিয়ানকে হত্যা করেছিল। তিনি ফ্লোরিডায় পাগলাগারদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিউবিয়ানদের আপিলে পোসাদাকে প্রত্যার্পন ব্যাপারে আমেরিকা যে ভূমিকা নিয়েছিল তা খুবই তাৎপর্যের। এ বিষয়ে The guardian পত্রিকা লিখেছে,

> "The case is an important one because at its heart is the belief, held in many part of the World that the US has one standard of morality for its allies and another for its enemies."

'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমেরিকার এমন এক হৃদয় আছে যা মিত্রের জন্য একরকম এবং শত্রুর জন্য অন্যরকম আর এরকমটাই

ভাবে পৃথিবীর নানান দেশ'।

তাছাড়া আমেরিকার দ্বারা ইরানে রসদ বহন করা হয় এমন অনেক সন্তাসবাদীও রয়েছে। শুধু ইরানে নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই সন্ত্রাসবাদী দল রয়েছে যারা আমেরিকার মদদে ও সহযোগিতায় সন্ত্রাসমূলক কাজ চালায়, Seymour Herash - Yoarker Magagine-এ তথ্য পেশ করেছে তা নিরপেক্ষ মানুষদের ভাবিয়ে তোলে। জর্জ ডব্লিউ বুশের সময়েই Muzahideen Khalq-এ Nevada সদস্যদের আমেরিকা আর্থিক সাহায্য, অস্ত্র ও প্রশিক্ষন সব কিছু দিয়েই সাহায্য করেছিল ইরানের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্য। এছাড়াও তথ্য রয়েছে যে আমেরিকা ইজরাইলি সন্ত্রাসবাদীদের একইভাবে সাহায্য করেছিল বেশ কিছু ইরানি পরমানু বিজ্ঞানিদের খতম করার জন্য ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। আমেরিকা এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে Muzahideen-E-Khalq-কে সাহায্য করেছে নানান দিক থেকে। এক কথায় বলা যায় সন্ত্রাসবাদীদের উৎপাৎদন কেন্দ্রই হল আমেরিকা। এই ধরণের চমকপ্রদ নেমক হারামি কেবল মাত্র পশ্চিমিদের দ্বারাই সম্ভব হয় এবং তারা রাজনৈতিক প্রচারকেও হাতিয়ার করেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় আসল সত্যটা হজম করে সন্ত্রাসবাদী কাজের দোষটা চাপিয়ে দেওয়া হয় ছোট ও দুর্বল দেশগুলোর উপর।

এটা পরিস্কার যে পাশ্চাত্য অন্যায় অত্যাচার প্রত্যাখ্যান করে চলে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কি হয় তা দেখতে চায়। The Organization of Islamic Conference (OIC) 2003 সালের আন্তর্জাতিক আধিবেশনে এই ব্যপারটাকেই সকলের নজরে আনার চেষ্টা করেছিল। এমন কি যাতে করে ইউনাইটেড ন্যাশন্স আন্তর্জাতিক স্তরে এব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে সে ব্যাপারে উদ্যোগি হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে, OIC বলেছিল,

> "We emphasise the importance of addressing the root causes of international terrorism, convinced that the war against terrorism, including foreign occupation,

injustice and exclusion, is allowed to thrive."

"আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। এটা জোরের সাথে সবাইকে বোঝাতে চাইছি যে সন্ত্রাস দমন কখনই সম্ভব হতে পারেনা যদি না আমরা সন্ত্রাস জন্ম নেওয়ার পরিবেশকে স্বচ্ছতায় ফিরিয়ে না আনি। আর এটা হলে আমরা বৈদেশিক অধিকার, অন্যায়ের প্রতিকার ও অন্যান্য সমস্ত কিছু ফিরিয়ে পাব।

কিন্তু ভুলভাবে পরিচালিত নানান উপাদানের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী একক কাজকর্মগুলোকে জিহাদ নামেই প্রচার করা হয়। জিহাদ নামের এই মিথ্যা অহেতুক কাজ কারবার গুলো মুসলিমদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে। আর মুসলমানদের জন্য এ ধরণের কার্যকলাপ মানবতার। এই ধরণের পাগলামি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা জুটিয়ে দেয়। আর এর ফলে ধীরে ধীরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম দানবিক আখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে। অযথা ইসলাম কলাঙ্কিত হয় -এই সকল ভুলপথে পরিচালিত দ্বারা।

ইসলামের জিহাদ হল উত্তম পন্থায় কল্যাণকর সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করা। আর এটা পাওয়ার জন্য পেনের যেমন সাহায্য নেওয়া যায় তেমনি সাহায্য নেওয়া যায় কোন মানুষের ভাল বক্তব্য কিংবা সরাসরি দৈহিক শক্তিরও। কিন্তু কিছু খুঁতখুঁতে মিডিয়া এসবের কিছু বোঝেনা তারা যখন কোন ভুল নির্দেশনায় পরিচালিত মুসলিম কোন হিংস্র কাজের সম্মুখীন হয় তখন তাকে জিহাদের নাম বলে চালিয়ে দেয় আর তাতে ইসলাম ও মুসলমানদের গায়ে কলঙ্ক লেপন হয় স্বাভাবিকভাবে। এটা লক্ষনীয় যে অনেক দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী বর্তমানে অবদমনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে। এটা অনেকটাই সত্য যে মিড্‌ল ইস্টের লোকেরা নানান ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাত্রার মানে যেমন খামতি আছে তেমনি রুচি সংস্কৃতিতেও আছে যথেষ্ট অভাব। কিন্তু পাশেই রয়েছে তেল সমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলো যেখানে তেল সম্পদের অভিজাত মালিকরা থাকেন।

বিশ্বের বেশীর ভাগ মুসলিম দেশগুলো রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারি শাসকদের অধীন। এই দেশগুলোতে গনতান্ত্রিক সমস্ত আন্দোলনকে খুব কঠোর হস্তে দমন করা হয়ে থকে। এসব দেশে মৌলিক অধিকারের অস্বীকৃতি, নাগরিক পরাধীনতা, অস্বচ্ছ সরকারের নৈরাজ্য চরম দুর্নীতি প্রভৃতি নানান উপাদান নাগরিক জীবনকে নারকীয় করে তোলে। আর এখানকার শাসকগুলো নিজেদের কুশাসন বজায় রাখার জন্য সব রকম সাহায্য পেয়ে থাকে পাশ্চাত্য শক্তির কাছ থেকে। আর এর বিনিময়ে তারা হাতিয়ে নেয় মুসলিম দেশগুলোর তৈল সম্পদ, বোকা মুসলিম শাসকরা এর কিছুই বুঝতেই পারে না তাদের কি ক্ষতি হচ্ছে বা মুসলিমদের কি ক্ষতি হচ্ছে। তাই এটা নিসন্দেহ যে এরকম এক ভয়ানক পরিবেশে কিছু প্রতিবাদী আন্দোলন মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এবং এদের দ্বারা যত্রতত্র যেখানে সেখানে অস্ত্রের অপব্যাবহার ঘটা খুব স্বাভাবিক। আর এই সব কাজ দেখে পাশ্চত্য ইসলামের বিরুদ্ধে ভ্রুকুটি দেখানোর সাহস আরোও বেশী করে পেয়ে থাকে।

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক Michael Walzer এ সমস্যা কে সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরছেন,

> "First oppression is made into an excuse for terrorism, and then terrorism is made into an excuse for oppression. The first is the excuse of the far left, the second is the excuse of the neoconservative right."

"প্রথমে সন্ত্রাসের অসিলায় দমনপীড়ন জন্ম নেয়। এবং তার পর সন্ত্রাস জন্ম নেয় দমনপীড়নের অসিলায়। প্রথম অজুহাত দূরে সরে গেলেও দ্বিতীয় অজুহাত হল নূতন রক্ষনশীল অধিকারী।"

প্রত্যেকেই এটা ভেবে থাকে যে সমাজে রাজনৈতিক অরাজকতা মোটেই কাম্য নয়। সন্ত্রাসতো মূলত রাজনৈতিক অরাজকতার ফসল। কিন্তু সারা বিশ্বে রাজনৈতিক অরাজকতা রুটিন মাফিক বেড়ে চলেছে দমনকারী শাসকদের দ্বারা। এমনকি তা নিজেদের লোকেদের বিরুদ্ধে হলেও। পারিপার্শ্বিক ঘরোয়া পরিবেশও এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

অবৈধ শাসন ব্যবস্থা অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

দীর্ঘদিন ধরে ইজরাইল প্যালেস্টাইনের উপর যে ধরণের মিশাইল ও রকেট বর্ষণ করে চলেছে তা অবর্ণনীয়। পরিণামে প্যালেস্টাইন সামান্য কিছু নিকট পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র প্রেরন করেছে মাত্র। কিন্তু সব সময়ের জন্য সর্বত্র ইজরাইলের দ্বারা যে সকল সন্ত্রাসবাদী কাজ কারবার চালানো হচ্ছে তা বড়ই ন্যাক্কার জনক। আর এরই প্রতিক্রিয়ায় হামাস ও হেজবুল্লাহর মত সংগঠনের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী চেতনা মাথাচাড়া দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আফগানিস্তান ও ইরাকে চলে আসা যুদ্ধ বিগ্রহ পাশ্চাত্যকে এটাই ইন্ধন যুগিয়েছে যে প্যাল্টোইনের সমস্যাকে সমাধান না করে বরং যুদ্ধাঞ্চলকে বাড়িয়ে তোলা দরকার, কেননা এর দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির বাজার পাওয়া যাবে। কারণ নূতন নূতন বিধ্বংসি যুদ্ধাস্ত্র আমেরিকা যত উৎপাদন করতে সক্ষম ততটা তৈরি করতে আর কোন দেশ সক্ষম হবে না। সাদ্দাম আমলে ইরাকে অস্ত্র ধংস তৎপরতায় এটাই প্রমান করে যে পশ্চিমিরা নিজেদের যুদ্ধ ব্যাপারে কত সচেতন। তাছাড়া তাদের অরাজকতা, রক্তপাত ও সন্ত্রাসবাদী কাজ কারবার চালানোর স্পৃহা দিন দিন কেমন বেড়েই চলেছে। এই রকম এক হতাশ ও নৈরাশ্যজনক পরিবেশে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তি সংগঠন গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আবার সব শেষে এটাই দেখা যাচ্ছে যে তালিবানদের সন্ত্রাস মূলক কাজ কারবার সম্বন্ধে যারা এত উদ্বিগ্ন তারাই সেই তালিবানদের কাছে নতজানু হয়ে করজোড় অবস্থায় কুর্নিশ জানাচ্ছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কাজের সব দায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

বর্তমান বিশ্বে যা ঘটে চলেছে তা দিয়ে ইসলামকে বিচার করলে তা কখনই সঠিক হবেনা। এ অস্থিরতার শিকার অবশ্য মুসলমানেরাই হয়ে চলেছে, কিন্তু তাদের রাগ, দমন পীড়ন ও প্রতিরক্ষা সব কিছুকে এভাবে দেখা যেতে পারে যেমনভাবে শ্রীলংকা, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং কঙ্গোর উৎপীড়িত মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। একসাথে মিলেমিশে বাস করার জন্য ইসলাম সব ধরণের শান্তি শৃঙ্খলা চায়। ইসলামের দৃষ্টিতে

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং মানবীয় সমস্ত রকমের মর্যাদা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের ঘোষণা,

> "...যদি কেউ খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ যদি কারোর জীবনদান করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল।" (আল কুরআন– ৫:৩২)

তাই সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী না করে বরং দমন উৎপীড়ন অন্যায় অবিচারের মূলৎপাটন হওয়া দরকার। তবেই পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে।

ইসলাম-ভীতির প্রচার

ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে পাশ্চাত্য বিশেষ করে United States of America নূতন শত্রুদের উপর সতর্ক পাহারা রেখেছিল। William Pfaff আমেরিকার একজন বিখ্যাত লেখক যিনি New Yorker পত্রিকায় International Herald Tribune পাতায় সব সময় লিখে থাকেন, তিনি লিখেছিলেন,

> "There are a good many people who think that the war between communism and the West is about to be replaced by a war between the West and Muslim."
>
> "To some Americans, searching for a new enemy against whom to test our mettle and power, after the death of communism, Islam is the preferred antagonist. But to declare a second Cold War that is unlikely to end in the same resounding victory as the first. Fear of the Green (green being the color of Islam) may well replace that of the Red Menace of world communism."

"অনেক লোক এমনই ভেবে থাকেন যে সমাজতন্ত্র ও পাশ্চাত্যের লড়াইটা এখন অন্যরূপ নিয়ে মুসলিম ও পাশ্চাত্যের লড়াই হতে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মৃত্যুর পর আমেরিকানরা নূতন শত্রু খুঁজছে যাদের উপর তাদের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সস্ত্র প্রয়োগ করতে পারা যায়। আর এ ব্যাপারে

তাদের কাছে ইসলামই পছন্দসই শত্রু। কিন্তু আমেরিকার ইসলামকে শত্রু বলে ঘোষণা করাটা দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধের ঘোষণার নামান্তর। যেটা প্রথমটার মত বিসদৃশ্যভাবে সমাপ্ত এবং একই বিজয়ের প্রতিধ্বনি। অবশ্য ইসলামের ভয়েই বিশ্ব লাল আতঙ্ক সমাজতন্ত্রের স্থান অধিকার করতে পারে।"

CIA মুজাহিদিন ও আল কায়েদাকে সমর্থন করেছিল যাতে করে আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমনের মত ভূমিকা তারা পূনঃপ্রবর্ত্তন করতে পারে। কিন্তু এটা বেশী দিন চলতে পারেনি কারণ পাশ্চাত্যের দ্বারা পুষ্ট আফগান সুসজ্জিত যুদ্ধবাজরা পশ্চিমি ও পশ্চিমি স্বার্থের বিরুদ্ধেই তাদের বন্দুক তুলে নিয়েছিল।

CIA প্রোপাগান্ডা দীর্ঘদিন ধরে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ নীতির যে স্বচ্ছ ভাবমুর্তি তুলে ধরেছে তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। মিড্‌ল ইস্ট ও অন্যান্য জায়গায় আমেরিকার স্বার্থকে লক্ষ বস্তু বানিয়েছিল আমেরিকার মদদ পুষ্ট মুজাহিদিনরা।

ইত্যবসরে আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদকেরা নিকটবর্তী বাজারগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি শুরু করে দিয়েছিল। এরফলে ঠান্ডা লড়াইয়ের শেষটা অস্ত্র বিক্রির মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল। আর শিল্প প্রবেশ করছিল প্রলম্বিত গতিহীন সময়ের মধ্যে। আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য যারা এম.এন.সি.এস থেকে নির্বাচনের খরচ সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তারা এরকম পরিস্থিতিতে অস্ত্র উৎপাদনের কাজে লেগে গেলেন। ৯/১১ এর ঘটনা তাদের অস্ত্র বিক্রির সুনামকে বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকাংশে। পরিসংখ্যান থেকে এটা জানা যায় যে এটা ছিল রেথিয়ন, বোয়ি ও লকহিড মার্টিনের মত অস্ত্র দানবদের স্বার্থে। হঠাৎ করে চারদিকে যুদ্ধ দামামা যখন বেজে উঠল তখন তার থেকে ফায়েদা লুটল অস্ত্র উৎপাদকেরা, আর তারা এ ফায়েদাটা একবারে নগদে পেয়েছিল।

পাশ্চাত্য গনতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রচার যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপক যেটা কিনা কল্প কাহিনীকে সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব করে দিতে পারে আবার বাস্তবকে করে

দিতে স্বপ্ন। তারা একরকম ধরেই নিয়েছে যে বেশীরভাগ লোকই খুব বোকা হাবা, তারা শাসন কাজের কিছুই বোঝেনা। আর তাদেরকে আবেগ প্রবন ও সক্রিয় করে তোলার জন্য আত্মমর্যাদামূলক প্রচারের আঘাত দিতে হবে। জন-সংযোগ শিল্প মূলত এমন এক উৎপাদন যা মানুষের মনে এ বিশ্বাস জাগায় যে এটি জনচেতনার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ভাল প্রচারের সমস্ত দিকই হল জন সাধারণের স্বাভাবিক ইস্যুতে লোকেরা যেন মাথা না ঘামায় বরং তাদের উচিৎ হবে এমন স্লোগান তোলা যাতে করে তারা মূল ইস্যু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উদাহরন স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের শ্লোগান "হয় তোমরা আমাদের সাথে থাক নচেৎ আমরা ধরে নেব তোমরা সন্ত্রাসবাদীদের সাথে আছ।" – কিন্তু বড়ই অদ্ভুদ ব্যাপার, এর প্রতিবাদের জন্য কোন কণ্ঠ গর্জে ওঠেনি।

ইউরোপের বহু দেশে মুসলমানেরা পরিকল্পিত ভাবে ভগ্নোদ্যোম পরিবেশের সম্মুখীন হচ্ছে। আর এ অবস্থা দিন দিন করে বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতির বিস্তার এতটাই যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এখনই সক্রিয় হতে হবে যদি তারা তাদের কাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেতে চায়। নানান বিষয়ে মুসলমানদের যেমন ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হতে হয় তেমনি এর বিস্তার এমনই ঘটেছে যে যেখানে নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয় যাতে ইসলামকে ঘৃনা ও সন্ত্রাস প্রচারকারী ধর্ম হিসাবে তুলে ধরা হয়। প্রতিটি অমুসলিম তাদেরকে প্রশ্ন করে, ইসলাম কিভাবে কাফিরদের হত্যার নির্দেশ দেয়? ইসলামে জিহাদ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেন? জিহাদিরা ইসলামী সৈন্য কেন? ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ তোলা হয়। ভূলে ভরা মুসলমান রাজাদের মন্দির ধংস ও হিন্দু ধর্ম অবমাননার তথ্য সম্বন্ধে যেমন নানান প্রশ্ন করা হয় তেমনি মুসলমানরা চারটি বিয়ে কেন করে– এর রকম প্রশ্ন বেশ মুখরোচক। বর্তমানে রাজনৈতিক ফায়েদা লোটার জন্য মুসলমানদের সন্ত্রাসবাদী মানপত্র দেওয়া থেকে অসংখ্য বদনাম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার যন্ত্রের ছড়ানো অপবাদ প্রায় একশভাগ সফলকাম বলা যেতে পারে। বোকাবাক্স ও নিউজ প্রিন্টের দৌলতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে

মিথ্যা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বার বার উদ্গীরনের ফলে সাধারণ মানুষ মুসলিমদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণার শিকার হয়ে পড়েছে। এমনকি মুসলমানেরা মুসলমানদের সম্বন্ধে সন্দিহান, ব্যাপার গুলো এতটাই গড়িয়েছে যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারিত ঘৃণাসীমা ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু আমেরিকা তেল সমৃদ্ধ দেশগুলি যখন আক্রমণ করতে যায় তখন সেদেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে। তখন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ঐ সকল দেশের যুক্ত থাকার আর সম্প্রদায়ের মধ্যে নানান রকম বিচ্ছেদ নীতি গণতান্ত্রিক বোধের উপরে কাজ করছে। সে জন্য এটা তাদেরকে দুর্বলও করছে এমন পদ্ধতিতে যাতে সমাজের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটে। এটা নিশ্চিতভাবে সমাজের দুর্বল শ্রেণির উপর প্রভাব ফেলবে এবং বিশ্ব জোড়া আর্থিক কাঠামোতেও এর প্রভাব কম পড়বে না। এই সময়ে মানবিক মূল্যবোধকে মানুষ তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেনা। সাম্প্রদায়িক এই বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্ধকার যুগ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাল্টানো দরকার। বর্তমানে সারা পৃথিবীর নানান দেশ থেকে ধর্মীয় অধিকার স্থাপনের আন্দোলন গণতন্ত্র এবং উন্নত চিন্তার উপর এক ধরণের সতর্কবার্তা বলা যেতে পারে। যদিও বেশীর ভাগ সময়ে এটা মনে করা হয় যে ইসলাম ও মুসলমানদের অরাজকতার মধ্যে সন্ত্রাস জুড়ে আছে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সন্ত্রাস জড়িয়ে আছে মূলত নানান ধরণের রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে। আর এই সকল রাজনৈতিক স্বার্থই ইসলামকে মিথ্যা দানবিক আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে।

আমাদের এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করতে হবে সুসম্পর্কের বার্তা নিয়ে। ধর্মের শান্তি বার্তা পৌঁছে দিতে হবে পরস্পরের মধ্যে। ধর্ম যে বহু মানবিক মূলবোধের বার্তা বহন করে তা জানাতে হবে প্রতিটি মানুষকে। আরোও জানাতে হবে ধর্মের একটা মূল্য আছে, এটা কেবল পালনীয় কিছু অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়। স্থানীয় কিংবা বিশ্বজোড়া স্বার্থ যারা খুঁজে চলেছে তাদের মধ্যকার মানবিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলার কাজ আমাদেরই।

সন্ত্রাসের মূল কারণ সমূহ

কয়েক দশক ধরে সারা পৃথিবীতে যত্রতত্র সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে এবং এর পরিণামে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, সেই সঙ্গে বহু সম্পদও নষ্ট হচ্ছে নির্বিচারে। নিউ ইয়র্ক-এ টুইন টাওয়ারের ধংস সন্ত্রাসেরই ফসল, এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনার দরকার নেই। যে সকল সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাদের সবাইকে এই অভিযোগ দেওয়া হয় যে তারা নাকি সবাই জিহাদি অনুপ্রেরণা থেকে এ কাজ করেছে। এমনকি তাদের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা পাকিস্তান থেকে মিডল ইস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন জাগে ইসলাম ও জিহাদি আদর্শ সম্বন্ধে কেননা, জিহাদকে অবিশ্বাসিদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ বলে ব্যাখা করা হয়ে থাকে।

সারা বিশ্বে সমস্ত জন সংখ্যার মধ্যে ২৩% মুসলিম এবং এদের সংখ্যা বর্তমানে ১৭০ কোটি দাঁড়িয়েছে। 'ইসলাম' শব্দটি আরবী 'সিলম' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ শান্তি। অর্থাৎ শান্তির ধর্ম। এমনকি ইসলামের বিরোধীরাও এটা স্বীকার করেন যে ইসলামের অর্থই হল শান্তি। এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ দেওয়ার কোন নাম গন্ধও নেই। ৯/১১ এর ঘটনার পরের দশকগুলোতে দেখা গেছে ইসলাম ও মুসলিমরা ন্যাটো ন্যাশনের বন্ধন মুক্ত সুগঠিত সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েই চলেছে। আমেরিকা– যে নাকি সারা বিশ্বে শান্তির গান গায়– আফগানিস্তান ও ইরাক দুটি মুসলিম দেশের উপর নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে এবং ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের সকল উন্নতির মেরুদন্ড। সন্ত্রাস ঘটছে নিয়মিত চক্র আকারে। দেশের মানুষ এখনও শান্তির কোন সীমারেখা দেখতে পাচ্ছেনা। এক মিলিয়নেও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আর গৃহহীন

হয়েছে প্রায় পাঁচ মিলিয়নের মত মানুষ। কুরআনে এই ধরণের মানব চরিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

> "তাদের যখনই বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করনা, তখনই তারা বলেছে আমরাতো সংশোধনকারী মাত্র। সাবধান প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। কিন্তু এর কোন চেতনাই তাদের নেই"। (আল কুরআন– ২:১১-১২)

সাম্প্রতিক বিশ্ব নিরাপত্তা ও শান্তির বিতর্ক অবদমিত হয়েছে শক্তিশালী পাশ্চাত্য এবং এর প্রচার মাধ্যম দ্বারা। এমনকি জাতি সংঘের Security Council ও তাদের ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রচার মাধ্যম যা কিছু শান্তি বলে প্রচার করছে সেটাই শান্তি বলে সবাই ভেবে নিচ্ছে। ছোট ছোট দেশগুলো শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে সকল পরামর্শ দিয়েছিল তা গ্রাহ্য করা হয়নি মোটেও। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম সুকৌশলে এড়িয়ে গেছে এ সকল পরামর্শ। অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে পরিকল্পিতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসবাদের তকমা এঁটে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমিদের দ্বারাই। প্রচার করা হচ্ছে মুসলমানেরা সন্ত্রাসবাদী। পশ্চিমিরা নিজেরাই এটা ভেবে নিয়েছে যে মুসলিম দেশগুলো কেবলমাত্র নিজেদের রক্ষা করতে পারে মাত্র। তাই তাদের নিরাপত্তা ও সারা বিশ্বে শান্তির জন্য তাদের বাবু সেজে লাঠি ঘোরানোর দরকার রয়েছে। পশ্চিমিরা তাদের উপর অভিযোগ দেয় এই বলে যে তারা নাকি এমন শক্তিকে উৎসাহ যোগান দেয় যারা পাশ্চাত্য উন্নতির অন্তরায়। এবং এই শক্তি পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানায়। পাশ্চাত্য নাগরিক স্বাচ্ছন্দ এতে বিনষ্ট হয়েই চলেছে। পশ্চিমিরা এমন এক শব্দ উদ্ভাবন করেছে যা কিনা সন্ত্রাসবাদ নামে পরিচিত। এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ উর্বর করেছে সমগ্র বিশ্বের মুখরোচক আলোচনাকে। বিশ্বের বেশীরভাগ উন্নত দেশ গুলোর বেশ কিছু স্বার্থ রয়েছে– যেগুলো পাশ্চাত্যের সাথে সংযুক্ত। এবং তারা পাশ্চাত্যের সাথে সংঘর্ষকে এড়িয়ে বরং তার নিয়ন্ত্রণে থাকাকে বেশী ভালবাসে। এদের কেউ যদি পাশ্চাত্যকে এড়িয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর

চেষ্টা করে তবে তার জন্য বরাদ্দ থাকে শাস্তি। এরকম রাজনীতির নানান ঘটনা থাকলেও আমাদের সত্যিকারের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার।

সম্প্রতী সন্ত্রাসের মূল কারণগুলো মিডল ইস্টের সাথে জড়িয়ে রয়েছে যেখানে ইহুদিদের ক্ষতি পূরণের কথা ভাবা হয় অথবা নাজী জার্মান ইহুদিদের হত্যার কথা আসে। আর এর ফলেই ইজরাইলি জায়নবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ব্রিটিশ অবৈধ সন্তান ধারণ করেছে পেটে আর এই শিশুকে লালন পালন করে চলেছে ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা, যে কিনা গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকারের কথা সবচেয়ে বেশী বলে থাকে।

এখানে ছিল মাত্র ৬০০০০ ইহুদি অপরপক্ষে আরবরা ছিল ৭৫০০০০। কিন্তু ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি A.G. Balfour ১৯১৮ সালে লিখেছিলেন,

> "The four Great Powers are committed to Zionism and Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long tradition, in present needs, future hopes, of far profounder import than the desires and prejudices of the 700,000 Arabs who now inhabit that ancient land."

"চারটি বড় শক্তি জায়নবাদের জিম্মায় রয়েছে। এতে ভাল হোক বা মন্দই হোক, এই জায়নবাদ দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। বর্তমানে দরকার ভবিষ্যতের গভীর আশা সঞ্চারিত করা এবং সাত লাখ প্রাচীন আরব ভূমির বাসিন্দাদের মর্যাদার চেয়েও জায়নবাদের স্বার্থরক্ষা বেশী জরুরী।

ইলান পেপ ইজরাইলের ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্ব। হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পন্ডিত মনুষটি Associated Press-এর Dan Perry-তে একটি সাক্ষাৎকারে চমৎকার ধরণের ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "ইজরাইলের জন্ম কি পাপের মধ্য দিয়েই হয়েছিল? "তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন– বিতাড়িত ছিন্ন মূল ইহুদিরা আসল এবং আরব ভূমি দখল করল। আমরা উপনিবেশের

অধিকারী হতে চেয়েছিলাম সেই সঙ্গে আমরা নৈতিকতাকে পদদলিত করলাম। এরকম অত্যাচার কি ক্ষমা হতে পারে? প্যালেস্টাইন সাত শতক ধরে মুসলিম শাসনের অধীনে আছে।

ইজরাইলের আর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও পন্ডিত হলেন টম সেজেভ। তিনি তার বই Jews and Arabs Under the British Mandate গ্রন্থে অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে বোঝা যায় ১৯১৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কেমনভাবে প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ইহুদি শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিয়মমাফিক ক্ষমতা ও প্রতারণা প্রয়োগ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা একাজে জটিল পরিস্থিতিতে সাহায্য নিয়েছি জায়নবাদী নেতাদের। লেখকের গবেষণা তাকে এক চমৎকার সিদ্ধান্ত পৌঁছে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন,

> "The Zionist Organization and the British government continued to bribe influential Arabs! President Roosevelt, the 32nd President of the United States, told Chaim Weizmann, the Zionist leader, President of a Zionist Organization, and the first President of the State of Israel, that, in his opinion, the Arabs could be bought... In the minutes of their conversation the Arab word 'Baksheesh' appears. The Jewish agency's biggest client seems to have been Prince Abdullah of Trans-Jordan."

"জায়নবাদী সংগঠন ও ব্রিটিশ সরকার আরব প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘুস দিয়ে চলেছে। ইউনাইটেড স্টেটসের বত্রিশতম প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট ইজরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট ও সেই সঙ্গে জায়নবাদী অরগানাইজেশানের প্রেসিডেন্ট চেয়াম ওয়াইজম্যানকে বলেছিলেন যে তার মতে আরবকে কিনে নেওয়া যেত। অল্প আলাপ আলোচনায় আরবী শব্দ 'বকশিস' শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল তাদর মুখ থেকে। ইহুদি এজেন্সির বড় মক্কেল হল ট্রান্স জর্ডানের প্রিন্স আবদুল্লাহ।

আজকে আরবদের নিজেদের দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারা বৃটিশ ও মার্কিন নেতাদের থেকে কোন অংশে কম নয়, যেমনটি তারা করে থাকে ইউনাইটেড স্টেটস, ব্রিটেন এবং তাদের সৃজিত আরব ভূমিতে ইজরাইলের এই বোমা বর্ষণকারী এবং উন্মত্ত পাগল লোকেরা আসলে নিজেদের অকল্পনীয় দূর্নীতি ও অদক্ষ মাঝারি শাসকদের দুশাসনের ফসল।

পশ্চাতপটের আলোচনা সাপেক্ষে এটা মনে হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট বর্তমান সমস্যার উপর ইসলামের কোন ভূমিকা নেই। ইজরাইলি নৃসংশতার অব্যবহিত পরেই ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এর মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য ও তেল সম্পদে নিজেদের সমৃদ্ধ করে নেয়। ইজরাইলের সাথে তিনটি বড় ধরনের যুদ্ধ, হেজবুল্লাহ এবং ইজরাইলের মধ্যে যুদ্ধের ফলে লেবাননের ধংস সাধন, জোর পূর্বক ওয়েষ্ট ব্যাঙ্ক ও সিরিয় যায় বিভিন্ন অংশ দখল, প্যালেস্টাইনিদর অবরুদ্ধ করে রাখা এবং অন্যায়ভাবে তাদের কৃষিভূমি দখল, তিন দফায় আরবদের ঘরছাড়া করা, ৩৭৫ কিলোমিটার প্রাচীর তুলে আরবদের কর্মস্থল ও পারস্পরিক সম্পর্ককে বিছিন্ন করা– প্রভৃতি বিষয় তাদের ক্রোধে ঘৃতাহুতি ঢেলে চলেছে। যুদ্ধ অপরাধকে ঢাকার জন্য সমস্ত ঘটনার উপর ইসলামী রঙ চড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন বুশ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা চালিয়ে ঘোষণা করে দিল এটা ধর্ম যুদ্ধ।

কিন্তু এ বিষয়ে, ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড কিংডম এবং ইজরাইল যারা মুসলিম দেশগুলোতে যুদ্ধ ব্যবসার প্রোমোটার তাদের কিছুতেই বোঝান-যাবেনা। শুধুমাত্র এটা নয়, ইরাক আক্রমণের ঘটনায় মিথ্যেভাবে বলা হয় ইরাক নাকি বিধ্বংসি সব অস্ত্রসস্ত্র জমা করে রেখেছে। আর আফগানিস্তানের উপর কার্পেট বোমা বর্ষণে যুক্তি দেখান হয় আলকায়েদা নাকি এই দেশকে ব্যবহার করে ৯/১১ -তে নিউ ইয়ার্ক আক্রমণ করেছিল। বিখ্যাত লেখক নোয়াম চোমস্কি আফগানিস্তানের উপর ইচ্ছাকৃত আগ্রাসনের জন্য বুশ শাসনকে অভিযুক্ত করেছেন।

ইউনাইটেড স্টেটস আক্রমণের ছক কষে চলেছিল, আর ১৯৫৮ সাল থেকে মুসলিম জাতি গুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় ছিল। ইসেন

হাওয়ারসের শাসনে তিনটি অঞ্চল নির্বাচন করা হয়েছিল সেগুলো হল নর্থ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া এবং মিড্‌ল ইস্ট– সবকটিই ছিল তেল উৎপাদনকারী দেশ। স্টেট ডুয়েলের সেক্রেটারি সমস্যাটাকে "চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের" সমস্যাবলে নির্ধারণ করেন। মনে করার বিষয়, এটা কিন্তু 'ইসলামী চরম পন্থী নয়' উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের ক্ষমতার বিজয়, প্রেসিডেন্ট নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ এবং অনৈক্য, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের প্রয়োজনের তুলনার বেশী গণতান্ত্রিক আচরণ– সবকিছুই স্টেট ডিপার্টমেন্টকে বিরক্ত করছিল। আর তখন ইজরাইল যুদ্ধের জন্য উৎসাহ পেল ও আরবদের মধ্যে সাংঘাতিক জাতি বিবাদ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। কোন অনুমানই তখন ছিলনা যেটা বর্তমান ক্রোধের পেছনে চাপা প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আরব এবং মুসলিম দেশগুলোতে।

পাশ্চাত্য যে ইসলামের উপর সন্ত্রাসের দোষারোপ চাপায় তা পশ্চাৎপটের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা দরকার। সন্ত্রাসের তকমা দেওয়াই হল সবচেয়ে সাম্প্রতিক সুকৌশল যা ইসলাম ভীতির ধারণাকে উস্কে দেয় ইসলাম সম্বন্ধে অ-চেতন ব্যক্তিদের মধ্যে।

সন্ত্রাস নিয়ে প্রচার মাধ্যমের দ্বিচারিতা

পশ্চিমী সভ্যতা উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে উন্নীত। বিশ্বায়ন এই উন্নয়নের আদর্শগত ভিত করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে। উপগ্রহ ও কেবল প্রযুক্তির দ্বারা এটা অর্জিত হয়েছে। পাশ্চাত্য, বিশেষ করে অ্যাংলো আমেরিকান প্রচার মাধ্যম সারা বিশ্বের অনলাইন সার্ভিস, রেডিও এবং ছাপা সাংবাদিকতার তদারকিতে নিজেদের প্রভূত্ব ফলাচ্ছে এই গ্রহের সর্বত্র।

আন্তর্জাতিক দূরদর্শন বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন পাশ্চাত্য সংবাদ সংস্থা দ্বারা। সেগুলো হল রয়টারস টেলিভিসনের মত টিভি নিউজ এজেন্সি, ওয়াল্ড টেলিভিসন নিউজ এবং এ.পি.টি.ভি। তাছাড়া রয়েছে স্যাটেলাইট থেকে সংগৃহীত রিপোর্ট, কেবল ভিত্তিক রিপোর্ট, এবং বি.বি.সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস। আর এ কাজ তারা সমাধা করে চলেছে বিশ্বের নানান ভাষায়।

বিশ্বের বড় বড় চারটি আন্তর্জাতিক খবর সংস্থা হল, অ্যাসোসিয়েট প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস 'ইন্টার ন্যাশানাল, রয়টার এবং এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস প্রথম তিনটি হল অ্যাংলো আমেরিকান আর এদের দ্বারাই সারা বিশ্বের ৮০% খবর প্রচার হয়। যদিও এগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা তবুও ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক এরা পাশ্চাত্য সংবাদই পরিবেশন করে থাকে, বিশেষ করে অ্যাংলো আমেরিকান এজেন্ডা নিয়ে।

প্রকৃত পক্ষে আমাদের ভারতবর্ষের বেশীরভাগ ইংরেজি নিউজ পেপার ও নিউজ ম্যাগাজিন গর্বের সাথেই পাশ্চাত্য নিউজ পেপার ও নিউজ ম্যাগাজিনকে ফিচার এবং কমেন্টারি হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে পাশ্চাত্য খবর সংস্থা গুলো অনায়াশেই বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে আমাদের দেশের মাটিতে। আর এগুলো সবকিছুই পাশ্চাত্য স্বার্থকে বেশী

করে মজবুত করে চলেছে। এমন কি স্বদেশীয় খবরের কাগজগুলোর উপাদান গৃহীত হয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বড় বড় ইংরেজি পত্রিকার অনুবাদ থেকে। এটা কেবলমাত্র আমাদের ভারতেই ঘটে তা নয় বরং এটির বিস্তার পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। বহু ভারতীয় পত্র-পত্রিকা এতই অনুকরণ প্রিয় যে এরা পাশ্চাত্য পত্র-পত্রিকার, ভাষা, খবর, মূল্যায়ন এমনকি প্রবাদ ও গ্রহণ করে ফেলে।

'ইসলামী সন্ত্রাস' কথাটা মূলত পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত একটি পরিভাষা। কিন্তু পাশ্চাত্যের স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি এই শব্দটিকে ব্যবহার করে চলেছে। অবশ্য ইসলাম কখনও সন্ত্রাসের কথা বলে না বরং সন্ত্রাস উচ্ছেদের কথাই বলে থাকে। তবে কিছু সন্ত্রাসবাদী ইসলামের পিছনে নিজেদের আশ্রয় খুঁজেছে এবং পাশ্চাত্য অনুগামী প্রচার মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে তাদের এই কাজ করাবার ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

প্যালেস্টাইনের উপর ইজরাইলী হস্তক্ষেপ জাতি সংঘের চুক্তিকে বার বার যেমন লঙ্ঘিত করেছে তেমনি ইউ. এসের রক্তাক্ত বিশৃঙ্খল পরিবেশে মিড্‌ল ইস্টে বিভিন্ন দলের হাতে অস্ত্র উঠে এসেছে। আর পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো খবর প্রকাশে দু'ধরণের নিয়ম গ্রহণ করেছে দক্ষতার সাথে। ইজরাইলের অন্যায় অধিকারকে রুখতে মুসলিমরা যখন তৎপর হয়ে ওঠে তখন তাতে ইসলামীক টেররইজম বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পাশ্চাত্য এই সকল প্রচার মাধ্যমগুলোর দোষ নির্ণয়ে বিভিন্ন জাতির জন্য আলাদা আলাদা মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকে।

এগুলো দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সন্ত্রাসবাদের তকমা আঁটতে পারলে পাশ্চাত্যেরই অনেক স্বার্থ আছে। সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে বেশী বেশী করে দ্বিমুখি কথা ও দ্বিমুখি আচরণে বড় ধরণের চক্রান্ত কাজ করছে। কারণ ইসলাম ও মুসলমানরাই কেবল বিছিন্নকারী কাজের জন্য দায়ী থাকে। মুসলিমদের ব্যক্তিগত কিছু কাজ সন্ত্রাসমূলক হলেও তাকে ইসলামের ও সমগ্র মুসলমান জাতের সাথে জুড়ে দেওয়া

যায় না, যেমনভাবে হিন্দু ধর্মকে কিছু হিন্দুর দ্বারা সংঘটিত অপ্রীতিকর কাজের সাথে তুলনা করা অন্যায়। কিন্তু এ ধরণের ভারসাম্যহীন প্রচার মাধ্যমের জন্য পাশ্চাত্যই শক্তিশালী হয়ে চলেছে। যেখানে সন্ত্রাসের নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানেও তারা সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলে গলা ফাটাচ্ছে।

পশ্চিমি দ্বিমুখি বক্তব্য কত সম্প্রসারিত তা লক্ষ করুন। সলমন রুশদির ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক লেখা সাত্যিকারে মুসলমানদের আঘাত করেছিল কিন্তু পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম বাক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু একাজে তাকে বাধা দেওয়াই উচিত ছিল। অপর পক্ষে ডেভিড ইরভিং অস্বীকার করার জন্য জেল খেটেছিল, ইউনাইটেড স্টেটের পক্ষে ইজরাইল ও তার রাজনীতি নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। এবং এর সমস্ত প্রচেষ্টা ও আইনই অ্যান্টি সেমেটিকদের জন্য বাধা। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে সব কিছুতেই পাশ্চত্য সংকেত শিরধার্য।

ভয়, সন্ত্রাস ও গণহত্যা

পাশ্চাত্য অগ্রসর

খৃস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা মুসলিম ধর্ম অনুশীলনে কেউ সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা যে ঘৃন্য উপাদান বহন করে বেড়ায় তার উৎপত্তি তারা যে সমাজে বাস করে সেই মাটিতেই, যেটা নাকি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উৎসাহ পেয়ে থাকে। এটা সহজেই বোঝা যাবে যদি আমরা বর্তমান বিশ্ব ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বড় বড় অস্থিরতা, গনহত্যা ও সন্ত্রাসের দিকে হাল্কাভাবেও চোখে বোলাই। এখনও পর্যন্ত তারা কিন্তু মুক্তি পেয়ে গেছে তাদের বিশ্বাসের উপর নিন্দাবাদের অহেতুক চোখ রাঙানি থেকে। এর কারণ এই সকল সন্ত্রাসবাদী ঘটনা গুলো ঘটে যাওয়ার সাথে সাথে এর দায় ইসলাম ও মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর সারা বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা এই অসত্যটাকে গ্রহণ করে ফেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে।

এমনকি ইসলাম যখন সপ্তম শতাব্দীতে খৃস্টান এলাকায় প্রবেশ করেছিল তখন ইসলাম ধর্মকে এ তকমা দেওয়া হয়েছিল যে এটি 'যুদ্ধ ও অস্থিরতার ধর্ম'। খুব সাম্প্রতিক মিড্‌ল ইস্টের অস্থিরতা ও ৯/১১ তে ঘটে যাওয়া ঘটনা ইসলাম ও মুসলমানদের পুনরায় সন্ত্রাসবাদ ও অসহিষ্ণুতার দায়ে অভিযুক্ত করেছে। এটাই কি সত্য ঘটনা, না এধরণের মন্তব্যে কোথাও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে?

উদাহরণ স্বরূপ কিছু ঘটনা তুলে ধরতে পারা যায় যেখানে দেখা যাবে সন্ত্রাসের ব্যাপারে পাশ্চাত্য একই বিষয়ের দোষ অনুসন্ধানে কেমনভাবে

দুধরণের মাপ কাঠি ব্যবহার করেছে। প্রচার মাধ্যম দ্বারা মানুষের মনযোগের উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে নীচের ঘটনা গুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এতে দেখা যাবে প্রচার মাধ্যম যা আলোচনা করে সে সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোক সচেতন নয়।

✸ কিং মার্টিন লুথার নিজের প্রোটেস্টান্ট বিশ্বাস পরিবর্তন করেছিলেন ক্যাথলিক চার্চের পরিচালক পোপের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য, এটার পরিণামে মার্টিন লুথারের অনুসারীরা অমানবিক শত্রুতার শিকার হয়েছিলেন, এমনকি তাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং তাদের মহিলাদের ধর্ষণ পর্যন্ত করা হয়েছিল। আর এগুলো ঘটেছিল ক্যাথলিক খৃস্টানদের দ্বারা। কেউই ক্যাথলিকদের এই টানা বর্বরোচিত আচরনের জন্য বাক্য ব্যয় করেনি। এটা কি সন্ত্রাসবাদী কাজ ছিল না?

✸ নাজী স্বৈর শাসক হিটলার ছিলেন খৃস্টান ভক্ত আর তিনি ছ মিলিয়নের মত ইহুদি হত্যা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তার এ কাজ ঈশ্বরেরই পরিকল্পনা, ঐ সময়ে কেউ কি এটা বিশ্বাস করতে পারত যে ইহুদিদের সম্বন্ধে খৃস্টান ধর্মবিশ্বাস এরকমই? এমন কেউ কি আছে যে হিটলারকে খৃস্টান সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করবে? কক্ষনই নয়।

✸ স্ট্যালিন, মুসলিনি, মাওসেতুং লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, কেউতো এদের সন্ত্রাসবাদী তকমা দেয়নি।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক গুলোতে বসনিয়ার মুসলিমদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ কলঙ্ক কে কি কেউ খৃস্টান গোঁড়া সন্ত্রাসবাদী বলতে পারবে?

✸ ব্রিটিস গুন্ডাবাজ পিটার ব্লিচ এবং ডেনমার্কের কিম ডেবি পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়ায় অস্ত্র ছাড়িয়েছিল বিপ্লবীদের জন্য। কিন্তু ভারতীয় প্রচার মাধ্যম তাদের ব্রিটিশ অথবা পশ্চিমি সন্ত্রাসবাদী বলতে লজ্জা পেয়ে ছিল। বরং ভারত সরকার পিটার ব্লিচকে মাত্র সাত বছর শাস্তি দেয়ার পর ছেড়েই দিল।

✸ ১৯৯০ সালের ঘটনা। আমেরিকান নেভি ইরানের এক যাত্রী বাহী

বিমানকে গুলি করে নামাল। এ ঘটনায় প্রাণ দিয়েছিল একেবারে নিরপরাধ ২৫৯ জন যাত্রী। কেউতো এ ধরণের ঘটনাকে সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করেনি কেন?

✸ ১৯৮৪ সালে আমাদের দেশ ভারতের ভুপালে American MNC Union Carbide Plant থেকে বিষাক্ত গ্যাস লিক করে আড়াই হাজার লোকের প্রাণ গেল। এই ঘটনার জেরার জন্য আমেরিকা Union Carbide-এর প্রধান Anderson-কে ভারতের হাতে কিছুতেই অর্পন করল না। পৃথক আচরণ লক্ষ্য করার মত। লকারবাই বোম্বার্সদের জেরার জন্য কিন্তু পশ্চিমিরা নাছোড়বান্দা হয়ে দাবি চালিয়ে ছিল। কেন এরকম দ্বিমুখি আচরণ পশ্চিমিদের দ্বারা হয়ে থাকে?

✸ ইজরাইল অকল্পনীয় নৃশংসতা চালিয়েছে নিরস্ত্র প্যালেস্টাইনিদের উপর। নিজের দেশে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে তিন তিনবার। প্যালেস্টাইনিদের আলাদা রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বর্ণ বিদ্বেষি প্রাচীর। তাদেরকে পানীয় জল সরবরাহও করা হয়নি। তথাপি মিডল ইস্টে একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ইজরাইলকে অভিবাদন জানান হয়। এর প্রধান মন্ত্রী মেনাচেম বেগিন ব্রিটিস সরকারের দ্বারা সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত হলেও Noble Peace Prize–পেয়েছিলেন।

✸ আইরিশ রিপাবলিক আরমি বোমা বর্ষণ করে অসংখ্য ব্রিটিশ নাগরিকদের হত্যা করেছিল কিন্তু কখনও তাদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয়নি। যদিও এটা সবার জানা ছিল যে উত্তর আয়ারল্যান্ড ক্যাথোলিক বিশ্বাসের প্রচার ভূমি খুঁজছিল।

✸ মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে যত মানুষ খুন বা কিডন্যাপ হয়েছে তার চেয়ে মুসলিম দেশ গুলোতে অনেক বেশী খুন ও কিডন্যাপ হয়েছে। (www.nationmaster.com statistic Report)

✸ আমেরিকানরা হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর নিউক্লিয়ার বোমা বর্ষণ করে দুলক্ষ নিরীহ নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করেছিল। এদের মধ্যে নারী ও শিশুরাও তো ছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এটার দায় কি আমেরিকার

উপর পড়বেনা? যেহেতু আমেরিকানরা বার বার একথা বলে থাকেন যে যুদ্ধ এক পক্ষের সৈন্যের সাথে অপর পক্ষের সৈন্যের হওয়া দরকার, তার লক্ষ্য কোন সময়ে সাধারণ মানুষকে লক্ষ করে নয়। তথাপি এরকম উল্লেখযোগ্য পরিস্থিতিতে কেউ কেউ মনে করেন যে এরকম বড় ধরণের হত্যা কান্ডে জাপানিরা তাদের মনোবল হারিয়ে ছিল এবং নিজেদের সমর্পন করেছিল আমেরিকার কাছে।

সচেতন কোন মানুষই চায়না তাদের কোন ভুল কাজের জন্য তাদের ধর্ম, তাদের জাত কিংবা তাদের দেশ তাদের ঐ মন্দ কাজের জন্য দায়ী হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে হিটলারের দোহাই দিয়ে সমস্ত জার্মান জাতিকে খারাপ ভাবা যায় না। তেমনিভাবে আমেরিকান যে বোমা বর্ষণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে তার জন্য সমস্ত আমেরিকা বাসী কখনই দায়ী হতে পারে না।

ক্রুসেড যুদ্ধে বর্বরতার কারণে বেশীর ভাগ খৃস্টান অত্যন্ত ভীত হয়েছিল। ব্যাপারটা এই রকম ছিল এক সময় এক খৃস্টান রিপোর্টার বক্সার মুহাম্মদ আলিকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি ওসামা বিন লাদেনের ধর্ম ইসলামকে পালন করে কি অনুভব করেন? মুহাম্মদ আলি সহজ কথায় উত্তর দিয়ে বলেছিলেন "হিটলারের ধর্ম পালন করে আপনি কেমন অনুভব করেন?"

প্রায় বেশীর ভাগ মানুষ তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এরকমই ভেবে থাকেন যে "কাঁচের ঘরের বাসিন্দাদের কখনই পরস্পর পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করা উচিত নয়" এখন আপনারা নিজেরাই ভাবুন আপনারা মুসলিমদের দিকে আঙ্গুল তুলছেন কিভাবে? কারণ আপনাদের মধ্যেও তো একই দোষ বিদ্যমান আপনাদেরওতো ঘর সামলানো দরকার।

এখন সাধারণ বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক। সন্ত্রাসমূলক কাজে মুসলমানদের অবস্থান কোথায়? আর অন্যান্যদের স্থান বা কোথায়? পশ্চিমি তথ্য দিয়েই বিচার করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা আমাদের ভাবনার বিপরীত। ১৯৯৭ সালে ইউ. এস স্টেটের Patterns of Global Terrorism–এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৭

সাল পর্যন্ত ইউরোপে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রাসবাদী কাজ চলেছে, যার সংখ্যা ৮৩১ টি। তারপরে ল্যাটিন আমেরিকায়, এর সংখ্যা ৬০২। একই বছর গুলোতে ইউরোপে ঘটেছিল ৭৬২১ টি ঘটনা এবং মিডল ইস্টে ঘটেছিল ২৬৯২ টি ঘটনা। উপরের এ পরিসংখ্যান পেশ করেছে Ralph Braibanti of the Edmund নামক সংস্থা। A. Walsh School of International Affairs in Washington নিচের তথ্য প্রদান করেছে,

> "The use of poison gas by the Buddhist Aum Shinrikyo, the Oklahoma Bombings by an American christian, the long standing terrorism by Northern Irish Catholics, the violence of Indian Hindus (remember Babri masjid and its bloody aftermath) and Buddhist against Muslims, the vicious ethnic and cleansing by christian Orthodox Serbs in Bosnia and Kosovo, the violence of drug-related Catholic mobs in Latin America, and the terrorism of hindu Tamils against the Sinhalese Buddhist government of Sri Lanka demonstrates the universality of terrorism and the cultural and religios universality of its origins."

"বৌদ্ধবাদী আওম সিনরিকোদের দ্বারা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার, আমেরিকান খৃস্টানদের দ্বারা ওকলাহামে বোমা বর্ষণ, নর্দান আইরিস ক্যাথলিকদের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাস, ভারতীয় হিন্দুদের দ্বারা অস্থিরতা সৃষ্টি (বাবরি মসজিদ ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ), বৌদ্ধদের দ্বারা মুসলমানদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা, বসনিয়ায় ও কসভোতে গোঁড়া খৃস্টানদের দ্বারা পৌত্তলিকদের উচ্ছেদ সাধন মাদক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ক্যাথলিক জনতার মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় অস্থিরতা, তামিল হিন্দুদের সিংহলিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস,– প্রভৃতি নানান সন্ত্রাসমূলক ঘটনা সারা পৃথিবীকে অস্থির করে রেখেছে।

FBI–এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় যে সব সন্ত্রাসবাদীমূলক ঘটনা ঘটেছে তার তালিকা বিশাল। (fbi.gov)

1) মুসলিম সন্ত্রাসবাদী মাত্র ৬% ল্যাটিন সন্ত্রাসবাদী হল ৪২%, চরম বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের হার ২৪%, চরম পন্থি ইহুদি সন্ত্রাসবাদী ৭%, সম্প্রদায়গত সন্ত্রাসবাদীদের হার ১৬%,

2) যদি সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে মাত্র ৬% মুসলিম হয়ে থাকে তা হলে পশ্চিমি মিডিয়া সন্ত্রাস বলতে সব সময় কেন ইসলাম ও মুসলমানদের উল্লেখ করবে? এটাকে কি আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র বলবনা? এ ধরণের মিথ্যা প্রচারের ফলে তো স্বাভাবিক ভাবে সারা বিশ্বে মুসলিম বিদ্বেষি মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে এটি আরো বড় আকার ধারণ করবে।

3) অন্য দিকে আমরা যদি ইউরোপের দিকে তাকাই তা হলে অন্য চিত্র দেখতে পাব। 24.07.2011 Times of India তে প্রকাশিত Europol এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হল,

> Separatists, not Islamists, behind most of terror strikes in Europe'

"বিছিন্নতাবাদীরা ইসলাম পন্থী নয় ইউরোপে সংঘটিত বেশিরভাগ সন্ত্রাসে দায়ী"

4) Deccan Herald-এ প্রকাশিত তথ্য হল,

> The killing of six Sikhs at a gurudwara in Wisconsin by an ex-US army man with reported links to White supremacist groups underscores the continuing and serious threat posed by racism and intolerance in the United States.
>
> The terrorist assault on the American Sikh community draws attention again to White terrorism, Thousands of Americans have been interrogated and arrested simply because they are Muslim or have beards.
>
> This stereotyping blinded America to the enemy

within. While US officials focused on Islamic terrorists, they allowed Christian/White supremacism to spread and terrorist organisations to proliferate. Since 2009 the number of right-wing extremist groups in the US is reported to have increased from 149 to 824."

Wisconsin-এ একজন প্রাক্তন সেনার দ্বারা গুরুদুয়ারায় ছয় জন শিখ হত্যার ঘটনার সাথে সাদা বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের সন্ত্রাসমূলক দলের যোগ আছে বলে মনে হয়। আমেরিকায় এ ধরণের জাতিগত বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে একটা বিশেষ শ্রেণি।

সন্ত্রাসবাদীরা আমেরিকার শিখ সম্প্রদায়কে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, আর এটাই সাদা সন্ত্রাসের দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরায়। হাজার হাজার আমেরিকানদের জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু আসলে এরা ছিল দাড়ি ধারী মুসলিম। এই বাঁধা ধরা ছকই আমেরিকাকে শত্রুদের প্রতি এরকম অন্ধ করে তুলেছে। যেই না US কর্তা ব্যক্তিরা ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের উপর আলোকপাত করল অমনি আমেরিকানরা সাদা বর্ণ বিদ্বেষের প্রভুত্ব বিস্তারে উঠে পড়ে লাগল এবং সন্ত্রাসবাদীদের মাটি উর্বর করল। ২০০৯ থেকে অসংখ্য ডান চরম পন্থি দল US-এ বেড়ে চলল এবং তা ১৪৯ থেকে ৮২৪ সে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলি খুব হাল্কাভাবে সাদা বর্ণবিদ্বেষি খবর পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু বল দর্পি ক্ষমতা বিস্তার ও সন্ত্রাস প্রকৃত পক্ষে US-এর সমর্থনেই হয়ে থাকে যাতে ইজরাইলের আধিপত্য আরবভূমিতে স্থায়ী থাকে। জেরুজালেম যাতে তাদের হাতে থাকে এটাও -এর কারণ। কিছু বুদ্ধিজীবি এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, নীচের ঘটনাগুলোর দিকে লক্ষ করুন।

* বার বার ইজরাইলের অধিকার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে UN চুক্তি কোন সময় বাস্তবায়িত হয়নি কিন্তু US বল প্রয়োগ করে মিড্‌ল ইস্টে প্রবেশ অধিকার পেয়েছে ইরাকের উপর কুয়েতের বার বার দখল পাওয়ার জন্য।

* বার্লিন প্রাচীর পতনে আমেরিকা উৎফুল্ল হয় কিন্তু ইজরাইল যখন ৩৭০ কিমি দীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করে প্যালেস্টাইনিদের সেচভূমি ও কুপ থেকে আলাদা করার জন্য তখন আমেরিকা তাদের অর্থ সাহায্য করে। ইহুদিদের সেটেলমেন্টের জন্যও আমেরিকা অর্থ প্রদান করে থাকে।

* একটা ডাহা মিথ্যা ছড়িয়েছে MNC মিডিয়ার মধ্যে। আর তাহল ইরাক Weapons of Mass Destruction -এর আধিকারী এবং এর ফলে এক উচ্চ আশা সৃষ্টি হয়েছিল তেল সমৃদ্ধ ইরাকের উপর দখলদারি খাটানোর জন্য।

* ইজরাইলের অস্ত্র বৃদ্ধির উপর কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, কিন্তু ইজরাইলকে অনুমতি দেওয়া হল ইরাকের নিউক্লিয়ার প্লান্টের উপর বোমাফেলার, এবং ইরানকে একাধিক বার হুমকি প্রদান করা হল। ইরানকে উদ্ভাবন করা হল আমেরিকার নিরাপত্তার কাছে হুমকি হিসাবে, কি আশ্চর্য কথা! অথচ অনেক আগেই আমেকিরা জাপানের লোকালয়ে নিউক্লিয়োর বোমা বর্ষণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল।

* আমেরিকানরা এমনটিই ভাবছে যে ইসলামের উন্নতি সারা বিশ্ব নিরাপত্তার কাছে জুজু হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ বেশীরভাগ মুসলিম দেশ অগণতান্ত্রিক। মানুষের মৌলিক অধিকার পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়না, শাসকরা বড়ই অত্যাচারি প্রভৃতি। Islam versus the West নামে অনেক সেমিনারই হয়ে থাকে যাতে ইসলামের তুলোধোনা করা হয় কিন্তু চিন সমন্ধে কোন বিবেক তাড়না আমেরিকানদের হয় না অথবা এমন কোন সেমিনার হয়না Dialogue belween china and the West নামে।

মানুষ সাধারণত প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিরক্ষাকারী তখনই হয় যখন তাদের অধিকারগুলো প্রদান করা হয়না বরং তা পদদলিত করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকে সংগ্রামের সুত্রপাত হয়ে থাকে। এটা আবার পাশ্চাত্যেরই নবীকরণ। সবশেষে আমরা বলতে চাই যে আমাদের উচিত নূতন বিশ্বের শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। যেখানে ন্যায় বিচার থাকবে। থাকবে সাম্য ও মৈত্রি। পৃথিবীর জন্য শান্তি, কবরের জন্য নয়।

তামিলনাড়ুর বিছিন্নতাবাদীরা প্রায় তিন দশক ধরে শ্রীলঙ্কার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তামিলনাড়ুতে প্রেরিত সেনারা প্রশিক্ষন লাভ করছে। তারা মিনামবাকাম এয়ারপোর্টে বোমা ফাটাল এবং এক আত্মঘাতি বোমা ফাটিয়ে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রি রাজিব গান্ধীর প্রাণও কেড়ে নিল। কিন্তু কোন সময় তাদের তামিল সন্ত্রাসবাদী বলে ভ্রুকুটি দেখান হয়নি। এটা সকলের ভালভাবে জানা যে শ্রীলংকার এই সকল তামিল সবাই হিন্দু যদিও এটা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে।

আলফা ১৯৯০ - ২০০৬ সালের মধ্যে ৭৪৯ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তবুও তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করতে দেখা যায়নি। এগুলোর দ্বারা আমাদের সামনে কি বড় ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না যে, আমেরিকা প্রকৃত পক্ষে সন্ত্রাস বিতর্কের মুখোশ পরে ইসলামের মৌল বিশ্বাসকে খতম করতে চাইছে? তারা কি মুসলিম দেশ গুলোকে ধংস করতে চাচ্ছেনা? দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই তো বোঝা যাচ্ছে যে তারা মুসলিম দেশ গুলো থেকে সব সম্পদ চুসে নিতে চাইছে, তাদেরকে দমন করে রাখতে চাইছে নিজেদের অধীনে।

ইসলামে আত্মঘাতি বিষ্ফোরণ নিষিদ্ধ

গবেষণায় এটা দেখা গেছে যে আত্মঘাতি আক্রমণ সাধারণভাবে অসংগত ভূমি দখল ঠেকাতে হয়ে থাকে। এখন প্রথমে আত্মঘাতি বোমা বিষ্ফোরণ বলতে কি বোঝায় তা আমাদের জানা দরকার। আত্মঘাতি বিষ্ফোরণ হল এমন ঘটনা যাতে কোন ব্যক্তি কোন বিষ্ফোরক নিয়ে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আসে এবং নিজের মৃত্যুকে অনিবার্য করে তোলে। এই ধরণের কৌশল সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্থান, পাকিস্থান, ইরাক চেচনিয়া এবং সোমালিয়ায় ঘটে চলেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের দ্বারা।

খুব দুঃখজনক কথা যে এটা কেবল মিলিটারিদের লক্ষ্য করে ঘটানো হয় না বরং বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরা এর শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন এটা মুসলিম মিলিট্যান্টরা অবৈধ অধিকার ঠেকাতে ঘটিয়ে থাকে। তাদের কাছে এটি বড় জন প্রিয় কৌশল, কিন্তু শ্রীলংকার তামিল টাইগাররা এই আত্মঘাতি বিষ্ফোরন প্রথম শুরু করেছিল। আর তারা একাজ করেছিল লাগাতার ভাবে ১৯৮০ সালে। এমন কি আত্মঘাতি বিষ্ফোরনে তারাই ছিল তালিকার প্রথমে। তখন থেকেই মিড্‌ল ইস্টের দেশগুলোতে বার বার ঘটেছে এই রকম বিষ্ফোরন কান্ড। এবং তা চরম আকার নিয়েছিল আমেরিকা দ্বারা আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের সময়ে।

ব্যাপক সুনামের অধিকারী আমেরিকার রাষ্ট্র বিজ্ঞানী রবর্টি পোপ Dying to Win নামক গ্রন্থে আত্মঘাতি বিষ্ফোরন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

> "Suicide terrorism is rising around the world, but there is great confusion as to why. Since many such attacks-including, of course, those of September 11,

> 2001- have been perpetrated by Muslim terrorists professing religious motives, it might seem obvious that Islamic fundamentalism is the central future 9/11s can be avoided only by a wholesale transformation of Muslim societies, a core reason for broad public support in the United States for the recent conquest of Iraq."

"আত্মঘাতি সন্ত্রাস সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটছে। কিন্তু একটা বড় সংশয় দেখা দিয়েছে এটা ঘটার কারণ নিয়ে। যেহেতু ৯/১১ এর ঘটনা সহ অনেক আত্মঘাতি ঘটনা ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে মুসলিমরা ঘটিয়েছে তাই ইসলামী মৌলবাদই হল এর মৌলিক কারণ। এই ধরণের ধারণাই -এ সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে যে ৯/১১ এর পরে ভবিষ্যত কেবল মাত্র মুসলমান সমাজের দ্বারাই এড়ানো যেতে পারে, আসল কারণ হল সাম্প্রতিক ইরাক অধিকারের জন্য আমেরিকায় বড় ধরণের জন সমর্থন লাভ।"

অবশ্য আত্মঘাতি সন্ত্রাস ও মুসলিম মৌলবাদের মধ্যে পূর্ব কল্পিত সংযোগের ধারণা ভুল পথে পরিচালিত হচেছ এবং এটাও সম্ভব হতে পারে যে এর দ্বারা আমেরিকার পরিস্থিতির অবনতি এবং অহেতুক মুসলিম ক্ষতি সাধনের মত ঘরোয়া ও বৈদেশিক রাজনীতিতে প্রভাব পড়ছে।

প্রফেসর পোপ ১৯৮০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে যে ৩১৫ টি আত্মঘাতি বিস্ফোরন ও আক্রমণ ঘটেছে তার তথ্যভিত্তিক বিবরণ পেশ করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে এ ধরণের সন্ত্রাসবাদীরা কোন আক্রমণে কমপক্ষে একজনের প্রাণ দিয়েছে। অবশ্য প্রফেসর পোপের এই তথ্যে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই সকল আক্রমণকে যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমর্থিত ছিল। যেমন নর্থ কোরিয়ার আক্রমণ ছিল সাউথ কোরিয়ার বিরুদ্ধে। সারা বিশ্ব জুড়ে যে সকল সন্ত্রাস ঘটছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য এর আগে কোন সূত্র পেশ করেনি। ইংরাজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা যেমন আরবী, হিব্রু, রাশিয়ান, তামিল এবং অনলাইনে এর প্রকাশ পেয়েছে। এই তথ্য থেকে এটাই পরিস্কার যে আত্মঘাতি সন্ত্রাসের সাথে

ইসলামীক মৌলবাদের সংযোগ নগন্যই। এমনকি অন্যান্য ধর্মের সাথেও এর সংযোগ তেমনই। বাস্তবে আত্মঘাতি আক্রমণের গুরু শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগাররা হিন্দু হলেও চরমভাবে ধর্মে অবিশ্বাসী, মূলত এরা মার্কস ও লেনিন পন্থি।

২০০৭ সালেই সবচেয়ে বেশী আত্মঘাতি সন্ত্রাস হয়েছে এ বছর এর সংখ্যা ছিল ৬৫৮ টি, এর মধ্যে আমেরিকার আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের সময় ঘটে ৫৪২ টি আত্মঘাতি সন্ত্রাসবাদী কাজ। এ তথ্য ইউনাইটেড স্টেটসেরই দেওয়া। গত পচিঁশ বছরে যে কোন সময়ে আত্মঘাতি সন্ত্রাসের চেয়ে দ্বিগুণ ছিল এটা, সম্প্রতি গত সাত বছরে যা আত্মঘাতি সন্ত্রাস চলেছে তা ছিল সমস্ত ঘটনার ৪/৫ অংশের ও বেশী। এখন এই ধরনের কাজের অনুশীলন সারা বিশ্বে দ্রুত বেড়ে চলেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট-এ বিষয়ে লিখেছে,

> "Since 1983 bombers in more than 50 gruop from Argentina to Algeria, Crodtia to china, and India to Indonesia have adapted truck bombs, car bombs to make explosive belts, vests, toys, motorcycles, bikes, boats, backpacks and false-pregnancy stomachs... Of the 1840 incidents in the last quarter century, more than 86 percent have occurred since 2001, and the highest annual numbers have occurred in the past four years."

"১৯৮৩ সাল থেকে আর্জেন্টিনা থেকে আলজিরিয়া, ক্রোটিয়া থেকে চায়না এবং ইন্ডিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র আত্মঘাতি সন্ত্রাস চলেছে গাড়ি বোমা, কার বোমা, মোটর বোমা, খেলনা বোমা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। এমনকি বিষ্ফোরন বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্কুল ব্যাগে, গেঞ্জির ভিতরে কিংবা ফলস মা সেজে পেটের মধ্যে। গত শতাব্দীর শেষের পঁচিশ বছরে ১৮৪০ টি ঘটনা ঘটলেও ২০০১ সাল পর্যন্ত পূর্বে ঘটা সন্ত্রাসের চেয়ে ৮৬% ঘটনা বেশী ঘটেছে। এবং সম্প্রতি শেষ চার বছরে সবচেয়ে বেশী ঘটেছে এ ধরণের ঘটনা।"

বেশীরভাগ যুবক তখনই চরম পন্থি হয়ে ওঠে, যখন দেখে নিজের দেশের উপর পশ্চিমিরা সেনা শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে, নিরীহ সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করছে, বিশেষ করে নিজের পরিবারের মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী কাউকে না কাউকে মেরে ফেলছে। এগুলোই মূলত আত্মঘাতি সন্ত্রাস ঘটানোর মৌল কারণ। তাই এগুলির সাথে ইসলামী আদর্শের কোন যোগাগোগ নেই।

এ ব্যাপারে প্রফেসার পোপের পর্যবেক্ষন শিক্ষামূলক। তিনি তার উপদেশে লিখেছেন,

> "Rather, what nearly all suicide terrorist attacks have in common is a specific secular and strategic goal: to compel modern democracies to withdraw military forces from territory that the terrorists consider to be their homeland. Religion is rarely the root cause, although it is often used as a tool by terrorist organizations in recruiting and in other efforts in service of the broader strategic objective."

"বরং সমস্ত ধরণের আত্মঘাতি সন্ত্রাসমূলক আক্রমন ঠেকাতে যা করতে হবে তা হল আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ গুলোকে সেনা প্রত্যাহার করা সেই সকল দেশ থেকে যারা মনে করছে যে তাদের নিজের দেশের শান্তির জন্য, এটা হওয়া দরকার। ধর্মীয় কারণ এ সব সন্ত্রাসে খুবই নগন্য ব্যাপার, যদিও সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের প্রচেষ্টা সফল করার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকে। যদিও বিভৎস অভিজ্ঞতা বেঁচে থাকেনা কিন্তু এটা দূরদর্শনে সাক্ষী হয়ে থাকে। একজন চরমপন্থি অস্থিরতা ঘটানো থেকে দূরে না থেকে পারে না, কেন না সে ইসলামের অনুশাসন শুনেছে যেখানে বলা হয়েছে ইসলাম আত্মঘাতি কাজ কারবারের সমর্থন নেই।

হাজার হাজার সন্ত্রাসমূলক কাজে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়। কোন একজন ব্যক্তি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ সাড়া দেয় তখনই

যখন তার মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা কিংবা সম্মান স্পৃহা জেগে ওঠে। আর এটা তার দ্বারা তখনই ঘটে যখন সে দেখে যে তার দেশ, তার পরিবার, তার ধর্ম বা তার জাতি অন্যদের দ্বারা বাঞ্ছিত বা হেনস্তা হচ্ছে নির্মম ভাবে। এরকম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শত্রুপক্ষের রক্ত ঝরাতে তখন বদ্ধ পরিকর হয়ে পড়ে ঐ ব্যক্তিটি। সমাজ বা দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে সে প্রতিশোধ স্পৃহার বৈধতা খোঁজে কিন্তু কারোর কাছে যখন তার প্রাপ্য বৈধতা পায় না তখন ধর্মকে মাথায় নিয়ে এ ধরনের ধুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের ক্রোধকে আদর্শগত দিক থেকে বিচার করার পর তার মনে একটি বজ্র কঠিন সংকল্প স্থান পায়।

কিন্তু কেন, একজনের এরকম পাগলামি পূর্ণ সংকল্প নেওয়া চলবে না? এটা কি ধর্মীয় শিক্ষা, এ সব সন্ত্রাসবাদীদের পিতামাতা অথবা এমন কিছু যান্ত্রিক প্রভাব তাদের কে সন্ত্রাসবাদীর খাতায় নাম লেখায়। অসংখ্য পথ রয়েছে, এই পথগুলোর কোন একটিকে গ্রহণ করে সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ মানুষদের উপর আক্রমণ করে বসে যখন মুসলিম বিরোধী মৃত্যু মিছিল ঘটল মুম্বাইয়ের রাস্তায়, তখন যুক্তিসঙ্গত দাবি তোলা মুসলিম যুবকদের পাওয়া গেল যারা স্পষ্ট ভাবে আকাঙ্খিত ছিল তীব্র পরিশোধ যোগ্য আক্রমণ দ্বারা এর প্রতিশোধ নেওয়ার। গুজরাটের মুসলিম বিরোধী ব্যাপক হত্যা কান্ডের পর অনেক সমাজ বিজ্ঞানী এটা ভেবেছিলেন যে এই নারকীয় হত্যাকান্ড নিশ্চিত করে অনেক সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম দেবে। এ দুর্ঘটণার সম্ভবনায় এতটা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তারা এটা সাবধান বানী করে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন। বিশাল জনসংখ্যার মাঝে নিশ্চিত করে অসহায় মুসলিমদের একটি অংশ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগলের মত কিছু সন্ত্রাসবাদী কারবারে নেমে পড়তে পারে। এভাবে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা হল ক্রোধ, রাগ, আঘাতের প্রতিক্রিয়া, এর শাস্তি হবে না। সময়ের সাথে সাথে এটা নদীর ধারার মত পরবর্তী উত্তরসূরীদের কাছে পৌঁছে যাবে। তা কেউ রোধ করতে পারবেনা।

খুব আনন্দের কথা যে ধরণের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা মুসলমানদের

দ্বারা ঘটবে বলে মনে করা হয়েলি তা গুজরাট বা ভারতের অন্য কোথাও ঘটেনি। মুসলমানদের বহু সংগঠন উৎপীড়িত মুসলিমদের নৃসংসতার পথে না চলার জন্য উপদেশ দেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে নিজেদের দূরে থাকার জন্য বিনীত আবেদন জানিয়েছিলেন, যাইহোক এর ফলে কাজ হয়েছে। নিপীড়িত গুজরাট দাঙ্গার ভয়াবহ শিকার মুসলমানেরা আইনের পথে হাঁটছে। উলামাদের অনুরোধ ছিল একের দোষ অপরের উপর চাপিয়ে কোন প্রকারে কাউকে যেন উৎপীড়ন না করা হয়। সেই সময় বেশ বড় বড় নেতৃস্থানীয় কিছু আলেম এই ফতওয়া প্রদান করেছিল যে আত্মঘাতি সন্ত্রাস হারাম বা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ কাজ। মিশরের কায়রো ও সৌদি আরবে বহু মুসলিম স্কলার সেমিনার করে এধরনের কাজকে নিষিদ্ধ কাজ বলে জানিয়েছেন। এধরনের কাজ পাপেরই নামান্তর। তাছাড়া ইসলামে এর অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

কিছু ভুলপথে পরিচালিত মুসলিমদের যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া থেকে সাবধান হওয়া দরকার। এটা কখনই চিন্তা করা যায় না যে কোন কিছু আজ হারাম থাকলে কালকে আবার সেটা হঠাৎ করে হালাল হয়ে যাবে। ইসলামে এ ধরনের নীতির সমন্বয় থাকতে পারে না। আত্মহত্যাকে কেবল মাত্র মুহাম্মদ (সাঃ) হারাম ঘোষনা করেননি বরং স্বয়ং আল্লাহ এ কাজের অনুমোদন দেননি। জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ কর। অল্প জানা মুসলিমদের কাছ থেকেও জ্ঞান নিওনা এবং কারোর ইচ্ছামত মতামতকে গ্রহণ করা যায়না। এ ধরণের আক্রমণগুলোর মধ্যে অনেক আক্রমণ রাজনৈতিক কারণেই ঘটান হয়ে থাকে। ইসলামের সাথে এর নাম গন্ধ পর্যন্ত থাকেনা। তবুও এধরণের আক্রমণকারী জীবন দিলেও 'শহিদ' হতে পারে না, শহিদরা আল্লাহর আশির্বাদ পাবে। কিন্তু এধরণের কাজে শহিদিভাগ্যতো দূরের কথা বরং পাপই অর্জন হয়। মহান আল্লাহ কোরআনে ঘোষনা করেছেন,

> "নিজেকে ধংস করনা, সর্বপরি আল্লাহ তোমার উপর করুনাশীল। (আল কুরআন- ৪:২৯)

> "নিজেকে ধংসের মধ্যে নিক্ষেপ করনা"
> (আল কুরআন– ২:১৯৫)

আত্মহত্যা সম্বন্দে কঠোর হাদীসও রয়েছে। নবী (সাঃ) বলেছেন,

> "বস্তুত যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে হত্যা করে সে নিশ্চিত করে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে সেখানে সে চিরকাল বাস করবে" (বুখারী শরীফ)

কুরআন হাদীসের একাধিক রেফারেন্স থেকে জানা যায় নিজের হাতে নিজের প্রাণ হনন করা মস্ত বড় পাপের কাজ। হাদীস থেকে আরোও জানা যায় আল্লাহ আত্মহত্যা কারীদের জান্নাতে স্থান দেবেন না।

ইসলামী মৌলবাদ

সাধারণভাবে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে, কেউ যদি ইসলামের কথা বলে তাহলে তার গায়ে মৌলবাদী কথাটা সেঁটে দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে এটির কোন অর্থ হয় না। এধরণের আচরণের পরিনাম কিন্তু ভয়ানক হয়ে থাকে। মুসলিমরা পাথরের মত কোন সত্তা নয়। এরা মানুষকে ইসলামের রাজনৈতিক মতামত, ব্যক্তির অবস্থান প্রভৃতির মধ্যে স্থান দিয়ে থাকে।

অবশ্য গত কয়েক দশকের মধ্যে বাকপটু কিছু ঐতিহ্যগত মুসলিমদের মধ্যে এক ধরণের গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে বেশ কিছু মৌলিক কারণের জন্য মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

১। বহু আধুনিক নেতা মুসলমানদের উপর জোর পূর্বক নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যগত নেতৃত্বকে নানান দিক থেকে কোনঠাসা করেছে। তাছাড়া মুসলমানদের জেল খাটিয়েছে মুসলমান নেতাদের উপর নিমর্ম অত্যাচার চালিয়েছে, মুসলিম চিন্তাবিদদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে নির্বিচারে।

২। অর্থনীতির চমকপ্রদ ব্যর্থতা এবং আধুনিক নেতাদের উন্নত পলিসি খুব কম সংখ্যক মানুষকে সম্পদশালী করেছে।

৩। ১৯৫০ সাল থেকে পারস্পারিক গালাগালি, বিদ্রুপ ব্যঙ্গ ইত্যাদি ফুটে উঠেছে নিজেদের চিন্তায় ও জীবন ধারায়।

৪। পাশ্চাত্য নীতিতে মুসলমানদের ইচ্ছা করে হীন দেখান হয়েছে। তাদেরকে নানান দিক থেকে হয়রানি দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া মুসলিম নেতাদের মিথ্যে করে দানবিক চিত্র আঁকা হচ্ছে। ধীরে ধীরে মুসলিম দেশগুলো শোষিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের আধিপত্যের দ্বারা। ফলে এই দেশ গুলো ঋনের বোঝা নিয়ে মাথা উঁচু করতে পারছে না।

আজ এবং আগামীকাল

ইসলাম ও সন্ত্রাসকে এখন একে অপরের পরিপূরক হিসাবে দেখান হচ্ছে। ৯/১১ এর ঘটনার পর থেকে এই জিনিসটার উপর এ বদনামের রং চড়ান হয়েছে মূলতঃ পশ্চিমিদের দ্বারা। কিন্তু সত্যকে কোন দিন ঢাকা রাখা যায় না। ওয়াশিংটনের পেন্টাগন এবং নিউ ইয়র্কের ধ্বংসকারী সন্ত্রাসবাদীদের জন্য ইসলাম কোন অংশে দায়ী থাকতে পারে না। তেমনিভাবে গ্যাস চ্যাম্বার হত্যাকাণ্ডে খৃস্টান ধর্ম দায়ী নয় আবার আইরিশ আতঙ্কবাদীদের কর্মকান্ডের জন্য ক্যাথলিকরাও দায়ী নয়। সন্ত্রাসবাদী বা আতঙ্কবাদীরা তাদের সন্ত্রাদী তৎপরতায় নিজেদের বিকৃত চিন্তার কাছে দায়ী থাকে। তারা কোন আইন বা যুক্তি বোঝেনা। তারা তাদের খামখেয়ালিপনায় সন্ত্রাসী কু কর্ম সাধন করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে তারা বিবেকহীন মানুষ, যাদের অন্যায় কাজে সব কিছু উল্টে যায় সমাজের।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি যা কিনা বেশীরভাগ মুসলমানের দৃষ্টি ভঙ্গি মূলত দাঁড়িয়ে আছে ন্যায় নীতি, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর। মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদীদের সাথে তুলনা করা মানে তাদের মানবিকতাকে অবমাননা করা, ১.৭ মিলিয়ন যা কিনা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যায় পাঁচ জনের মধ্যে একজন হল মুসলিম। এদের অপমান করা কিংবা এদের ইতিহাস বা সমাজকে কোন সময় হীন দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে না।

মুসলমানরা হল ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহি এক জাতি। আটা'শ বছরেরও বেশী সময় ধরে মুসলামনদের সভ্যতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভ্রমন, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতিতে আলোক বিস্তার করেছে। নূতন নূতন বিষয় আবিস্কারে মুসলমানদের অবদান চির দিনের জন্য স্মরনীয়।

বর্তমানে মুসলমানেরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে খুঁজে পেতে চাইছে। ঔপনিবেশিকতার বোঝা ফেলে দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চাইছে মুসলিমরা। দমনপীড়নের সব বোঝা সরিয়ে মুসলমানেরা বর্তমানে এক নূতন জগতের স্বপ্ন দেখছে। যে জগত কিনা এক দায়িত্বশীল সমাজের দাবি তোলে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকের নানারকম গন্ডগোল ও মতানৈক্যের মাঝে থেকেও বিশ্বের সমস্ত মুসলমানেরা নিজেদের উন্নতিকে একটি ডায়নামিক ক্ষমতা প্রদান করতে চাইছে যেটা কিনা ভবিষ্যতে মুসলমানদের মর্যাদাকে সম্মুন্নত করবে বলে আশা করা যায়। তাই সর্বত্র শোনা যাচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ) এর তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যত বার্তা। এই ধরনের নূতন বার্তা, উপদেশ, ধারণা। প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কেবলমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের পরিবর্তন করবেনা বরং এটা ভবিষ্যতে প্রদান করবে এক প্রকৃত অবদান যা কিনা পরিবর্তনশীল একসমাজ দান করবে এই পৃথিবীকে।

এটা নিশ্চিত যে মুসলমানেরা বর্তমানে যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে তার উত্তর খুব সোজা নয়। এবং এই সমস্যার সমাধানও খুব সহজ নয়। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি এসে যায় যে আমরা ভয়ানকভাবে হতাশা অনুভব করি, কিন্তু মুসলমানেরা তাদের বিশ্বাসগত ভাবে আশাবাদী এবং এরা এখন নিজেদের মেধা, নিজেদের সমাজ, নিজেদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও পূর্ণচিন্তার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্ত কিছু চিন্তাভাবনা বর্তমানে মুসলমানদের মাথায় এসেছে। তারা বুঝেছে সচেতনতা সংগ্রামের অর্ধেক।

নারী

লুকান অতীত ও অনিশ্চিত বর্তমান

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নারীদের সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে সে বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞান আনার জন্য আমাদের উচিত অতীতের বিভিন্ন সমাজের নারীদের উপর তখনকার মানুষদের ধ্যান ধারণাকে বিশ্লেষন করে দেখা।

১। ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

ব্যাবিলনীয় আইনে নারীদেরকে হীন ভাবা হত এবং তাদের সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে খুন করত তবে লোকটির শাস্তি হওয়ার পরিবর্তে লোকটির স্ত্রীকে মেরে ফেলা হত।

২। গ্রীক সভ্যতা

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে আমাদের কাছে গ্রীক সভ্যতা সবচেয়ে বেশী গর্বের। কিন্তু এরকম গৌরবময় সভ্যতায়ও মহিলারা সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এবং তাদের হীন দৃষ্টিতে দেখা হত। গ্রীক মিথলজিতে প্যান্ডরা নামে কল্পিত এক মহিলাকে মানুষের সব দুর্ভাগ্যের প্রতিক হিসাবে দেখা হত। গ্রীকরা এটাই ভাবত যে মহিলাদের মানবিক সত্তা পুরুষের অর্ধেক এবং তারা পুরুষদের চেয়ে হীন পর্যায়ের, কিন্তু মহিলাদের সতীত্বের ব্যাপারে গ্রীকরা ছিল খুবই সজাগ। পরবর্তীকালে গ্রীকরা আত্মগরিমা ও জেনা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রীক সমাজে বেশ্যাবৃত্তি ও পতিতালয়ে গমন একটা বড় ধরণের অভিজাত ফ্যাশন বলে মনে করা

হত।

৩। রোমান মিশরীয় সভ্যতা

রোমান সভ্যতা যখন উন্নতির একেবারে চরম শিখরে উঠেছিল তখনও একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ইচ্ছামত খুন করে ফেলতে পারত। পতিতালয়ে গমন ও নগ্নতা ছিল রোমানদের বিশেষ ধরণের সংস্কৃতি।

৪। মিশরীয় সভ্যতায় মহিলাদের অশুভ প্রতিক বলে ভাবা হত।

৫। খৃস্টান সভ্যতা

খৃস্টান সমাজে এক জন মহিলাকে প্রলুব্ধকারী বস্তু হিসাবে ভাবা হত। এটা সবাই ভাবত যে স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য নারীই দায়ি। ফ্রান্সে নারীদের মর্যাদার বিষয় নিয়ে ৫৮৭ খৃস্টাব্দে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিষয় বস্তু ছিল নারী প্রকৃত পক্ষে মানব সত্তা কিনা তা বিচার কারা। বিতর্ক হয়েছিল মহিলারা মানুষ কিনা তা নিয়েও। ইংলান্ডের অষ্টম হেনরি মেয়েদের বাইবেল পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। সারা মধ্য যুগ ধরে ক্যাথলিক চার্চ মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভেবে এসেছে। ১৮৫০ সালের পূর্বে মহিলাদের নাগরিক গণনার মধ্যে স্থান দেওয়া হত না। আর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলতে কিছুই ছিল না।

৬। ভারতীয় সভ্যতা

ভারতবর্ষের সতীদাহ প্রথার কথা সকলের জ্ঞাত বিষয়। রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টায় এধরণের অতি কু প্রথা ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিদায় নিয়েছে। সতীদাহ প্রথায় কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সেই মহিলাকে স্বামীর চিতায় পুড়ে প্রাণ দিতে হত। কোন কোন সমাজের প্রথা অনুযায়ী স্বামী হারা স্ত্রীরা স্বইচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিত। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নানা রকম প্রলোভন ও মিথ্যা স্বর্গলাভের লোভ দেখিয়ে মহিলাদের চিতায়

তোলা হত। রাজা রামমোহনের আগেও বেশ কয়েক জন মুসলিম শাসকেরা এই প্রথা তুলে দিতে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু তা ফলপ্রসু হয় নি।

৭। ইসলাম পূর্ব আরব সভ্যতা

সপ্তম শতাব্দীতে মহিলাদের উপর যে ধরণের হীন মনোভাব পোষণ করা হত তার চেয়ে পৌত্তলিক আরবরা মুহাম্মদ (সাঃ) আসার আগে যে ধারণা পোষন করত তা অনেকটা ভাল ছিল বলা যেতে পারে। এই সময় সামাজিক পরিবেশ ছিল অতি পরিবর্তনশীল। তাছাড়া মূল্যবোধের কোন ধারণাই ছিলনা এ সমাজে। কথায় কথায় মার দাঙ্গা লুট পাট, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই যেত সর্বত্র, তার বিস্তার স্ফুলিঙ্গের মত ছাড়িয়ে পড়ত এক গোত্র থেকে আর এক গোত্রে। তাই এরকম পরিবেশে নারীদের মর্যাদা একেবারেই ছিলনা।

নবী (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজে কন্যাদের জন্মকে এক বড় ধরণের অভিশাপ বলে ভাবত মানুষ। তাই তারা এ অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য কন্যা সন্তান জন্মানোর পরক্ষনেই তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে দিতে কোন রকম দ্বিধা বা সংশয় বোধ করত না। প্রায় প্রতি দশজনের মধ্যে একজন এধরণের কাজ করত। শুধু পুরুষরা নয় কন্যা সন্তানের মা ও অন্যান্য মহিলারাও এ ধরণের নিষ্ঠুর কাজে হাত লাগাত গর্বের সাথে। কেবল মাত্র অসম্মানের ভয়ে নয় বরং দরিদ্রতার সমাধান হিসাবেও তারা এ ধরণের কাজকে বেছে নিত।

ইসলাম আসার পূর্বে আরব সমাজে বিবাহ ও পত্নি সংখ্যাও বড় অদ্ভুত ধরণের ছিল। একজন পুরুষ বার বার বিবাহ করত এবং এক নয় , দুই নয় দশ বিশটা বিবাহ করা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল। অনেক সময় সমাজিক মর্যাদা অনুযায়ী একজন পুরুষ একশটা পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করত। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাও ছিল খুব সাধারণ ব্যাপার। কুরআন এধরণের এলোপাথাড়ি বৈবাহিক ব্যবস্থার উপর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। তাছাড়া পুরুষ এমন একটি প্রথা মেনে চলত যাতে তারা স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সংযোগ থেকে দূরে থাকবে বলে শপথ করত, যার ফলে এ মহিলাটা অন্যাকোন পুরুষের সাথে বিবাহও করতে পারত না আর এই

স্বামীর কাছে এভাবে থাকাকেও উপযোগী মনে করত না। কুরআন এ ব্যাপারে এধরণের মহিলাদের ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। (দেখুন কুরআন ২ঃ২২-২২৭)

অনেক সময় দেখা যেত কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ঐ স্ত্রীকে তারই অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র বিবাহ করত। এধরণের জঘন্য প্রথা লোপ করার জন্য কুরআন ঘোষণা দিয়েছে,

> "আর তোমাদের পিতা যে সকল স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে কখনই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয়। মূলত এ এক অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ। এ কোন মতেই পচ্ছন্দনীয় নয় এবং এ খুবই খারাপ পথ।" (আল কুরআন – ৪:২২)

যদি এই সকল বিধবা মহিলা স্বামীর বড় সন্তানকে বিয়ে করতে না চাইত তাহলে তাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হত তার দেবরকে। একাধিক দেবররা ঐ বিধবাকে লক্ষ করে কাপড় ছুড়ে দিত যার কাপড় বিধবার মাথার উপর পড়ত সেই বিবাহ করত ঐ মহিলাকে। সে ঐ মহিলাকে নিজের সম্পত্তি বলে ভাবত। এই ভাবে একজন বিধবা মহিলা কোন মতেই সেই পরিবার থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না, এ ধরণের অসহায় পরিণতি তাকে মেনে নিতেই হত।

বিবাহ ছাড়াও মহিলারা সন্তান ধারণ করত। এটা কোন অন্যায় কাজ বলে মনে করা হতনা। তাছাড়া অল্প সল্প ঘটনার জন্যও নির্মমভাবে মার খেতে হত মহিলাদের।

বেশীরভাগ সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের যৌন উপাদান বলে ভাবা হত। নানান উৎসবে তাদের স্বল্পবাস পরতে বাধ্য করা হত। আর এই অবস্থাতে তারা লোকালয়ে ঘুরে বেড়াত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পূজা পার্বনে এ ধরণের ঘটনা ঘটত হামেশাই। আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে পুরুষেরা এই সকল মহিলাদের তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে।

ইসলাম পূর্ব যুগে মহিলারা কোন বংশগত পরিচয় পেতনা। অপরপক্ষে মহিলারা বেচাকেনা হত এবং ঋণ মেটানোর বস্তু হিসাবেও ব্যবহৃত হত। কুরআন এসব জঘন্য প্রথা লোপ করেছে এবং তার পরিবর্তে নূতন অনুশাসন প্রবর্ত্তন করেছে। যেখানে মহিলাদের যথার্থ অধিকার রয়েছে।

আধুনিক সমাজে নারীর স্থান

বর্তমানে অনেক ঘটনা শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে যেখানে নানান ভাবে নারী উৎপীড়নের কথা ফুটে ওঠে। আর এগুলো থেকে আমরা স্পষ্টভাবে এটাই অনুভব করছি যে আমরা ফিরে চলেছি সেই অজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি যুগে। যা ইসলাম আগমনের পূর্বে ছিল। পুত্র কন্যা ভ্রুন হত্যার মধ্যে দিয়ে আমার কি সেই অন্ধকার যুগের পূর্ণাবৃত্তি ঘটাচ্ছি না? UNICEF দ্বারা গঠিত World children Reports অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি কন্যা সন্তানের চেয়ে ছেলে সন্তান বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের জন সংখ্যায় ছেলে যেখানে ১০০০ জন সেখানে মেয়ের সংখ্যা ৯৫৪ জন। মেয়েদের এরকম পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হল কন্যা ভ্রুন হত্যা।

মোটামুটি হিসাবে প্রতি বছর সত্তর মিলিয়ন মেয়ে শিশু জন্মনোর আগেই শেষ হয়ে যায়। কন্যা শিশু হত্যার এই বিশাল অংক যে কোন সচেতন ব্যক্তির হৃদয় নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তথাপি আমরা বলে চলেছি আমরা সভ্য যুগের রাজপ্রাসাদে বাস করছি। কোন মুখে আমরা বলি যে আমরা মেয়েদের সম্মান করি ও মানবিক অধিকার প্রদান করি?

বর্তমান যুগে মেয়েরা একেবারে উপভোগের বস্তু হয়ে নীম্ন স্তরে নেমে গেছে। মহিলারা সমান অধিকারের দাবিতে নিজেরাই অজান্তে এ ধরণের আধুনিকতার চোরা বালিতে আটকে যাচ্ছে।

আধুনিক বিশ্ব মহিলাদের অধিকার প্রদান করে গর্ববোধ করতেই পারে কিন্তু, কদাচ এই অধিকার তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। তাদের এই অধিকার তাদেরই শোষনের নামান্তর বৈ অন্য কিছুই নয়। তাদের

অধিকারগুলো পুরুষদের কাছে তাদের প্রাপ্যতা বাড়িয়েছে। এটা সত্য যে তারা এখন একটা বিশ্বজনীন বাজার পাচ্ছে। এটাতো মানবিকতার উপর চরম অত্যাচার। এটা মানুষকে হত্যা করছে AIDS-এর মত মরন ব্যাধি উপহার দিয়ে। পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে যৌনতার এই উচ্ছৃঙ্খল প্রসারতার জন্য। আজ সামাজিক স্থিরতা বলতে কিছু নেই।

মহিলাদের উপর গরু ছাগলের মত আচরন করা হচ্ছে। বেশ্যালয়, যৌন কর্মী তৈরীকরন, অসভ্য নাচগান, মডেলিং, নগ্নতা প্রদর্শন, পনের জন্য মৃত্যু। বধু হত্যা– প্রভৃতি নানারকম ঘটনা আজ আমাদের সমাজের সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী এখানে বাজারের পন্য তুল্য। তাইতো তাঁকে স্বল্প পোষাকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়। আর প্রচার মাধ্যমের আশির্বাদে তা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ উপভোগ করে চলেছে। ব্যবসায়িক স্বার্থে বিজ্ঞাপনের হাত ধরে নারীর খোলা দেহ আজ বিক্রি হচ্ছে বড় বড় সফ্‌টড্রিংস কোম্পানী, পর্নগ্রাফী সম্পাদক, রেঁস্তরা মালিক, কসমেটিক ডিজাইনার প্রমুখদের দ্বারা।

যৌন পাগলামি

বর্তমানে যৌন ক্ষিপ্ততা চরমে পৌঁছেছে। যৌন পাগলদের হাত থেকে রেহাই পাননি নারী, বালিকা শিশু এমনকি ভারসাম্যহীনেরাও। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে যৌন পাগল দুস্কৃতিরা মহিলা নাবালিকা শিশুকে হরন করে নিয়ে গিয়ে তার উপর বলৎকার করেছে। শেষে তাদের খুন করে রেখে পালিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এরকম কুকীর্তির ভি.ডি.ও রেকর্ড করা হয়েছে যাতে অত্যাচারিতের উপর দোষারোপ চাপান যায়, তার মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায় কিংবা তার অসম্মান করা যায়। কিছু নৃশংস দুষ্কৃতি এগুলো নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দিতেও ভয় করেনি। তারা বলতে চায় আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি দেশের আইনকে। তারা জেনে গেছে তাদের শাস্তি বলতে কয়েক দিন জেলের ডালভাত খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ ধরণের লজ্জাজনক আচরণ আমাদের সমাজকে, আমাদের দেশকে, আমাদের ধর্মকে এবং আমাদের আইনী ব্যবস্থাকে একপ্রকার উপহাস করে চলেছে।

ইতিহাস স্বাক্ষী, যে সভ্যতায় নারী শোষণের শিকার হয়েছে সে সভ্যতা টিকে থাকতে পারেনি। আমাদের চলচিত্র, আমাদের ম্যাগাজিন, আমাদের খবরের কাগজগুলো দিন দিন যৌন সুড়সুড়ির উপাদান হয়ে উঠছে। খুব দুঃখের বিষয় জাতীয় ইংরেজি পত্রিকা গুলোও সাপলিমেন্ট হিসাবে পর্নগ্রাফীর পাতা জুড়ে দিচ্ছে। ইন্টারনেটেও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যৌন সুড়সুড়ির নানা উপাদান ও নগ্ন চিত্র।

যদি আমরা এই আধুনিক যৌন পাগলামির আক্রমণকে প্রতিহত করতে চাই তাহলে সর্ব প্রথম এগিয়ে আসতে হবে দেশের সরকারকে। তারপর সমাজ বিজ্ঞানী, প্রচার মাধ্যম এবং ধর্মীয় নেতাদেরতো প্রয়োজন আছেই। কেবলমাত্র আমাদের সংস্কৃতি বা পরিবারিক জীবন নয় বরং আমাদের সভ্যতাও আজ বিপন্ন। অসাস্থকর কুরুচিপূর্ণ কোন কিছুকেই স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে আমাদের সাহিত্যে, প্রচার মাধ্যমে ও বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় স্থান দেওয়া উচিত নয়। আমাদের শিক্ষা দীক্ষায় কোন প্রকার স্থান দেওয়া উচিত নয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ যৌনতা, বিবাহ পূর্ব যৌনতা ও বহির্বিবাহ যৌনতাকে। এ সমস্ত কিছুকে কঠোর হস্তে দমন করা দরকার। আর এর জন্য স্রষ্টার ভয়, নৈতিকতার উপর শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ আমাদের সংশোধিত করতে পারে।

এখন আমরা আলোচনা করব ইসলামে নারীর অধিকার প্রসঙ্গ নিয়ে। এটা অপরিহার্য একটা বিষয় যাতে পরিস্কার হবে আধুনিক নারীর অধিকারের সাথে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার কতটা ভিন্ন প্রকৃতির ও কতটা উন্নত সমাজ গঠনের উপযোগী।

নারীর প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

কুরআন অবতীর্নের প্রাক লগ্ন থেকে ইসলাম নারীর অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে এবং পুরুষের সাথে তার আধ্যাত্মিকতার সমতাকে নিশ্চিত করেছে। ইসলামে নারী পুরুষকে একে অপরের জীবন সঙ্গী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের শক্তি সামর্থ ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে তাদের অধিকারে সুসামঞ্জস্যশীল পার্থক্য ইসলাম করেছে। নবী

(সাঃ) এর শিক্ষা যখন আরবের নারী সমাজের কাছে পৌঁছাল তখন তারা সর্ব প্রথম বুঝতে পারল স্বাধীনতার স্বাদ। ইসলামের ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় নবী (সাঃ) এর আহ্বান শুনে তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ভাই উমার (রাঃ) এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যদিও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমার (রাঃ) ফাতিমা (রাঃ) এর বিরোধীতা করেছিল চরমভাবে। আল্লাহর বান্দা হয়েও তারা তার সৃষ্টির বন্দেগী থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিলেন। পেয়েছিলেন মুক্তির চরম স্বাদ।

ইসলামে নারীরা পূর্বতন আরোপিত অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। নবী (সাঃ) নারী অধিকারের মহা মিশনকে জীবনের শেষ ভাষণে পর্যন্ত স্মরন করেছিলেন। তার এই ভাষণে তিনি তাদের অধিকারকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন,

> "হে লোকেরা! এটা সত্য যে তাদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে। মনে রেখো তোমরা তাদেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ। আর এটা করেছ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এবং তার অনুমতিতে। তারা যদি তোমাদের অধিকারকে মেনে চলে তাহলে তোমরাও ভালবাসার সাথে তাদের ভরনপোষনের দায়িত্ব গ্রহণ কর। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ কর এবং তাদের প্রতি ভদ্র ও দয়ালু হও। তারা তোমাদের জীবন-সঙ্গী ও কাজের সহায়ক। আর তোমাদেরও অধিকার তারা যেন তোমাদের অনুমতি ছাড়া অন্য পুরুষদের সাথে বন্ধুত্ব এবং সতীত্ব নষ্ট না করে"

পরিবর্তন

জীবনের সর্বক্ষেত্রে যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ইসলামরে আগমনে তারা মুক্ত হল। ইসলাম আসার ফলে নারীদের অধিকার পুরুষের সাথে সমান বলে ঘোষিত হল। নারী হল পুরুষের জীবন সঙ্গী ও কাজের সহায়ক।

ইসলাম প্রতিটি নারীর জন্য নির্ধারণ করল বিশেষ বিশেষ পবিত্র অধিকার। আর সে অর্জন করল যথার্থ মর্যাদা। কেমন করে এধরণের যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্ভব হল?

ইসলামে যে নারী স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা কোন নারী বা পুরুষ সংগঠন প্রদত্ত নয়। বরং নারীরা অধিকার পেল তাদের স্রষ্টা আল্লাহর কাছ থেকে। শুধু নারীরা নয় সমগ্র মানবকূল ও সমস্ত সৃষ্টিকূলের যথার্থ অধিকারের বিধান কেবল মাত্র তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে যিনি তাদের পরম স্রষ্টা। যখনই নবী (সাঃ) মহান স্রষ্টা আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হতেন তখনই তার অনুসারীদের শোনাতেন। নারী পুরুষ সকল অনুসারীরা এ সকল প্রত্যাদেশ শোনা মাত্রই বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাতেন কোন রকম বাধা বিপত্তিকে তারা কোন প্রকার আমল দিতেন না। এইভাবে নারীদের জন্য যে সকল প্রত্যাদিষ্ট আধিকার প্রদত্ত হল তা অনুসারীরা সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিল। তারা একাজকে মোটেই হাল্কাভাবে নেননি। নবী (সাঃ) এর পুরুষ অনুসারীরা যারা সংখ্যায় মহিলাদের চেয়ে বেশী ছিল তারা পূর্ব প্রচলিত ধারণাকে পরিত্যাগ করে সাদরে গ্রহণ করে নিল ইসলামের এই মহান নির্দেশ মালা। তাই নারীদের অধিকার পাওয়ার জন্য আর রাস্তায় নেমে তাদেরকে আন্দোলন করতে হল না। কোনও বিদ্রোহ, কোনও র‍্যালি, কোনও কনফারেন্স কোনও সভাসমিতি– কোন কিছুই করতে হলনা আর আরবের এই সকল মানুষ যারা ইসলাম প্রাক যুগে নিজেদের কন্যাদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত কিংবা মেয়েদের নানা রকম বিশৃঙ্খলাকে প্রশয় দিত তারা শুরু করল প্রত্যাদেশ মানতে। স্বভাবতই তাদের হৃদয় গলে গেল মায়া মমতা ও দয়ায়। আল্লাহর ভয়ে তারা তাদের অতীত পাপের কথা স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করতে শুরু করল রাতের আঁধারে। তারা নবী (সাঃ) কে ঘিরে সব সময় তার মূল্যবান উপদেশ শুনতেন। যখন তারা নবী (সাঃ) এর কাছে শুনলেন "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম" তখন তারা নবী (সাঃ) এর এই মহান আদর্শকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, নবী (সাঃ) আরোও বললেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুটি

কন্যা দান করেছেন, সে যদি তাদের প্রতি সদয় হন তা হলে এর কারনে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সমাজকে পরিশুদ্ধ করার পর নবী (সাঃ) তাকে সব সময় নিষ্কলুষ রাখার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। এ সব কিছু তিনি স্রষ্টা প্রদত্ত নীতিমালা মেনেই প্রবর্ত্তন করলেন। কঠোর শাস্তি অরোপিত হল ধর্ষণ, ব্যভিচার, হত্যা, জীবন্ত কন্যা হত্যা, বেহায়া নাচগান, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, জুয়া প্রভৃতি অপকর্মমূলক কাজের উপর। সেই সঙ্গে সুদ, ঘুস, বিকৃত যৌন আচরণ– সব কিছুই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল ইসলামের সাথে। স্বাভাবিক ভাবে ফিরে এল সমাজে নারীর মর্যাদা।

ইসলামী আইনের অধীনে নারীর অধিকার

ইসলামে বিবাহ মানে দুজন মুসলিম নরনারীর মধ্যে সমাজ স্বীকৃত বৈধ এক চুক্তি যার দ্বারা উভয়ে পরস্পরের দ্বারা সব রকমের আবেগ উচ্ছাসকে বৈধভাবে উপভোগ করতে পারে। চুক্তির দ্বারা একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভ করে। ইসলামে এই বিবাহ নীতিতে স্বামীত্বের অধিকারের চেয়ে মহিলাদের মর্যাদা বেশী করে সুরক্ষিত হয়। মুসলিম বিবাহের কতকগুলো অন্যান্য বৈশিষ্টও রয়েছে।

১। যখন এক মুসলিম মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সে তার বিবাহপূর্ব কুমারী নাম বর্জন করেনা কিন্তু তার এক আলাদা মর্যাদাপূর্ণ পরিচিতি আসে।

২। মুসলিম মহিলারা বিয়ের পূর্বে তার স্বামী পছন্দ করার পূর্ণ অধিকার রাখে। বিয়ে ও স্বামী পছন্দ করার ব্যাপারে মেয়েদের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন।

৩। মুসলিম বিয়েতে স্বামীকে নগদ অর্থ কন্যাকেই দিতে হয়। এই অর্থ সে নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারে, ব্যবসায় লাগাতে পারে কিংবা দান করতে পারে। এক কথায় বৈধ যে কোন কাজে লাগাতে পারে।

৪। ইসলামে পুরুষ কোন প্রকার যৌতুক নারীদের কাছ থেকে নিতে পারেনা অথবা শ্বশুর বাড়ির কেউ কোন যৌতুক দাবিও করতে পারেনা।

৫। ইসলামে নারীরা তার যৌতুক হিসাবে যা কিছু পায় কিংবা পিতার উত্তরাধিকার থেকে যে সকল সম্পত্তি বা সম্পদ পেয়ে থাকে তাতে স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির কারোর কোন অধিকার থাকে না। স্বামীর বা পুত্রের কাছ থেকেও প্রাপ্ত সম্পদ তারই হয়ে থাকে।

৬। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর সাথে জীবন যাপন করতে পারবে না বলে মনে করে তাহলে সে নিজের ইচ্ছামত বিশেষ নিয়মে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। ইসলামের এই নীতিকে বলা হয় 'খুলা'

৭। বিধবা ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত নারীরা পূর্বের মত পছন্দ সই স্বামী নির্বাচন করে আবার বিবাহ করতে পারে।

৮। ইসলাম পুরুষদের এই নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে মহিলারা তাদের কাছ থেকে সমস্ত রকম ভরন-পোষন পেতে পারে। এমনকি স্ত্রীর অর্থ থাকলেও পুরুষকে পারিবারিক দায়িদায়িত্ব বহন করতে হবে। বিনিময়ে নারী স্বামীর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে।

৯। নারী যদি তার সতীত্ব ও জীবনের নিরাপত্তা পায় তাহলে মর্যাদার সাথে সে যে কোন বৈধ কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

অপর পক্ষে সাধারণভাবে জনসমাজে যে ধারণা চলে আসছে যে মহিলারা চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের কাজ কর্ম করবে তা ইসলামে একেবারে বিধিবদ্ধ নয়। সময় ও সুযোগ সাপক্ষে মহিলারা ঘরের বাইরে অর্থ নৈতিক কাজেকারবারে যোগ দিতে পারে পারিবারিক চাহিদাকে বজায় রেখে।

১০। মহিলারা যে অর্থ উপার্জন করে তা তারা তাদের স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির কারোর অনুমতি না নিয়ে দান খয়রাত নানারকম সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করতে পারে।

১১। স্বামীর কাছে প্রাপ্ত সমস্ত রকম যৌতুক স্বামীকে ফেরত দিতে স্ত্রী বাধ্য নয় যদিও তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

১২। ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কে জ্ঞান অর্জনের জন্য সমান অধিকার প্রদান করেছে। দুজনের জ্ঞানকে সমান মর্যাদায় ভূষিত করেছে। উভয়ের মেধাকে সমানভাবে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

ইসলাম নারীকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বা অধিকার প্রদান করেছে তা চির ভাস্কর। কোন ব্যক্তি বা কোন শাসকের খেয়ালিপনায় এ সকল অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা যায় না। এ সমস্ত অধিকার ইসলামী আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ। পৃথিবীর কোন আইন দ্বারা এগুলো যেমন রোধ করা উচিত নয়। তেমনি এর সংশোধন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংক্ষেপকরন কোন কিছু করা যায় না। এই ভাবে ইসলাম দেড় হাজার বছর আগে নারীর এ সকল মূল্যবান অধিকার গুলো পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অপরপক্ষে পাশ্চাত্য জগত এ সময়ে নারীর প্রাণ আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ পোষন করত। তাদেরকে অধিকার দেওয়ার ভাবনাতো ছিল দূর অস্ত।

ইসলাম নারীদের অসম্মান বা অবমাননা করার জন্য তাদেরকে মূল্যবান সম্পদ বলেনা। বরং ইসলাম তাদেরকে মৌলিক অধিকার প্রদানের জন্য তাদের প্রতি সমস্ত রকম অমানবিক আচরণকে তা মধ্য প্রাচ্যের দেশ গুলোর মধ্য থেকে হোক কিংবা ভারতীয় উপ-মহাদেশেরই হোক, কোন কিছুকে কোন মতেই অনুমোদন করেনা। বর্তমানে মুসলিমরা অন্যদের কাছ থেকে যে সকল সংস্কৃতি গ্রহণ করছে যেমন পণ প্রথা, চার দেওয়ালে বন্দী থাকা, শিক্ষা থেকে দুরে থাকা, বেকার জীবন যাপন করা প্রভৃতিকে ইসলাম অনুমোদন দেয়না। এই অচলাবস্থার সাথে পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যাবে পাশ্চাত্যে মহিলারাই বেশী ইসলাম গ্রহণ করছে।

ইসলাম যদি নারীর অধিকার প্রদান না করে থাকে এবং তাদের অসম্মানীত করে, তাহলে পাশ্চাত্যের নারীরা তথা কথিত অধিকার প্রাপ্ত হয়েও কেন ইসলাম গ্রহন করছে দলে দলে?

ইসলামে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলাম এক সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটা নারীদের যেমন কিছু সুসামঞ্জশীল অধিকার প্রদান করেছে তেমনিভাবে কিছু দায়িত্বও অর্পন করেছে। একজন মুসলিম নারীর কাছ থেকে নীচের বিষয়গুলি পরিপূর্ণভাবে আশা করা যায়।

১। আল্লাহর প্রতি পূর্ন বিশ্বাস রাখতে হবে। একজন মুসলিম মহিলা অবশ্যই নামায, রোজা, হজ, যাকাত পূর্ণভাবে পালন করবে।

২। সব সময় সে তার সতীত্বের পূর্ণ সংরক্ষন করবে, স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে সম্পর্ক গড়বে না। এর ব্যতিক্রম ধ্বংসাত্মক।

৩। মুসলিম নারী অবশ্যই রুচিশীল পোষাক পরিধান করবে। বাইরে কাজ কারবারের জন্য বের হলে হিজাব ব্যবহার করা তার জন্য একেবারে অপরিহার্য কর্তব্য।

৪। সন্তান সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্যদের দেখা শোনা করা তার দায়িত্ব। সন্তান পালনে একজন নারীর ভূমিকা ইতিবাচক। অবশ্য পারস্পরিক এ সকল কাজ কারবারকে পরামর্শের ভিত্তিতে ভাগ করে নেওয়া যায়। একটি পরিবারে নারী একজন রানী।

৫। একজন নারী একজন পুরুষের পোষাকের মত। নারীই হল পুরুষের শান্তি সুখের সমস্ত রকম উৎস।

৬। ইসলাম বিরোধী কোন কাজে নারীকে যতই ডাকা হোকনা কেন সে তা মানবেনা। তা পিতা মাতা স্বামী সকলের বিরুদ্ধে হলেও। কুরআনের ঘোষনা,

"হে ঈমানদার লোকেরা নিজেদের পিতা ও ভাইকেও

> নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরকে বেশী ভালবাসে, তোমাদের যে লোকই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেই জালেম হবে" (আল কুরআন– ৯:২৩)

৭। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক বলে ভাবে। কেউ কারোর উপর প্রভুত্ব ফলাতে পারেনা। প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা। তাদের উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে এক সুন্দর, শান্তিপূর্ণ, পরিবার যা কিনা সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের মৌল উপাদান। কুরআনের ঘোষনা,

> "....তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।" (কুরআন– ৩০:২১)

হিজাব বা বুরকা

মুসলমান মহিলাদের গায়ে সমালোচনার একটা লেবেল আঁটা হয় সেটা হল তাদের হিজাব বা বুরকা পরিধানেরর বিষয় নিয়ে। তাদের এই ড্রেস কোড নিয়ে যত্র তত্র বিস্তর সমালোচনা হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন মহিলাদের স্বাধীনতা মানেই হল তাদের শরীর থেকে পোষাক খসিয়ে ফেলা। যে মহিলা যতটা বেশী শরীর থেকে পোষাক খসিয়ে ফেলবে, যতটা বেশী শরীর খোলা দেখাতে পারবে তারা ততটাই বেশী স্বাধীন। প্রাচীন কালে নিপীড়িত মহিলাদের বস্ত্রহীন বা উত্তেজক স্বল্প পোষাক পরিহিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হত। যদিও এটা দ্বারা তাদেরকে কোন অধিকার দেওয়া হতনা বরং মহিলাদের এরূপ অর্ধনগ্নতা কিংবা সম্পূর্ণ নগ্নতাকে চার দিকের ঘিরে ধরা পুরুষেরা কামুক দৃষ্টিতে উপভোগ করত। আজকের দিনেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলা যেতে পারে।

মুসলিম মহিলাদের হিজাব, বুরকা অথবা ঘোমটা বা স্কার্ফ নিয়ে অনেক বিতর্কই হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে মুসলিম মহিলাদের এ ধরনের বুরকা বা হিজাব পরিধান করাকে দাসত্ব, বঞ্চনা বা পিছিয়ে থাকার উপাদান বলে মনে করা হয়। যারা হিজাবকে ভালবাসে তাদের আবেগে এটা প্রতিহত এবং যারা সমালোচনা করে তাদের দ্বারা এটা আক্রান্ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম মহিলারা হিজাব পরিধান করে আসছে বাঁধা ধরা নিয়মে। কিন্তু বর্তমানে হিজাব পরিধানকে নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক এসে পড়েছে। কিন্তু আমাদের জানা দরকার কোরআন হিজাব সম্বন্ধে কি বলে?

কুরআনে ঘোমটা বলতে 'হিজাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের সাত স্থানে এই 'হিজাব' শব্দটি এসেছে। এগুলো হল উনিশ নং সূরার সতেরো নং আয়াতে, আটত্রিশ নং সূরার বত্রিশ নং আয়াতে, সতেরো নং সূরার পঁয়তাল্লিশ নং আয়াতে। বিয়াল্লিশ নং সূরার একান্ন নং আয়াতে। সাত নং সূরার ছেচল্লিশ নং আয়াতে। তেত্রিশ নং সূরার তিপান্ন নং আয়াতে এবং তিরাশি নং সূরার পনেরো নং আয়াতে। সাহিত্যিক ভাষায় 'হিজাব' মানে পর্দা, বিভেদক বা যবনিকা। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলিমরা হিজাব বলতে বোঝে একখন্ড কাপড় যা মাথা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢেকে দেয়।

সতীত্বের নিরাপত্তা, সম্মান ও সভ্য সমাজের প্রয়োজনে মুসলিম মহিলাদের উপর হিজাব পরিধান করার আদেশ জারি করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ গুলোতে যেখানে যেখানে ইসলাম পৌঁছেছিল সেখানে এই হিজাবের আকৃতি ভিন্ন প্রকৃতির। আমাদের ভারত উপ মহাদেশে মুসলিম মহিলারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে ঢাকা পোষাক পরে তা বুরকা নামে পরিচিত। মিড্‌ল ইস্টের দেশগুলোতে একে বলা হয় 'আবায়া' কিছু কিছু মহিলারা মুখমন্ডলও ঢাকা দিয়ে থাকেন একে বলা হয় 'নিকাব' ইরানের মেয়েরা কালো চাদরকে 'হিজাব' হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে মাথার রুমাল বাঁধাকে 'হিজাব' বলে মনে করা হয়।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম মহিলারা হিজাব পরিধান করে থাকে

ঢিলেঢালা শালীন পোষাক বা হিজাবের উপকারিতা আজ খুঁজে বেড়াতে হবেনা। বর্তমানে যারা শরীরের গঠন বা পার্শ্বরেখা দেখান স্কিন টাইট পোষাক পরিধান করে তারা তুলনা মূলকভাবে শ্রদ্ধা পান। কিন্তু যারা ফিল্ম, নাচগান, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে অভিনয় করে তারা কামুক দৃষ্টির খোরাক হয় বেশী পরিমাণে। কোটি কোটি টাকার শিল্প উৎপাদিত প্রসাধন দ্রব্য, সাবান স্যাম্পু, ভ্যানিটি ব্যাগ, এমনকি স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রিতেও রয়েছে নারীদের অর্ধ নগ্ন শরীর। অনেক ক্ষেত্রে নারীপুরুষের অশ্লীলতা পর্যন্ত দেখান হয়। পশ্চিমিরা নারীদের অল্প পোষাককে বেশী পছন্দ করে থাকে।

মুসলিম মহিলারা ওড়না স্কার্ফ ব্যবহার করে এতে তাদের সমস্ত বিকাশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরকম এক ধারণায় বস্তুবাদী সমাজ বুক চাপড়ে মরছে। মুসলিম মহিলাদের দেখাদেখি অন্য মহিলারও যদি তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা বন্ধ করে দেয় তাহলে মহিলাদের সৌন্দর্য-সামগ্রী প্রস্তুত কারক শিল্পগুলো মার খাবে নিঃসন্দেহে। তাই তারাও সুকৌশলে কোটি কোটি ডলার ঢালছে যাতে করে মুসলিম মহিলা পোষাককে ব্যাকডেটেড, প্রগতির অন্তরায় প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে অন্যদের মনকে এরকম শালীন সু সভ্য পোষাক থেকে দূরে রাখা যায়। নিঃসন্দেহ হিজাব পাশ্চাত্য মিডিয়া গুলোর গাত্র দাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তারাতো নগ্ন নারীদেহের ছবিই পাবেনা।

বস্তুবাদী সমাজ যে নারী স্বাধীনতার জন্য গলা ফাটাচ্ছে তা মুখোশের আড়ালে তার দেহ শোষণের নামান্তর। এ স্বাধীনতা দ্বারা বরং তাদের আত্ম মর্যাদাই লজ্জিত হয়ে চলেছে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদের উন্নতি চায়। কিন্তু বাস্তবে এ উন্নতি নানান ভাবে যেমন, ফ্যাশন শো, সুন্দরী প্রতিযেগীতা, নগ্ন আর্ট, ফ্যাশন প্যারেড, উপপত্নী গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলাদের জন্য অমর্যাদারই কারণ হয়েছে।

একই সঙ্গে যখন মহিলারা তাদের পছন্দের ব্যাপারে অনেক স্বাধীনতা পেয়েছে বলা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদেরই উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা কি পরবে আর না পরবে সে বিষয়টিও। তা নাহলে কোনও মহিলা কোথাও বুরকা পরলে এত হইচই পড়ে যায় কেন? কলেজ ইউনিভার্সিটির মত জায়গায় মহিলাদের স্বইচ্ছায় পরিধিত পোষাক বুরকাকে নিয়ে কি না ঘটছে দেশে বিদেশে। মুসলমানদের পর্দা যদি প্রগতির অন্তরায় হয় তাহলে ঐ সব মহিলারা কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছাল কি করে? কেন তাহলে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার বুলি আওড়ানো চ্যাম্পিয়নরা প্রগতির অন্তরায় ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছে।

হিজাব মুসলিম মহিলাদের ব্যক্তিগত পছন্দসই পোষাক এবং এটাকে অন্যদের সমীহ করা দরকার। অন্যান্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা পেশার লোকেরাতো হিজাবের মতই পোষাক পরিধান করে। কৈ তার বেলাতো কোন মিডিয়া প্রচার করে না এটাতো সেকেলে, প্রগতি বিরোধী ইত্যাদি। উদাহরণ অনেক দেওয়াই যেতে পারে উকিল-জাজদের কালো গা ঢাকা পোষাক, সন্ন্যাসিদের বুরকার অনুরূপ পোষাক। পাস্টুরদের গোড়ালি লম্বিত সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা পোষাক, খৃস্টান নানদের পোষাক ইত্যাদি নানান ধরণের বুরকার মত পোষাক আমাদের কারো কাছে অজানা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা বুদ্ধিজীবি বলে বিবেচিত তারা সোরগোল তোলে কেবল মুসলিম মহিলাদের পোষাক হিজাব কে নিয়ে। কেন এমন ধরণের দ্বিচারিতা? কেবল নিজের দলের লোকের আচার আচরণকে মেনে নিলে সহিষ্ণু হওয়া যায় না বরং অন্য দলের মানুষদের সেই একই আচর আচরণ মেনে নিতে পারলে তাকেই সহিষ্ণু বলা যেতে পারে।

অনেক বিশ্ববিখ্যাত মহিলা, যারা বিশ্ব বন্দিত, তারা অবাক হয়ে যাচ্ছেন তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে বিশ্ব জোড়া বজ্জাতি দেখে। বস্তুবাদী ভ্রমে মহিলাদের পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দেওয়াকে তারা খুব করুণার চোখে দেখছে। তাদের পবিত্র আত্মা জেগে উঠেছে, বস্তুবাদী নোংরা স্বাধীনতা তারা চাচ্ছেনা। তাই তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের মনে স্বান্তনা খুজছে। এদের তালিকা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সব জায়গার

মহিলাদের নিয়ে। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা লরেন বুথ, মারিয়ম জামিলা, মোরগারেট মারকুইস্য, ব্রিটিস জার্নালিস্ট ইউভন রিডলি এবং মালায়ালমবাসী ইংরেজি কবি কমলা সুরাইয়া– সবাই ইসলাম গ্রহণ করে হিজাব পরিধান করছে।

এমনকি আমাদের দেশে CNN-IBN তাদের সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে বহু মহিলাই একান্ত স্ব-ইচ্ছায় সতীত্বের খাতিরে এবং ইভ.টিজিং ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বুরকা পরিধান করছে।

পরিশেষে আমি বলছি মুসলিম মহিলারা শরীর ঢাকা পোষাকে কোন প্রকার নেতিবাচক মত প্রকাশ করেনি, বস্তুত পক্ষে নবী (সাঃ) আজ থেকে আল্লাহর তরফ থেকে মুসলিম মহিলাদের জন্য যে পোষাক নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা অতি যুগপোযোগী। এর মধ্যে যেমন স্বাচ্ছন্দ বোধ মুসলিম মহিলারা পেয়ে থাকেন তেমনি ধর্মীয় অনুশাসনও মানা হয়। সর্বোপরি তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ ধরণের পোষাক পরিধান করে থাকে। অপর পক্ষে অন্য মহিলারা সমাজের লোলুপদের সন্তুষ্ট করতে অর্ধনগ্ন পোষাক পরে।

হিজাব হল সভ্যতার চরম নিদর্শন

বহু খ্যাতনামা মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ২০১১ সালে নোবেল বিজয়িনী তায়াক্কোল কারমানের মত কেউই এতটা সম্মান অর্জন করতে পারেননি। তিনি সমস্ত প্রিন্ট মিডিয়া ও বৈদ্যুতিন মিডিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ছিলেন যখন তিনি নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করার জন্য অসলোর রাজধানী নরওয়েজিয়ান সিটি হলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সিটি হলে যখন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি 'হিজাব' 'আবওয়া' পরিহিতা ছিলেন। স্বভাবতই প্রচার মাধ্যমের লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

> "Doesn't she feel her mode of dressing as something which contradicts her education and intellectual level as the hijab is viewed as oppression of women and backwardness?"

"আপনার বর্তমান পোশাক আপনার উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে কি বেমানান নয়? কেননা মহিলাদের জন্য এ পোষাকটা প্রগতি বিরোধী ও নিপীড়ন বলে মনে করা হয়।" তাওয়াক্কোল কারমান উত্তর দিয়েছিলেন নীচের ভাষায়,

> "The human being in early times was almost naked. With the development of his thouhgt over time he began to wear clothes. What am today and what I wear is the height of intellect and sophistication reached by man through the ages, not backwardness. Nakedness is a sign of backwardness and human thinking going back to early times."

"প্রথমিক যুগে মানুষ প্রায় উলঙ্গ থাকত। সভ্যতার যত উন্নতি হতে লাগল মানুষ ততই পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত হল। যুগ যুগ ধরে অর্জিত মানুষের মেধা ও যোগ্যতা সভ্যতার যে চুড়ান্ত শিখরে পৌছেছে আমি সেই পোশাক পড়ে আছি। এটা কোন পিছিয়ে পড়া নয়। উলঙ্গপনায় পিছিয়ে পড়ার আভাস আছে কিন্তু বর্তমানে মানুষের চিন্তা ভাবনা আদীমতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে"।

ইসলামী আইনে কন্যা পুত্রের অর্ধ্যেক সম্পত্তি পায় কেন?

ইসলামী নিয়মে পিতার সম্পদ বা সম্পত্তিতে কন্যা ও পুত্র উভয়েরই প্রাপ্য রয়েছে, কিন্তু একজন পুত্র যা পায় কন্যা তার অর্ধেক পায়। স্বাভাবিকভাবে এটা নারীর প্রতি বৈষম্য বলে মনে হয়, এর সঠিক ব্যাখ্যা নির্ণয় করার জন্য বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে পুত্ররাই কেবল পিতার সম্পদের অংশীদার হত। কন্যারা ছিল এ থেকে একেবারে বঞ্চিত। কিন্তু কুরআন কন্যাদেরও অধিকার প্রদান করলেন পিতার সম্পত্তিতে। পুত্রেরা যে পরিমাণ অংশ পাবে কন্যারা তার অর্ধেক পাবে বলে ইসলামের আইনে বলা হয়েছে। কন্যা সন্তান পিতার সম্পত্তিতে অংশ পাবে এ অধিকার

ছিল এক বৈপ্লবিক সংস্কার। কারণ তৎকালীন সময়ে কেবলমাত্র পুত্ররাই পিতার সম্পত্তিতে অংশ পেত, কন্যারা ছিল একেবারে বঞ্চিত। কন্যাদের এই সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার দুদিক থেকে উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ মহিলারা এর দ্বারা আলাদাভাবে মুক্ত ও স্বাধীন মানবিক পরিচয় পেয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ আর্থিকভাবে মহিলারা সক্ষম হয়েছিল।

কুরআন মহিলাদের সম্পত্তি বা সম্পদ পাওয়ার যে সকল উৎস বর্ণনা করেছে তা হল পিতা, স্বামী, পুত্র এবং নিসন্তান ভ্রাতার কাছ থেকে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে–

> "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষদের অংশ দুজন মেয়ের সমান, যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দুয়ের বেশী মেয়ে হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পতির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার পিতামাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং পিতামাতা তার উত্তরাধিকার হয়, তাহলে মাকে তিনভাগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই বোনও থাকে, তাহলে মা ছয়ভাগের একভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। তোমরা জাননা তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী, এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্য সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন" (সুরা নিসা– ১১)

সূরা নিসার পরের আয়াতে বলা হয়েছে,

> "তোমাদের স্ত্রীরা যদি নিঃসন্তান হয়, তাহলে তারা কিছু ছেড়ে যায় তার অর্ধেক তোমরা পাবে। অন্যথায় তাদের সন্তান থাকলে যে অসিয়ত তারা করে গেছে তা আদায় করার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ পাবে। অন্যথায় তোমাদের সন্তান থাকলে তোমাদের অসিয়ত পূর্ণ করার ও তোমাদের রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করার পর তারা সম্পত্তির আটভাগের একভাগের একভাগ পাবে।" (সূরা নিসা – ১২)

সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

> "লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, আল্লাহ তোমাদের ফতওয়া দিচ্ছেন, কোন ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে তবে সে তার সম্পত্তি হতে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুইভাগ পাওয়ার অধিকারিণী হবে। আর যদি কয়েকজন ভাইবোন হয় তবে মেয়েদের অংশ একভাগ ও পুরুষের অংশ দুভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন কানুন সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে না থাক। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত" (সূরা নিসা– ১৭৬)

কুরআনের এ সকল আয়াত দ্বারা আল্লাহ পিতামাতা সন্তান সন্ততি এবং স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকারকে সুস্পষ্টরূপে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে মানুষের কোন রায় দ্বারা উত্তরাধিকারীদের অংশ নিয়ে আর বিবাদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকেনা।

বর্তমানে যে বিতর্ক উঠেছে তা হল মুসলিম মহিলারা তার পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার ভাই যা পাবে তার অর্ধেক সে পাবে এই বিষয়টাকে নিয়ে। কিন্তু উপরে আলোচনায় এটা আমাদের কাছে পরিস্কার হয়েছে যে একজন মহিলা তার উত্তরাধিকার অংশ হিসাবে একাধিক উৎস থেকে পেতে পারে। সে যেমন পিতার কাছ থেকে পায়, তেমনি পায় স্বামীর কাছ থেকেও। সন্তান ও সন্তানহীন ভাইয়ের মৃত্যুর পরও একজন মহিলা তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার অংশ পেতে পারে। সবকটি অংশ যদি একত্রিত করা হয় তা হলে একজন মহিলার প্রাপ্য অংশ পুরুষের প্রাপ্য অংশ থেকে বেশীই হবে। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সপ্তম শতাব্দীতে ইসলাম নবী (সাঃ) কে যে প্রেরণা দিয়ে বঞ্চিত নারীদের উত্তরাধিকার পাইয়ে দিয়েছিল তা কি ভাবনার বিষয় নয়? সে যুগে মহিলাদের হাতে সম্পদ তুলে দেওয়া, তাদেরকে সম্পদের মালিক বানান, চাট্টিখানি কথা নয়। আবার তারা সে সম্পদ দান খয়রাত, ব্যবসা প্রভৃতির কাজে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারত। কেউ তাদের বাধা দেওয়ার ছিল না।

এখন আমাদের উচিত ইসলাম নারীদের জন্য যে বণ্টন ব্যবস্থা দান করেছে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ন্যায় সঙ্গত কিনা, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। আমারতো মনে হয় ইসলাম নারীদের জন্য যে বণ্টন ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সব যুগে সব সমাজের জন্য খুবই উপযুক্ত। এটা খুবই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। আর এটা থেকে নারীরা তাদের আর্থিক অধিকার পেলেও আর্থিক দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। ইসলাম আর্থিক দায়দায়িত্ব বহন করার জন্য ভার অর্পন করেছে কেবলমাত্র পুরুষদের উপর। একজন পুরুষকে তার স্ত্রী, সন্তান সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্যদের দেখা শোনা করতে হয়। পুরুষ হল পরিবারের কর্তা তাই তার স্ত্রী সন্তানাদি লালন পালন করতে হয় তেমনি তাদের লেখাপড়া এমন কি সন্তান সন্ততিদের বিয়ে শাদীর ব্যবস্থাও একজন পুরুষকে করতে হয় তাই উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে বোনের দ্বিগুন অংশ পাওয়া খুবই সংগত। তাই মহিলারা পরিবারের অন্যান্য একাধিক চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এরকম ক্ষেত্রে মহিলারা যদি পিতার উত্তরাধিকারের ভাইয়ের অর্ধেক পেয়ে থাকে তবে

সেটা না-হক কথা নয় বরং সেটাই সামঞ্জস্যশীল।

তাই বলা যেতে পারে ইসলামের এই বণ্টন ব্যবস্থা দেখে লিঙ্গ বৈষম্যের দোহাই দিয়ে নাক সিটকানো যায় না। উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটাই পরিস্কার হয় যে, ইসলামের বণ্টন ব্যবস্থা এক ভারসাম্য নীতি মেনেই করা হয়েছে। পুরুষদের দায় দায়িত্ব যখন একাধিক তখন তাকে সামাল দিতে হলে আর্থিক সক্ষমতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের বেশী থাকা দরকার। আবার মহিলারা শুধু ব্যয়ের দায় থেকে মুক্ত নয় তারা তাদের সম্পদের বিনিয়োগ ঘটাতে পারে বৈধভাবে। তাছাড়া মহিলারা বিয়ের সময় তাদের স্বামীর কাছ থেকে নগদ অর্থ মোহর পেয়ে থাকেন সেটাও তাদের সম্পদ হয়।

মুসলিম মহিলাদের ভোট দান প্রসঙ্গ

অনেকের কাছে এরকম একটা কথা শোনা যায় যে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মহিলাদের ভোটাধিকার থাকলেও মুসলিম মহিলাদের ঠিকমত ভোটাধিকার প্রদান করা হচ্ছেনা। তাই এর দ্বারা তারা ধরে নিয়েছে যে ইসলাম মহিলাদের ভোটাধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। এ ব্যাপারে একটু বিষদভাবে জানা দরকার।

যে সমস্ত মুসলিম দেশে গণতন্ত্র রয়েছে সেখানে মুসলিম মহিলাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভোট দানের, এমন কি তারা প্রতিদ্বন্দিতায় লড়তেও পারে। এই রকম দেশ গুলোতে মুসলিম মহিলারা ভোট দেওয়ার সাথে সাথে দেশ চালনাও করতে পারে। যেমন তুর্কি এখানে ১৯৯৩ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তানসু সিলার, বাংলাদেশে ১৯৯১ থেকে দুই বেগম নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া সেখানে চার বছর ধরে প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুকর্নপুত্রি, পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো দু দুবার প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। কেবলমাত্র ছটি উপসাগরীয় দেশ যেখানে প্রকৃতপক্ষে এখনও পর্যন্ত রাজতন্ত্র বর্তমান সেখানে নারী পুরুষ কারোরই ভোটাধিকার নেই। অবশ্য কুয়েতে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বর্তমান। এখানে মহিলারা যেমন ভোট দিতে পারে তেমনি

নির্বাচনে লড়তেও পারে। অবশ্য পার্লামেন্টের অধিকার সীমাবদ্ধ এবং এর সিদ্ধান্ত প্রয়োজনে কুয়েত আমীরের দ্বারা ভেঙ্গে যেতে পারে। সৌদি আরবে সবেমাত্র পুরুষেরা ভোট প্রয়োগ করতে পারে, ২০১৫ সালের পরে মহিলারাও ভোট দিতে পারবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেভাবে মুসলিমদের ভোট দানের অধিকার ও ভোটে লড়ার আন্দোলন জেগে উঠছে তাতে মনে হয় এই সকল দেশগুলো শীঘ্রই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। অবশ্য গণতন্ত্রকে জনগণের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার সমূহ দিতে হবে। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য দেশে মহিলাদের ভোট দানের স্বীকৃতিও বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই শুরু হয়েছিল।

এটা সত্য যে স্বৈরতন্ত্র কেবল মাত্র মুসলিমদের নয়। চিন বিশ্বের একটি বড় শক্তিধর দেশ হয়েও কমিউনিস্ট পার্টির স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং এখানে কারো কোন ভোটাধিকার নেই।

ইসলাম সম্বন্ধে যতটা জানা গেছে তাতে বোঝা যায় ইসলাম রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রণয়ন করেনা, খলিফাদের সময় নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর খলিফারা নির্বাচিত হয়েছিলেন নারী পুরুষদের পরামর্শের (শুরা) ভিত্তিতে। একবার খলিফা নির্বাচিত হলে নারী পুরুষ উভয়েই খলিফার হাতে বয়াত গ্রহণ করত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত সাহাবা আবদ-আল-রাহামান ইবনি আওফ। তিনি মদিনার প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যক্তিগত মত সংগ্রহ করেছিলেন কার উপর ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে। একাজে তাকে মদিনার মহিলা ও যুবকদেরও মতামত নিতে হয়। সবশেষে তিনি ঘোষনা দিয়েছিলেন,

"আমি মদিনার সমস্ত পুরুষ, মহিলা ও যুবক যুবতীদের মতামত নিয়েছি এবং আলির (রাঃ) পূর্বে উসমান (রাঃ) এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে তারা বেশী আগ্রহী।" (আওয়াসিম মিনাল কাসেমি ইবনাল আরাবি)

এ ঘটনার দ্বারা এটাই পরিস্কার হয় যে, যে সকল মহিলা সাধারনতঃ

ঘরের কাজকারেবারে ব্যস্ত থাকে এবং বাইরের ব্যাপারে তেমন খোঁজ খবর রাখেনা তারাও পরামর্শের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তাই কি দেখে আমরা বলতে পারি ইসলামে মহিলাদের ভোটাধিকার নেই? আমরাতো দেখতে পাচ্ছি খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে বর্তমান যুগের ভোট ব্যবস্থার মত তখনকার ভোট ব্যবস্থা একই রকম ছিল তা বলা যায়না। কারণ সে সময়টা ছিল ইতিহাসের অনেক পেছনের ঘটনা। তখন তো কেউ ছাপ মেরে বা বোতাম টিপে মতামত পেশ করতে পারত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ইসলাম আগমনের প্রথম দু শতাব্দীর পর থেকে মুসলিম মহিলাদের মর্যাদা ও ভূমিকা দিন দিন করে লুপ্ত হওয়ার পথে। এখন তারা সত্যিই দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক ভূমিকা পালন করছে। এমনকি মসজিদে নামাযের দ্বারও তাদের জন্য এক প্রকার বন্ধ।

মহিলাদের উচ্চশিক্ষা ও ড্রাইভিং

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মুসলিম মহিলাদের ইস্কুলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কোন কোন সমাজে প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার পেলেও মহিলা সমাজে উচ্চশিক্ষার অনুমতি পাচ্ছেনা বলা যেতে পারে। আবার অনেক দেশে মহিলাদের ড্রাইভিং -এর ব্যাপারে মহিলাদের প্রতি অনীহাই প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরণের আচরণ শরিয়ত কি সমর্থন করে?

বরং শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম, নারী পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করে, নবী (সাঃ) কে বলতে শোনা গেছে "প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ।" মিশর ও বেশীরভাগ উপসাগরীয় দেশ গুলিতে বহু মহিলারা পড়াশোনা করছে। এবং তাদের মধ্যে উচ্চ ডিগ্রিধারীও কম নয়। এদিক থেকে গত শতাব্দীর কয়েক দশকে মহিলারা অনেক উন্নতি লাভ করেছে এবং মহিলাদের অনেক সুযোগ সুবিধাও করে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র কট্টর গোঁড়া তালিবানরাই মহিলাদের স্কুল যাওয়াকে আপত্তিকর মনে করছে। তারা এটা কোন ইসলামী দৃষ্টি কোন থেকে বলছে বলে মনে হয় না।

মহিলাদের ড্রাইভিং-এর ব্যাপারেও একটা প্রশ্ন ওঠে। মহিলাদের ড্রাইভিং -এর উপর কেবলমাত্র নিষেধ আরোপ করে থাকে সৌদি আরব। মনে রাখতে হবে দেশটি চরম রাজতন্ত্রের প্রতিক। এখানকার শাসকরা এটাই মনে করে যে মহিলাদের ড্রাইভিং অনুমতি দিলে মহিলারা পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাবে। তাতে নারী পুরুষের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরিয়তে ড্রাইভিং এর ব্যাপারে নিয়ম নীতি অনেকটাই নমনীয়। নবী (সাঃ) এর যুগে মহিলারা প্রায়শঃ ঘোড়া ও উটের পিঠে চড়তেন এবং এখানে ওখানে প্রয়োজনের ভিত্তিতে গমনাগমন করতেন। এই ধরনের চলা ফেরার উপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতনা। শুধুমাত্র নারী পুরুষের মধ্যে মেশামেশি হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় মহিলাদের উপর ড্রাইভিং -এর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। এ ধরণের আচরণে ইসলামী শরিয়তকেই নিচু করে দেখা হয়। তাই এই ধরণের নেতিবাচক কাজের জন্য ইসলামকে দায়ী করা সঠিক নয়।

বহুবিবাহ বনাম এক বিবাহ ব্যবস্থা

সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা যায় বহু বিবাহ মানে পুরুষদের সঙ্গী হিসাবে একাধিক মহিলাকে স্থান দেওয়া, আরোও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যদি একজন পুরুষ এক সাথে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তবে তাকে বলা যায় বহু বিবাহ। আর এরই ঠিক বিপরীত কথা হল এক বিবাহ প্রথা। অর্থাৎ একজন পুরুষ যখন এক সঙ্গে কেবল একটি মাত্র নারীকে জীবন সঙ্গী হিসাবে রাখতে পারে।

পাশ্চাত্য সমালোচনায় কিছু ইসলাম বিদ্বেষি বুদ্ধিজীবি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু বিবাহ নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তবে এটা আমাদের জেনে রাখা উচিত যে তাদের কেউই নবী (সাঃ) এর বহু বিবাহের কারণ ধরণ ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনামূলক পড়াশোনা করেছে বলে মনে হয় না। কোন কিছু সমালোচনা করার আগে বিষয়টির কারণ, উদ্দেশ্য কি ছিল তা একান্তভাবে জানা দরকার। এই সকল সমালোচকগণ অনেক

ঐতিহাসিক সত্যকে পাঠকদের কাছে তুলে না ধরে কেবল সমালোচনা করে গেছেন।

সীমাহীন অজ্ঞতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত ইসলামকে আক্রমণ করার জন্য তারা এ ধরণের সমালোচনা করে থাকেন। আর এই সকল সমালোচকেরা এতটাই এগিয়েছে যে নবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবন নিয়েও কটূক্তি করতে ছাড়েনি, যার ফলে ইসলাম যে মানব সভ্যতায় অসাধারণ অবদান রেখেছিল তা অজানা থেকেই গেছে অগুনিত মানুষের কাছে। আর মুহাম্মদ (সাঃ) কে সমালোচনার শিকার করে তারা ইসলামের মহান আদর্শকে আড়াল করে রেখেছে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে।

প্রথমেই আমাদের বোঝা দরকার যে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা নৈতিকতার উপর কালিমা লেপনের জন্য মুহাম্মদ (সাঃ) এর বহু বিবাহের বিষয়কে হাতিয়ার বানিয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগে পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই বহু বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যা ছিল তখনকার একটি স্ট্যাটাস, রাজা প্রজা থেকে সাধারণ মানুষ সবাই বহু বিবাহে অভ্যস্থ ছিল। এমন কি এক একজন পুরুষ একশ'র অধিক মহিলাকে একই সঙ্গে বিবাহ করতে পারত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নবীদেরও একাধিক স্ত্রী ছিল। কেবল যিশু খৃস্ট ছিলেন ব্যতিক্রম। গবাদি পশুর চেয়েও তাদের মান ছিল নীচু। নিজের জন্মদাতা পিতামাতারাই জীবন্ত কন্যাকে মাটিতে পুঁতে দিত কেবলমাত্র সামাজিক স্ট্যাটাস বজায় রাখতে। অপরদিকে বিবাহ বিচ্ছেদটা ছিল একেবারে সাধারন ব্যাপার। বিবাহ বিচেছদকে কেউ তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখত না। বর্তমানে বহুমুখি যৌন যাতনার চেয়ে সে যুগের নারীদের অবস্থা আরোও শোচনীয় ছিল।

কিন্তু আজও প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যে সর্বত্রই বহু বিবাহের প্রশংসা করছে অনেকেই। তা কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং অমুসলিমদের মধ্যেও এর অবস্থান চোখে পড়ার মত। মুসলমানদের মধ্যে এটা স্বীকৃত কাজ হলেও অন্য ধর্মের লোকেদের মধ্যে লুকিয়ে ছাপিয়ে বৈধ অবৈধতার

প্রশ্ন দূরে সরিয়ে বহু বিবাহের অভ্যাস বেশ অগ্রসর হয়ে আছে। আর এটা এতটা সাধারণ ব্যাপার যে এটা অনুসন্ধান করার জন্য গবেষনা পত্রের দরকার হয় না। স্ত্রী ছাড়া একাধিক নারী ভোগ করা হচ্ছে নানান নামের আড়ালে। কোথাও সুইটলাভ, বিলাভ লাভড্ আবার কোথাও অবাধ মহিলা নিয়ে ভ্রমণের নামে যাই হোক না কেন, এটি হচ্ছে সবার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে। নীতি বাগিশ গণ মানুন আর না মানুন অবৈধ বহুগামিতা সর্বত্র চলছে।

ইহুদি ধর্মে বহুবিবাহ

বাইবেলের বর্ণনায় এটা জানা যায় যে ঐ সময় পুরুষেরা বহু বিবাহে অভ্যস্থ ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শতাধিক নারীর কাছে একজন পুরুষের গমনাগমন ছিল বলে জানা যায়। বাইবেলীয় শাসনে পুরুষকে একাধিক বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এমনকি বাইবেলের বর্ণনায় যে সকল নবীদের পরিচয় মেলে তাদের বেশীর ভাগ ছিলেন বহু পত্নীক। Wikipedia থেকে জানা যায়, আব্রাহাম (আঃ) এর দুজন পত্নী ছিলেন, একজনের নাম হল সারাহ অন্য জনের নাম ছিল হাজরা। সলেমানের ছিল সাতশ স্ত্রী এবং তিনশ' উপপত্নী। জ্যাকবের ছিল চার জন স্ত্রী। ডেভিডের ছিল আটজন স্ত্রী। আর মোজেসের ছিল চারজন স্ত্রী। এরা হলেন সেফায়ার, গিবসিয়া, বিন্টাকিনি ও বিন্টহুবার। বাইবেলীয় এন সাইক্লোপিডিয়া থেকে জানা যায় যে সাধারণ ইহুদিরা চার জনের মত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। এবং রাজা আশিজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করত।

বহু বিবাহের এই ধারা একেবারে চলে এসেছিল রাব্বি জারসন বিন ইয়াহুদার সময় কাল পর্যন্ত। আর ইহুদিদের সেফার্ডিক সম্প্রদায় একেবারে ১৯৫০ সালে Act of the chief Rabbinate of Israel নামে আইনের দ্বারা একাধিক বিবাহ প্রথা বন্ধ করা হয়।

অবশ্য একথা সত্য নয় যে ইহুদি ও খৃস্টানরা এক বিবাহে সন্তুষ্ট আছে সব সময়। বরং তাদের মধ্যে বহু বিবাহের ঝোঁকটাই প্রবল। A short history of Marriage নামক গ্রন্থখানিতে ইহুদি পন্ডিত S.D. Goitien

ছাড়াও আরোও অনেকের বহু আলোচনা রয়েছে বহুবিবাহের সমর্থনে। খৃস্টান মর্নমন সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরাতো ঐতিহ্যগতভাবে বহু বিবাহ করে থাকে। আর যখনই এটাকে রোখার চেষ্টা করা হয় তখন দেখা গেছে লুকিয়ে প্রেম, সমকামিতা বা আরোও অন্যান্য যৌন বিকৃত সুলভ কাজকারবারের ঘনঘটা। ঐতিহাসিক নথি বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে গ্রীক, রোমান, ইহুদি ও খৃস্টানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হোমোসেক্স, প্রস্টটিউশন গমন, রাত্রিবাস ইত্যাদির মত জঘন্য মারাত্মক ব্যাধি মারাত্মকভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে।

খৃস্টানদের মধ্যে বহু বিবাহ

বাইবেলীয় যুগে বহুবিবাহের এতটা প্রসার ছিল যে স্বয়ং যিশু খৃস্ট এর সমাধান কোন দিক থেকে করবেন তারা কূল কি রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে বহু বিবাহ প্রথা সমর্থিত ছিল। সমাজের কেউ এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা বরং সবাই এই প্রথার উৎসাহ প্রদান করত। সে কারণেই হয় তা বাইবেল এই বিষয়ে কোন আলোচনা করেনি। বাইবেলে এর সংখ্যা বা নিষিদ্ধকরণ সম্বন্ধে কোন কিছুর আলোচনা নেই।

বাইবেলের পাতায় কিছু লোককে দশ কুমারীর আলোচনা করতে দেখা যায়। মূলত এটি এক সাথে দশ মহিলার গ্রহণের স্বীকৃতি জানায়। বাইবেলের গল্প গুলোতে যে বিশ্প, প্রিস্ট ও পাদ্রি আচদের দেখতে পাওয়া যায় তারা সকলেই বহু বিবাহে অব্যস্ত ছিলেন।

বাইবেলের বর্ণিত বহু রাজার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা একাধিক নারী গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম এবং ফিলিপও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেটা একেবারে ধর্মীয় চার্চে সেন্ট লুথারের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালেও জনসংখ্যা কম হওয়া রোধ করার জন্য বহু বিবাহ অনুমোদিত হয়েছে।

সম্প্রতি সপ্তদশ শতাব্দীর খৃস্টান চার্চগুলোর অনুমোদিত বহুবিবাহকেও বর্তমান খৃস্টান সমাজ মেনে নিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে মর্নমস খৃস্টান সম্প্রদায় একেবারে বংশগত ভাবে বহু বিবাহের পক্ষপাতি।

এ সকল ঘটনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে বহু বিবাহ সব সমাজে সব সময় ছিল। এমন কি এটা বৈধ প্রথা হিসাবে ছিল ও বর্তমানেও রয়েছে। বাইবেলে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। বাইবেলে যে সকল নবীদের কথা বলা হয়েছে তাদের বেশীরভাগ নবীই ছিলেন বহু পত্নীক। এমনকি যিশু খৃস্টও এটাকে নিষিদ্ধ করেননি।

পাশ্চাত্যবাসীরা এখন যে এক বিবাহের সাফাই গায় তা পলের আমলেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল খৃস্টানদের মধ্যে। আর এর ভূমিকায় ছিল চার্চগুলো। যেখানে একটি স্ত্রী গ্রহণের উপর চাপ ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু মজার কথা একটি স্ত্রী অনুমোদিত থাকলেও বহু দাসী কিংবা উপপত্নী গ্রহণের ব্যপারে কোন দোষারোপ করা হয়নি। এক কথায় বলা যেতে পারে সীমাহীন নারী ভোগের অনুমোদন।

আধুনিক কালে খৃস্টানদের মধ্যে অদ্ভূত এক জীবন দর্শন এসেছে, তা হল নারী মূলতঃ পাপ, অতএব তাকে এড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এটা বাস্তব পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই কোন রকমে একটা বিয়ে করে যত পারা যায় পাপ থেকে মুক্ত থাকাই ভাল।

হিন্দুমতে বহুবিবাহ

পৃথিবীর পরিচিত সব সভ্যতার কাছে বহু বিবাহ ছিল প্রচলিত। অতীতকাল থেকে এটা চলে আসছে। আমাদের ভারত বর্ষে হিন্দুদের মধ্যে এ প্রথা খুবই পরিচিত এক দৃশ্য। এটা কেবল সাধারণ প্রথা নয়, বরং সাধারণভাবে প্রায় সকল মানুষই এর পক্ষে এবং তাদের জীবনে বহু বিবাহ সমর্থিত। Wikipedia থেকে জানা যায় যে হিন্দুদের বহু মনিষীও একাধিক বিবাহ করেছিলেন, ঋগ্বেদ ও অন্যান্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো থেকে এর অনেক প্রমাণ মেলে, শ্রীরামচন্দ্র রামায়নের মূল চরিত্র। তাঁর পিতার নাম ছিল দশরথ। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল তিনজন, তাঁরা হলেন কৈশল্যা কৈকেয়া ও সুমিত্রা। কৃষ্ণের ছিল ১৬০০ স্ত্রী বা গোপিনী। যাদের মধ্যে, রাধা রুক্মিনী, সতভামা, জাম্বাবতী, সত্য কালিন্দা, ভাদ্র প্রমুখ উল্ল্যেখযোগ্য।

যদিও হিন্দু ধর্মগন্থের মধ্যে বেদই মূল, কিন্তু তবুও রামায়ন মহাভারত ও গীতাকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। যাইহোক এগুলোতে পত্নীসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। বরং এটা স্বীকৃত হয় যে একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করলেও করতে পারে। এই সেদিন ১৯৫০ খৃস্টাব্দে হিন্দু বিবাহ আইনে একের অধিক বিবাহের অধিকার নেই বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় হিন্দু আইন অনুযায়ী বর্তমানে হিন্দুদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ নয়। কিন্তু এটা বিধিবদ্ধ হলেও ধর্মীয় গ্রন্থে একাধিক বিবাহে কোন বাধা নেই।

পাশ্চাত্য সমাজে বহু বিবাহ

বর্তমানে পাশ্চাত্য বিবাহ ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা ভাবাই যায় না। সাধারণ ভাবে একজন পুরুষ অল্পদিনের মধ্যে স্ত্রী নির্বাসন দেয় নিজের কাছ থেকে। তারপর যাকে ইচ্ছা পছন্দ করে নিজের যৌন সঙ্গী হিসাবে। এতে কারোর কোন অনুমোদন নেওয়া হয় না। সাধারণতঃ তিন ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বহু নারী গমনের সমর্থনে। প্রথমতঃ কোন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করে অল্প দিনের মধ্যে তাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আবার অন্যজনকে একই ভাবে বিয়ে করে তাকেও ডিভোর্স দিয়ে বিদায় করে, এইভাবে এই কাজ চলতে থাকে অনেকবার। দ্বিতীয়তঃ একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বৈধভাবে বিয়ে করলেও তার জীবনে জড়িয়ে থাকে একাধিক উপপত্নী বা মিসট্রেস, আর তৃতীয় প্রকার হল একজন পুরুষ কোন সময় কাউকে বিয়ে না করে ও যৌনসঙ্গী হিসাবে একাধিক মহিলার সাথে জীবন কাটায়। এরা ক্ষিতা নামে পরিচিত। যা আইন স্বীকৃত নয়। পাশ্চাত্য বাসীরা বহু বিবাহ নিয়ে খুবই সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু কোন মিডিয়া এরূপ বহু নারী গামীতার ব্যাপারে কোন সময় মুখ খোলেনা। বিখ্যাত ব্রিটিশ সমাজ সংস্কারক বিশেষত নারী কল্যাণকামী Anee Bassant এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেছেন,

> "There is pretentious monogamy in the West, but there is really a polygamy without responsibility; the mistress is cast off when the man is weary of her,

and sinks gradually to be a woman of the street, for the first lover has no responsibility for her future and she is hundred times worse off than the sheltered wife and mother in a polygamous home. When we see thousands of miserable women who crowd the streets of western towns at night, we must surely feel that it does mot suit the westerners' mouth to reproach Islam for polygamy. It is better for women, and more respectable for women, to live in polygamy, united to one man only, with the legitimate child in her arms, and surrounded with respect, that to be reduced, cast out in the streets - perhaps with an illegitimate child outside the pale of law- unsheltered and uncared for, to become the victim of any passerby, night after night and renered incapable of motherhood and despised by all."

"এক বিবাহের মুখোশ পরে যারা সাফাই গায় তারা মূলত বহু নারী গমনে অভ্যস্ত হয় কোন দায়িত্ব ছাড়াই। তারপর এই সব উপপত্নী বা মিসট্রেসকে সময় মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায়। তখন তাদের রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। তার প্রতি কোন ভালবাসাই থাকেনা যে তাকে প্রথমে ভালবেসেছিল। তার ভবিষ্যতের কোন কথা না ভেবেই সে তাকে ছেড়ে চলে যায় ঘৃনাভরে। এতে ঐ মহিলাটির দূরাবস্থা বহু পত্নীক স্বামীর ঘরে থেকে মাতৃত্ব লাভ করার চেয়ে শতগুণ খারাপ হয়। আমরা যখন অসংখ্য অসহায় নারীকে পাশ্চাত্যের শহরের রাস্তা গুলোতে এভাবে ঘুরতে দেখি তখন বহু বিবাহের সমালোচনায় আমাদের উৎফুল্ল হওয়া সাজেনা, যে বহু বিবাহের সমর্থন ইসলামের সাথে জুড়ে রয়েছে। ইসলামের এই প্রথা নিশ্চয় ভাল, শুধু ভাল নয় সম্মানীয়ও বটে

..... এই রকম পথে পথে লাঞ্ছিত হওয়া মহিলা হওয়ার চেয়ে বহু পত্নীক স্বামীর কাছে বৈধভাবে থাকা অনেক ভাল। পথের পথিকদের দ্বারা শ্লীলতা হানি হওয়ার চেয়ে নিজের কোলে বৈধ সন্তান নিয়ে মর্যাদার সাথে বাস

করা তুলনামূলকভাবে অবশ্যই ভাল"।

বর্তমানে পাশ্চত্য দেশগুলোতে কিশোর কিশোরীরা পরস্পর সম্মতিতে যে অবৈধ অবাধ যৌন সম্বন্ধ গড়ে তুলছে তাতে পিতাহীন সন্তানদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এদের বড় করে তোলার দায় দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে ভূগতে হচ্ছে পুরো পাশ্চাত্য সমাজকে। এমনকি অবৈধ টিন এজারগুলি এখন দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু কিছু পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবি এক বিবাহের আইনরক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু নারীর প্রকৃত অধিকার কি তা তাদের জানা নেই। এদের সমাজে বহু কিছু আছে যা সরাসরি নারী নির্যাতন ও নারী শোষণের হাতিয়ার। বর্তমান যুগে নারীবাদী যে সকল আন্দোলনগুলো চলছে তা মূলতঃ শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রাক লগ্ন থেকে।

আসল কথা হল পাশ্চাত্যে এক বিবাহ প্রথা লোকেদের বাঁচিয়ে রেখেছে কোন রকম দায়িত্ব ছাড়াই। অথচ তারা বিবাহ না করলেও একাধিক নারীকে ভোগ করে চলেছে বিয়ে ছাড়া অন্য কৌশলে। এটি বড় সুবিধাবাদী যৌন দর্শন। সহজ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের রমরমায় আজকে সমাজে খোলা যৌন জীবনের প্রসার এত ব্যাপক যে সে বিষয়ে ভাবা যায় না, কিন্তু নারীকে ভোগ করতে হচ্ছে এর পরিণাম –ট্রমার মত আরোও অনেক রোগের যন্ত্রণাকে। তাছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নারীর ভাবিষ্যত জীবনকে পঙ্গু করে ছাড়ছে। যৌন জীবনের এ নোংরামী আচরণের জন্য AIDS নামক মারন ব্যাধি নারী পুরুষ উভয়কেই আজ ঘৃণা, অবহেলা এমনকি মৃত্যুও উপহার দিয়ে চলেছে।

ইসলামে বিবাহ দর্শন

ইসলাম ধর্মের বিবাহ দর্শন নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা। তাদের কাছে ইসলামের বিবাহ দর্শনে শুধু নেতিবাচক সিদ্ধান্তই উঠে এসেছে। তারা এটা মনে করেন যে, মুসলিম পুরুষেরা খুবই যৌন প্রবণ; তাই তারা তাদের উত্তেজনাকে ধরে রাখতে পারেনা। যেজন্য তাদের প্রয়োজন হয় একাধিক বিবাহ। এমন কি তারা এটাও অভিযোগ করে থাকে যে মুসলিম পুরুষেরা একের অধিকতো বটেই অগুনিত নারীকে

বিয়ে করতে পারে। তারা এটা মনে করে যে মুসলিমরা একাধিক নারীকে যেমন গ্রহণ করতে পারে তেমনি বর্জনও করতে পারে ইচ্ছামত। আর এধরণের চরিত্রগুলো দেখছে সারা দুনিয়ার মানুষ। বর্তমানে খবরের কাগজ, টিভি সিরিয়াল, চলচিত্র প্রভৃতি প্রচার মাধ্যম একাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ইসলামের উপর এ অপবাদ বড়ই দুঃখের। ইসলাম কি শিক্ষা দিয়েছিল তা অনেক মুসলিম শাসকই জানতেন না। তারা ব্যর্থ হয়েছিল কুরআন ও রসূলের শিক্ষাকে পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরতে। যেমনভাবে তারা নিজেরা বোঝেনি, তেমনি অপরকে বোঝাতেও পারেনি। তাই তারা নিজেদের জীবনেই ইসলামের শিক্ষাকে মেনে চলতে পারেনি, যার ফলে ইসলামের বিবাহ দর্শন সম্বন্ধে ভিন্ন জাতির উপর এক বড় ধরনের খারাপ ধারণা পড়েছে। অমুসলিম সমাজের পন্ডিতবর্গ তাই ইসলামের মহান আদর্শের পাঠ থেকে বঞ্চিত থেকেছে যুগ যুগ ধরে। ইসলাম সমস্ত মানব সমাজের জন্য যে মহৎ জীবন দর্শন এনেছিল তা কেবল নামকাওয়াস্তে মুসলমানদের হাতে থেকে গেছে, কিন্তু তা আর প্রস্ফুটিত হয়ে সমগ্র মানব সমাজের জন্য সৌরভ বিতরণ করতে পারেনি। এর ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাও ইসলাম সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞ থেকে গেছে। তাদের সব গবেষণায় ইসলামের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রভাব তাই আড়ালে থেকে গেছে।

আজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগের প্রেক্ষাপটে নবী (সাঃ) তাঁর ইসলামী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। আরব কেন, সারা পৃথিবীর মানুষ তখন বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিল। এমন কি একাধিক বিবাহ নয় এক শতাধিক বিবাহও তখন ছিল অনুমোদিত। কুরআন এই সমাজের এই লাগাম ছাড়া সংখ্যাকেও অনুমোদন করল না। কুরআন তৎকালীন সামাজিক এই দিকটাকে উপেক্ষা করে থাকলনা বরং যাতে করে একটা ভারসাম্যতা আসে তার সুব্যবস্থা করল। যেহেতু সমাজে এটা প্রচলিত ছিল তাই নবী (সাঃ) এটাকে আইনী বল দ্বারা উচ্ছেদ করলেন না। বরং তিনি উৎসাহ দিলেন এর বিপরীত দিকে। অর্থাৎ একটি কিংবা প্রয়োজনে চারটি বিবাহের দিকে। মনে রাখতে হবে এটা একাধিক বিবাহের জন্য উৎসাহ কিংবা আদেশ নয়। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা একটি বিবাহের দিকে বেশী করে জোর দেয়।

> "তোমরা যদি অনাথদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিয়ে করে

> নাও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবেনা তাবে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো।" (কুরআন– ৪:৩)

আগেই বলা হয়েছে যে প্রাক ইসলামী যুগে বিবাহের উর্দ্ধ সংখ্যা বেঁধে দেওয়া ছিল না। এক একজন একাধিক তো বটেই শতাধিক বিবাহ করার উদাহরণ সর্বত্র দেখা যেত। কিন্তু কুরআন পুরুষদের বিবাহ সংখ্যাকে একটি সীমায় আবদ্ধ করেছে মাত্র। এতে কোন আদেশ উপদেশ বা উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। বহু বিবাহে কোন কল্যাণ রয়েছে তাও বলা হয়নি। একান্তভাবে যদি কোন মুসলিম পুরুষ একাধিক বিবাহ করে থাকে তবে তা হতে হবে কয়েকটি আবশ্যিক শর্তের ভিত্তিতে। প্রথমতঃ প্রতিটি স্ত্রী যেন সমান আচরণ পেয়ে থাকেন স্বামীর কাছ থেকে। কিংবা সমান ব্যবহার পাওয়ায় তাদের কোন রকম ত্রুটি যেন না হয়। এমনকি ভালবাসা প্রদানের ক্ষেত্রেও স্বামীকে থাকতে হবে নিরপেক্ষ। কুরআন এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে যে এটি বড় শক্ত কাজ। কুরআনের ঘোষণা,

> "স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপূরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সম্ভব হবে না। অতএব একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর জনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বেনা। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে আল্লাহতো মার্জনাকারী ও দয়ালু"। (কুরআন– ৪:১২)

সকল স্ত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার ও নিরেপেক্ষ আচরণ করার অঙ্গীকার করার পরেও বহু বিবাহের জন্য কতকগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নীচে এগুলো আলোচনা করা হল।

১। যখন কোন স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে থাকেন আর স্বামী যদি সন্তান কামনা করে থাকেন তা হলে স্বামী অন্য স্ত্রী শর্তানুযায়ী গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রথম স্ত্রী ইচ্ছা করলে ঐ স্বামীর সাথে আলাদা থাকতে পারে।

২। সাধারণত যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ফলে সমাজে যখন নারীর প্রাধান্য ঘটে তখন সমাজে স্বাভাবিক ভারসাম্য আনার জন্য বহুবিবাহের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ এই সময়ে বিধবা ও অনাথ বালিকাদের দেখভালের প্রতি

সাধারণভাবে সকলের মধ্যে অনীহা দেখা যায়। তাই এই সময় ঐ সকল বিধবা ও অনাথ বালিকাদের বিবাহ করা বৈধ। আর সেটা একান্তভাবে নৈতিকতার দাবিতে হয়ে থাকে। উহুদ যুদ্ধের পরে এমনই পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়েছিল আর এই রকম পরিস্থিতিতে অবতীর্ন হয়েছিল কুরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর এধরণের অবস্থা বহু বিবাহের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। এই সময় হাজার হাজার বিধবাদের ঘরের সামনে "Wanted husband" লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছিল। আর এতে করে কেবল বহু বিবাহের দ্বারাই একটা সামঞ্জস্য এসেছিল। এভাবে নিসঙ্গ জীবন কাটানোর চেয়ে একাধিক বিবাহের অনুমোদনের ফলে ওরকম স্বামীর ঘরে দিন কাটানো অনেকটাই ভাল বলা যেতে পারে।

৪। ইসলামে বিবাহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নারীর সাথে সঙ্গ দেওয়া একেবারে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই নির্দেশ একেবারে চরম। এধরণের নারী উপভোগ করার সমস্ত পথই ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলামে মানুষের একটা নৈতিক মর্যাদা দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব অপরিসীম। দায়িত্ব এড়িয়ে কোন রকম মজা লোটার স্থান ইসলামে নেই। পিতৃত্বের দায় এড়িয়ে আনন্দ উপভোগ, সত্যিই কি মানবিকতার কথা বলে?

৫। একজন মহিলা যে কোন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে পারে না। পুরুষের ইচ্ছা থাকলেও তার এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে না যদি না ঐ মহিলারও ঐ পুরুষকে বিবাহ করার ইচ্ছা না থাকে। ঐ মহিলা কারণ হিসাবে ঐ পুরুষের প্রথম স্ত্রীর কথা উল্লেখ করতে পারেন। এটা তার স্বেচ্ছাধিকার। স্বাভাবিকভাবে এখানে বহু বিবাহের লাগাম কশা হয়ে যায়। অপর পক্ষে পূর্ব স্ত্রী খুশির সাথে স্বামীকে নূতন বিবাহে অনুমোদন দিলে বহু বিবাহের অনুমোদন রয়েছে। নবী (সাঃ) এর বহু হাদীস দ্বারা জানা যায় যে ইসলামে একটি মাত্র বিবাহের দিকে বেশী প্রবণতা। তিনি বলেছেন যে যদি কোন পুরুষের দুটি স্ত্রী থাকে। আর সে যদি একজনের দিকে ঝুঁকে থেকে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিনে তার শরীরের অধিকাংশ অংশ ঝুলে থাকবে। তাই আমরা এটা বলতে পারি ইসলামে এক বিবাহের অনুমোদন স্বাভাবিক আর বহু বিবাহ কেবল ব্যাতিক্রমে অনুমোদিত। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আবু হানিফা (রঃ) বলেন রসূল (সাঃ) বলেছেন,

> "একজন ব্যক্তি যার একটি স্ত্রী আছে সে সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবন ভোগ করে, অপরপক্ষে যার দুটো স্ত্রী আছে সে কলহ ও দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়"।

তবে একথা সত্য যে মুসলিমদের মধ্যে একটি মাত্র বিবাহই সাধারণ।

একাধিক বিবাহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে দেখা যায়। কিন্তু যারা সমালোচনা করতে ভালবাসেন তারা মুসলিমদের বহু বিবাহের আধিক্য নিয়ে মিথ্যা প্রচার করে থাকেন। সাধারণ পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে মুসলিমদের একটি বিবাহের কথা, বহু বিবাহের কথা ইসলাম বলেনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যারা মিথ্যা সমালোচনা করে থাকে তারা প্রচার করে বহু বিবাহ মুসলমানদের একটি ধর্মীয় কাজ। অনেককেই বলতে শোনা যায় মুসলমানদের চারটি বা একাধিক বিবাহ করা একটি ধর্মীয় কাজ, এবং তা জীবনের আবশ্যিক বিষয়।

দীর্ঘ আলোচনায় এটা বোঝা গেল যে বহু বিবাহে ইসলামের সায় নেই, কিন্তু প্রয়োজনে এর অনুমোদন আছে। যদি ইসলাম বহু বিবাহের এই অনুমোদনকে আইন করে একেবারে উচ্ছেদ করে দিত তাহলে সেটা সমাজে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করত, যেটাকে রোধ করার আর কোন পথই থাকত না। ইসলাম এটাকে যথা সাধ্য থিওরী হিসাবে রেখেছে আর প্রাকটিক্যাল প্রয়োগ হিসাবে যতটা কমানো যায় সে দিকে বিধিবদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।

ইসলাম এক বাস্তব ধর্ম, তাই সমস্ত কিছুর বাস্তবতা নিয়ে ইসলাম খুব সুক্ষভাবে ভেবে থাকে। বাস্তব জগতের সমস্যা এড়িয়ে ইসলামের কোন বিধিবিধান আরোপিত হয় নি। তাই আমরা একথা জোর গলায় বলতে পারি ইসলাম যে বহু বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে তা কোন অন্যায় বা ভুল আইন নয়। তবে তার প্রয়োগে যদি ত্রুটি হয় তবে সে দোষ আমাদের। তার জন্য ইসলাম, কোরআন বা মুহাম্মদ (সাঃ) দায়ী থাকবেন কেন? ইসলামের এই সুযোগ নিয়ে কেউ এর অপব্যবহার করে থাকলে ইসলামী আইনে অবশ্যই তার বিচার হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরাতো ইসলামী সমাজ বা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে বাধা পাচ্ছি প্রতি পদে পদে।

সলামে বিধবাদের পুনর্বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যবস্থা

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে নানা কারণের জন্য ইসলাম বেশ কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে তেমনিভাবে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদকেও ইসলাম সমর্থন করে। বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজ জীবনে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সচরাচর

একজনের পক্ষে এটা অনুভব করা সম্ভব হয় না। অথচ সমাজ জীবনে এটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহ। সর্বত্র এর বাস্তবতা রয়েছে। এর কিছু কারণ আমাদের আলোচনা করা দরকার। Encyclopedea Britanica-র তথ্য

"In general, the risk of death of any given age is less for females than for males."

"সাধারণভাবে পুরুষও মহিলারা যে আয়ু পেয়ে থাকেন তার মধ্যে মহিলাদের মৃত্যু হার পুরুষদের তুলনায় কম।"

নানান সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে দিন দিন করে বিধবাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বড় বড় কারণগুলি হল যুদ্ধ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বন্দী হওয়া।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন আশি লক্ষ মানুষ। বলা বাহুল্য এরা ছিল পুরুষ, এখন এদের মৃত্যুর ফলে নারী পুরুষের ভারসাম্য কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা বিবেচনা করা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুর পরিসংখ্যানও কম নয়। ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এদের বেশীরভাগ ছিল পুরুষ।

১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ইরাক ইরান যুদ্ধ হওয়ার ফলে দুটি দেশে বিধবা হয়েছিল এক লাখ বিরাশি হাজার মহিলা।

এমন কোন দেশ নেই যেখানে পথ-দুর্ঘটনা নেই, আমাদের দেশে ২০০৯ সালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা তিন লাখ ষাট হাজার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে পুরুষ ছিল ৭৭% এবং মহিলা ২৩%।

অপরপক্ষে বন্দীকরণে আসামী হিসাবে বেশীরভাগ পুরুষরাই জেল বন্দী থাকেন। আমেরিকার Bureau of Justice Statistic রিপোর্ট করেছে ষোল লাখ লোক বন্দী জীবন কাটায়। এখানেও ৯২% পুরুষ বন্দী। (Bureau of Justice Statistics US Department of Justice Prisoners in 2009)

সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু কয়েদী শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে। সুস্থ সমাজের জন্য একান্তভাবে এটা দরকার। কিন্তু তাদের স্ত্রীরাতো এর জন্য দায়ী থাকেনা। তাই তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বহু বিবাহের প্রয়োজনকে অবশ্য অনুমোদন দিতে হয়। এরকম অদ্ভূত

পরিস্থিতিতে ইসলাম পুরুষকে বহু বিবাহের অনুমোদন দিয়ে ভুল করেনি। এরকম পরিস্থিতিতে মহিলারা পুনঃ বিবাহের প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে অনুভব করে থাকে। আর এইভাবে বহু বিবাহ নারী জাতির প্রতি অনেক সময় করুণা এনে দেয়।

এখন যদি কোন সমাজ এরকম বৈধ আবশ্যিক বহু বিবাহের পথকে রুদ্ধ করে দেয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে সমাজে এক সংকট দেখা দেবে। সমাজ বিজ্ঞানীরা এর কি জবাব দেবেন? এই রকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে নারীরা কোথায় কিভাবে কার কাছে এর সমাধান খুঁজে পাবে? সঙ্গ বিহীন জীবন প্রবাহতো জীব মাত্রেই চলে না। এই সমস্যাতো কেবল দৈহিক চাহিদায় ক্ষান্ত নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীতির প্রশ্ন, সামাজিক প্রশ্ন এবং আরোও হাজারো প্রশ্ন। এটা একটা চাকুরী জীবি মহিলা বিদেশে থাকা কিংবা বাড়িতে থাকা, যে কোন মহিলা হোকনা কেন, সমস্যা তার থেকেই যাবে। এটা স্বাভাবিক তাকে কারোর না কারোর যত্নে থাকতে হবে অর্থৎ যেকোন একজন ব্যক্তিকে তার দায় দায়িত্ব নিতে হবে। আর যদি তার শরীরিক প্রয়োজনের কথা ভাবি তাহলে তো কথাই নেই। তাকে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতেই হবে। এর মধ্যে মনোস্তাত্ত্বিক দিক লুকিয়ে আছে। আর এই সুবিধা যদি সমাজে না পাওয়া যায় তা হলে খুব শীঘ্রই মহিলাটিকে নার্ভাস হতে দেখা যাবে। সে সমাজের কাছে এক অস্বস্থিকর পরিস্থিতির শিকার হবে। যার ফলে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একশ' ভাগ।

মানুষের এই সব মানসিক আশা আকাঙ্খাকে দমন করে কোনদিন মানব সভ্যতা এগিয়ে যেতে পারে না। সমাজের কেউ না কেউ অসহায় মানুষের যত্ন নেয়, আবার কেউ যত্ন পায়। এটা ছাড়া সমাজ অগ্রগতির পথ দেখতে পায় না, সমাজকে এ সব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এরকম পরিস্থিতির শিকারে সকল মহিলা যে নিজেকে সংযত করে রাখতে পারবে তেমন কোন গ্যারান্টি নেই। পুনর্বিবাহ ছাড়া এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অন্যকোন উপায়ে সম্ভব নয়। কারণ অল্প দিনের মধ্যে এরকম পরিস্তিতির শিকারে পিষ্ট মহিলার মনে কিছু চাহিদা উঁকি মারবেই। এটা তার বৈধ অধিকার। একে সে দমন রাখতে পারবেনা। আর তার এই অধিকার পুরনে সমাজের উৎসাহ যদি সে না পেয়ে থাকে তাহলে তাকে অবৈধ বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। খুব কম সংখ্যক মহিলারা পারবে এমন নিসঙ্গ জীবন কাটাতে। এটা জোরের সাথে বলা যেতে পারে, যে কোন মহিলা এই পরিস্থিতির শিকার হলে অল্প দিনের মধ্যেই নীতি নৈতিকতার বাঁধন হারিয়ে ফেলবে। এবং সমাজ এ ধুয়ো তুলে তার

অন্যান্য সামাজিক মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে খড়্গহস্ত হবে।

অতীত ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে যে যখনই একজনের স্বামী মারা গেছে তখন স্ত্রী হয়ে গেছে ভাই ও সৎ সন্তানদের সম্পত্তির মত। নানা দিক থেকে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের কাছে থেকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রীর করুন পরিনতি কত ভয়াবহ হত তার দৃশ্য বর্ণনা করাও যায় না। সতীদাহ প্রথা এর চূড়ান্ত উদাহরণ। নারীদের প্রতি এ চরম অন্যায়-অত্যাচার এক সময় স্বীকৃতি পায় পুণ্য সতী হওয়ার মারপ্যাচে। কি অবাক কান্ড! সমাজের এ ধরণের ন্যাক্কার জনক কাজকে পাপ না বলে পূণ্য বলেই প্রচার হত। সতীদাহ প্রথার করাল গ্রাস থেকে কোন ক্রমে কোন নারী বেঁচে গেলেও তাকে ধীরে ধীরে সত্যিই চিতায় পুড়তে হত আমরণ পর্যন্ত। এমন কি তার খাওয়া দাওয়া বসন ভূষণ সব কিছুতেই এত বেড়া জাল ঘিরে দেওয়া হত যে সে বেঁচেও মৃত বলা যেতে পারে।

কিন্তু ইসলাম বিধবা ও বিবাহ বিচ্ছেদ মহিলাদের জন্য আশির্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে। এরকম মহিলাদের সব রকমের ব্যথা বেদনার মোচন করেছে ইসলাম। কোন মহিলার জীবন দৈবাত এ ধরনের ঘটনা ঘটে গেলে মাত্র চার মাস দশ দিন পরেই তাকে আবার নূতন জীবনের আশ্বাস দেয়। এ সময়টুকু পার হলেই সে নিজের জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে নিজের ইচ্ছানুযায়ী। চার মাসের এই 'ইদ্দত' কাল পার হলেই সে বৈধ ছাড়পত্র পায় নূতন বিবাহ করার। এর পরে অবশিষ্ট জীবন সে কিভাবে কাটাবে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। কুরআনের ঘোষনা,

> ".....আর তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন তাদের বিবাহ দাও" (কুরআন– ২৪:৩২)

নবী (সাঃ) ও তার পারিবারিক জীবন

নবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের নানান দিক নিয়ে সমালোচকেরা যেমন মাথা ঘামিয়েছেন, তেমনি খুব বেশী মাথা ঘামিয়েছেন তাঁর পারিবারিক জীবন। তারা নবী (সাঃ) এর বৈবাহিক জীবনের সাথে তুলনা করেছে খৃস্টের অবিবাহিত জীবনকে নিয়ে। সাধারণভাবে ধর্মীয় চিন্তার ভাবাবেগ থেকে এটা প্রকাশ পায় যে, নবীত্ব প্রাপ্তির জন্য সন্যাস জীবনই দরকার। যার মধ্যে পরিবার পরিজনের আশা আকাঙ্খা আছে তার মধ্যে নবীত্ব আসতে পারে না। কারণ পরিবার পরিজনদের মধ্যে থাকা ও তাদের আশা আকাঙ্খার সাথে জড়িয়ে পড়া সাধারণ মানুষের কাজ।

নবী (সাঃ) তার জীবনকে এমন ভাবে পরিচালনা করেছিলেন যে তা দেখে তার সঙ্গী সাথিরা তাঁকে অনুসরণ করার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। একটি সুবিখ্যাত হাদীস থেকে জানা যায়, এক সময় নবী (সাঃ) এর কিছু অনুচর নিজেদের ধর্মীয় কাজের প্রমান দেওয়ার জন্য নিজদের ইচ্ছায় কিছু কাজ নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছিল। তাদের প্রথমজন বলেছিল যে সে বিয়ে করেনি, দ্বিতীয়জন বলেছিল যে মাংস খায় না এবং তৃতীয় জন বলেছিল যে মাটিতেই ঘুমায় এবং চতুর্থজন বলেছিল যে সব সময় রোজা রেখে কাটায়। নবী (সাঃ) তাদের বলেছিলেন 'আল্লাহর প্রশংসা', আমি বিয়ে করেছি কিন্তু আমি ধর্মীয় জীবন পালন করি। আমি মাংস খাই রোজাও রাখি, আমি ঘুমাই আবার আমি জেগেও থাকি'।

এইভাবে নবী (সাঃ) মানুষের পার্থিব বা সামাজিক জীবনের সাথে ধর্মীয় জীবনের এক সুন্দর সুসামঞ্জস্যশীল ভারসাম্য প্রদান করেছিলেন। তিনি সাংসারিক জীবনের প্রতি কোন অনীহা প্রকাশ করেননি এবং ধর্মীয়

কাজের আশির্বাদকেও দূরে সরিয়ে রাখেননি। সম্পদের স্তুপিকরণ ও পার্থিব চাকচিক্যকে তিনি যেমন পছন্দ করতেন না তেমনি জীবন পরিচালনার জন্য যে অর্থের দরকার তা অর্জন করার জন্য খামাকা চুপ করে বসে থাকেননি। জীবনের কঠোর বাস্তবতার মোকাবিলা করার জন্য অর্থ সম্পদের যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি অস্বীকার করতেন না। নবী (সাঃ) ও খৃস্টের জীবনের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এটাই। ইসলাম মানুষের আচরণে চরম লাগাম টেনে ধরেনি। দেহমনের যে পার্থিব বা প্রাকৃতিক চাহিদা রয়েছে নবী (সাঃ) তার সমস্তটুকুই পালন করেছেন ও অনুচরদের সে বিষয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের প্রবণতা এক বিবাহের দিকে কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনে বহু বিবাহ মেনে নেয় না, তেমনটি নয়। তেমনিভাবে বিশেষ কারণে যুদ্ধের অনুমোদন দিয়েছে কিন্তু তা কেবল আল্লাহ ও শান্তির জন্য। সংক্ষেপে বলা যায় ইসলাম মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় তার শক্তি সামর্থ ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে। ইসলাম মানুষকে সেই মসস্ত অধিকারকে স্বীকৃতি দান করেছে যাতে পার্থিব জীবনের সকল রকম সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা ও শান্তি শৃঙ্খলা আসে এবং পরকালের জীবনও শান্তি সুখের স্থান পেয়ে থাকে।

ইসলাম সামঞ্জস্য করে পার্থিব দিকগুলিকে আধ্যত্মিক জীবনের সাথে মিশিয়ে এক শান্তিময় জীবন ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। এর দ্বারা একজন মুসলিম কোন সময় ভাবতে পারেনা যে দুটি জিনিসকে কোনও ভাবে বিচ্ছেদ করা যেতে পারে। ইসলাম পার্থিব জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন দুটোকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। একে অপরকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এটা আমাদের জানা যে, মানুষের জৈবিক চাহিদাকে যদি আমরা অস্বীকার করে চলি তাহলে তার লাগামহীন চাহিদার পথ বেয়ে মানুষের জীবনে চলে আসতে পারে অসংখ্য দুর্নীতি। তাই মানুষের চাওয়া পাওয়া আশা আকাঙ্খাকে আধ্যাত্মিকতার লাগাম কশে ফিরিয়ে আনা দরকার যাতে এই পার্থিব জীবনের কামনা বাসনা বাঁধা পড়ে এক সু নিয়ন্ত্রিত চৌহদ্দির মধ্যে।

একইভাবে ইসলামের লক্ষ এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে মানুষ এক স্বচ্ছ জীবন যাপনের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাবে। ইসলাম

সংসার জীবনের সঙ্গে বৈরাগ্যের ভারসাম্য রচনা করেছে। কারণ অতীতের অনেক সমাজ ধ্বংস হয়েছে এই বৈরাগ্যতা নামক ব্যাধির দ্বারা। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষতি করে তেমনি সমাজেরও ক্ষতি করে। বৈরাগ্যবাদ বা সন্যাসবাদ পাপের গহ্বরেও ঢুকে যেতে পারে পার্থিব জীবনের চাহিদাকে অস্বীকার করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সন্ন্যাসবাদকে ঘিরে অনেক কলঙ্ক ছড়িয়েছে। পাছে এরকম এক পরিস্থিতির শিকার যাতে সমাজ না হয় সে জন্য ইসলাম এর অনুসারীদের বিবাহ করার হুকুম দিয়েছে। আর এতে পরিবার গড়ে ওঠে, সমাজ গড়ে ওঠে, মানব বংশের বিস্তার ঘটে, সমাজে ঘটে এক পারস্পরিক সুবন্ধন। পারস্পরিক বন্ধনের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোও। সমাজ বাঁধা পড়ে কতকগুলি আবিষ্কার ও কর্তব্যের বাঁধনে।

একজন আদর্শ পিতা এবং স্বামী হিসাবে নবী (সাঃ) কেমন ছিল সে ব্যাপারে কোন প্রশ্নই ওঠেনা। যদিও নবী (সাঃ) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রীদের বেশীর ভাগই ছিল বিধবা তবুও শান্তির সবরকমের ঝর্ণাধারা তাঁর গৃহে প্রবাহিত হত। কোন রকম অশান্তি ছিলণা কখনও। এটা স্মরন রাখা দরকার যে এত কিছু সত্বেও তিনি ঘোষনা দিয়েছিলেন যে তিনি আলাদা কোন সত্ত্বা ছিলেন না। আদর্শ মানব সমাজ গড়ার জন্য কেবল আদর্শ মানবের দরকার। অতি প্রাকৃতিক কোন সত্ত্বা দিয়ে মানব সমাজ গড়ে উঠতে পারে না । যে সত্ত্বা মানুষের আশা, আকাঙ্খা, সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে তা ফেরেস্তাদের কাছে সম্মানীয় হলেও মানুষের কাছে নয়। মানুষের আচার আচরণ শুধরানোর জন্য মানব নেতৃত্ব চাই। মানবীয় গুন নিয়ে যে নেতা এগিয়ে আসে সেই প্রকৃত নেতা। এ চরম সত্যতা নবী (সাঃ) এর জীবনে পরিপূর্ণভাবে ছিল, সমাজ গঠনের সবচেয়ে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যে ইউনিট তা হল 'পরিবার'। একটি পরিবারের ঝক্কি ঝামেলা কিভাবে মোকাবিলা করতে হয় নবী (সাঃ) তার সুন্দর চিত্র সমস্ত বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরেরাও পারিবারিক জীবনের পূর্ণ অনুসরণকারী হয়েছিলেন। নবী (সাঃ) এমন এক আদর্শ ছিলেন যে

সমস্ত মানব জাতির জন্য তার আদর্শ অনুসরণ করাই যথেষ্ট। একজন মানুষের জীবনের যত রকম সমস্যা রয়েছে তার সমাধান এক নবীর আদর্শের মধ্যেই পাওয়া যাবে। অন্য কোথাও ছোটাছুটি করতে হবে না।

যদি নবী মুহাম্মদ (সাঃ) অবিবাহিত থেকেই যেতেন তাহলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের কাছে আদর্শ পুরুষ হতে পারতেন না। এমনকি তার অনুসারী আমরা মুসলমানেরাও বৈবাহিক জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনবহিত থেকে যেতাম। তিনি যে আদর্শ সমাজ গড়ার কথা চিন্তা করেছিলেন তা কখনও বাস্তবায়িত হতনা। তা নিশ্চিতভাবে অসমাপ্তই থেকে যেত– একথা আমরা জোরের সাথে বলতে পারি। একমাত্র নবী (সাঃ) এর পথ নির্দেশনা হল আমাদের চলার পথ। আমাদের বাঁচার পথ। নবী (সাঃ) এর একটি আদর্শ বিবাহ করা থেকে আমরা কত রকম সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারি এবং কত রকম সুবিধা ভোগ করতে পারি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মান, সম্মান, মর্যাদা প্রভৃতি যেমন বিবাহের মধ্যে নিরাপত্তা লাভ করে তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক নানান সুবিধাও পাওয়া যায় বিয়েতে। তাছাড়া হৃদয়, মন, শরীর, স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথাতো আছেই।

কুরআনের কয়েকটি বাক্য নিয়ে বিভ্রান্তি

ইসলাম তার শত্রুদেরও সমালোচনার সুযোগ দেয়। শত্রু বলেই সে কোন কথা একবারে বলতে পারবেনা– ইসলাম এ ধরনের অসহিষ্ণু ধর্ম নয়। সাধারণভাবে ইসলামের শত্রুরা এটা বলে বেড়ায় যে ইসলাম নাকি অমুসলিমদের প্রতি অতি মারাত্মকভাবে আক্রমণ প্রবণ, কিন্তু খুব মজার ব্যাপার যারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালায় তারা মূলত সারা বিশ্বে যে সকল মানবতা বিরোধী কাজ কর্ম ঘটছে তার হোতা। তাদের এই মিথ্যা কামান দাগা, তাদের হাজার অপকর্মের পরেও থামেনি। তাদের মানবতা বিরোধী অপকর্ম তালিকা বিশাল। দুটো বিশ্বযুদ্ধ বাধানো, বসনিয়া গনহত্যা, স্ট্যালিন টেরর, জাপানের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা, ইরাক-আফগানিস্তান লিবিয়া ও লেবাননের ধংস সাধন, কি নেই তাদের ধংসাত্মক কাজের তালিকায়? এগুলি সব কিছুই হয়েছে নাকি মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য। এর পরেও মুসলিম সম্পদশালী দেশের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার যথার্থতা খোঁজা হয়। বড় হাসির কথা এগুলো।

মুসলিমদের চরিত্র গঠনের মূল গাইডেন্স হল কোরআনের আদেশ নিষেধ। সবাই এটা জানে এ কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে একই দিনে বা একই সময় রাসূলের কাছে অবতীর্ণ হয়নি। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে এ কুরআন প্রাথমিক যুগে নবী (সাঃ) এর মক্কা মদিনার অনুসারীদের জীবনের পথ নির্দেশিকা দান করে অবতীর্ণ হয়। কুরআনের তৎকালীন অনুসারীরা দুটি ভিন্ন জায়গায় বসবাস করতেন। একটি হল মক্কা ও অপরটি হল মদিনা। দুটি জায়গার দূরত্বও ছিল অনেক তাই উভয় জায়গার বাসিন্দাদের মধ্যে রুচি আচার ব্যবহার প্রভৃতির ভিন্নতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। মক্কায় তিনি তেরো বছর ধরে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এখানে তাঁকে নানা

রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়। কুরাইশরা প্রথমে তাঁর সমালোচনা শুরু করল, তার পর গালাগালি, তারপর লোভ দেখান সব শেষে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবী (সাঃ) ও তার সঙ্গী সাথীরা মদিনায় হিজরত করল এবং সেখানে একটু শান্তিতে বাস করতে পারল। নবী (সাঃ) এর কিছু অনুসারীকে তাদের পরিবার ও সম্পত্তি থেকে বিচ্যুত করে তাড়িয়ে দিল কুরাইশরা। অনেকে জীবন ভয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে গেল। মদিনায় নবী (সাঃ) এর অনুসারীরা সংখ্যায় এখন বেশী হল। তারা তাদের সমস্ত আনুগত্য আল্লাহর আদেশের কাছে নিবেদন করল। তারা নবী (সাঃ) এর নেতৃত্ব সার্বিকভাবে গ্রহণ করে নিল।

দুবছরের মধ্যেই মক্কার কুরাইশ শত্রুরা মদিনা আক্রমণ করল এবং বদর নামক স্থানে যুদ্ধ সংগঠিত হল। এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে কুরাইশরা পরাজয় বরণ করল মুসলমানদের কাছে। তৃতীয় বছরে মক্কার কুরাইশরা আবার মদিনা আক্রমণ করল এতে মুসলমানদের প্রচুর ক্ষতি হল কিন্তু কোন রকমে বাঁচা গিয়েছিল। হিজরেতের পঞ্চম বছরে মক্কার কুরাইশরা আবার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে এল। এতে সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার। নবী (সাঃ) ও তার অনুসারীরা শত্রুদের তুলনায় নিজেদের খুব অল্প সংখ্যকই ভাবলেন। কুরাইশরা ছিল সুসজ্জিত। কিন্তু মদিনাবাসীরা তেমন অস্ত্রসস্ত্রের অধিকারীও ছিল না। তাই মদিনার চারদিকে পরিখা খুঁজে মুসলমানেরা তার মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তায় রাখলেও সরাসরি সংঘর্ষকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কুরাইশরা যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে মদিনা আক্রমণ করতে আর আগ্রসর হয়নি, সপ্তম হিজরিতে মদিনা ও কুরাইশদের মধ্যে একটা চুক্তি সংঘটিত হয়। কিন্তু মাত্র ছ মাসের মধ্যে কুরাইশরা এ চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে। এই কুকর্মের প্রতিবাদে নবী (সাঃ) দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা জয় করলেন। এতে কোন প্রকার সংঘর্ষ সংঘটিত হয়নি এবং কারোর প্রাণ হানিও ঘটেনি। এ ঘটনা ঘটেছিল অষ্টম হিজরিতে। এর পর ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ) এর শত্রুদের একে একে ক্ষমাই করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করা হয়নি, তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণও নেওয়া হয়নি। সংক্ষেপে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী (সাঃ)

এর জীবনে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য জয়ের এই হল ইতিহাস, এই সময়ে সম্পূর্ণভাবে নবী (সাঃ) কুরআনের প্রত্যাদিষ্ট নির্দেশিকা মেনে চলেছিলেন।

নবী (সাঃ) এর এই সময়ের ইতিহাসে এমনকি থাকতে পারে যাকে ইস্যু করে তাঁর উপর যুদ্ধবাজের তকমা লাগানো যায়? তাঁর ইচ্ছায় তো কোন যুদ্ধ ঘটেনি বরং যা ঘটেছিল তা কেবল প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। যখন তার উপর আক্রমণের খাঁড়া এসে পড়েছিল তখন তিনি বীর বিক্রমে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করেছেন মাত্র। তাছাড়া তার সাথে যে সকল শান্তি চুক্তি করা হয়েছিল তা যখন ভাঙ্গা হয়েছিল তখন তিনি এই চুক্তি ভঙ্গের প্রতিবাদে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু তাস্বত্ত্বেও যারা চুক্তি ভঙ্গের সাথে জড়িত ছিলনা তাদের জন্য তিনি পরম ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন, যা যুদ্ধ ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

ঐতিহাসিক এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিটি মুহুর্তে নবী (সাঃ) কে প্রত্যাদেশ প্রদান করে নির্দেশিকা দান করা হয়েছিল। এখন বুঝতে হবে কুরআনের প্রত্যাদিষ্ট বাক্যগুলো কোন পরিস্থিতিতে এসেছিল। কারণ প্রতিটি প্রত্যাদিষ্ট ঘটনার সাথে পরিস্থিতির সাজুয্য রয়েছে। কিন্তু সমালোচকেরা কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ না জেনে কেবলমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে দুটো অশ্রাব্য কথা বলার জন্য মত্তকা খোঁজেন।

ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে বহু সমালোচক কুরআনের এমন কতকগুলো বাক্য নিয়ে সমালোচনা করেছেন যে তাতে সাধারণ পাঠক এমন কি মুসলমানেরাও সন্দেহ সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাবে। কুরআনের সমালোচনা করতে গেলে অবশ্যই কুরআনের অবতীর্ণ প্রসঙ্গ জানা দরকার।

আর যদি তা না করে কুরআনের যে কোন অংশ থেকে বাক্য টেনে তার ব্যাখ্যা করা হয় তবে পাঠকেরা অবশ্য সংশয়ে পড়বেন। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমালোচকরা সব কিছু জেনেও এ ধরণের সমালোচনা করেন। ইসলামকে আঘাত হানার জন্য এবং শান্তি প্রিয় মানুষকে বিভ্রান্ত

করার জন্য।

"লড়াই কর আল্লাহর জন্য যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাদের সাথে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করনা। আল্লাহ বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।" (কুরআন– ২:১৯০)

"তাদের সাথে লড়াই কর, যেখানে তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়। এবং তাদেরকে সে সব স্থান হতে বহিস্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদের বহিস্কার করেছিল। এ জন্য যে, নর হত্যা যদিও একটা অন্যায় কাজ, কিন্তু ফিতনা ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবেনা ততক্ষন তোমরাও লড়াই করনা। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর, কারণ এধরণের খোদা দ্রোহীদের এটাই যোগ্যশাস্তি।" (কুরআন– ২:১৯১)

"তবে পরে যদি বিরত হয়। তবে এ কথা জেনে রাখ যে আল্লাহ ক্ষমা গ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল।"
(কুরআন– ২:১৯২)

"তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষন না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয় যায় ও দ্বীন কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তার পরে যদি তারা বিরত হয় তবে বুঝে নাও যে, কেবলমাত্র যালেমদের ছাড়া কারো উপর হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত নয়।"
(কুরাআন– ২:১৯৩)

"হারাম মাসের বিনিময়ে হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহই তূল্যভাবে মানতে হবে। কাজেই যে তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে।

তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর হস্ত প্রসারিত করবে। অবশ্য খোদাকে ভয় করতে থাক এ কথা জেনে রাখ যে আল্লাহ তাদের সঙ্গেই রয়েছেন। যারা তার নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে সরে থাকে।" (কুরআন– ২:১৯৪)

উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াত গুলো নিয়েই বর্তমান বিশ্বে নানা ধরণের সমালোচনা চলছে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সর্বত্রই। এর ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেই সমালোচক ও ইসলাম বিদ্বেষি লোকেরা –এ আপত্তি তোলেন যে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু কুরআনের এই সকল আয়াততো যুদ্ধনীতি কেমন হবে সে প্রসঙ্গে একটি সুন্দর নির্দেশিকা প্রদান করে। এখানে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধকালীন অবস্থাতে কি রকম সম্পর্ক থাকবে তাও আলোচনা করা হয়েছে। তাই যারা সমালোচনা করে থাকেন তাদের উচিত এ সকল আয়াত নিয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা। নিজেরা এর অর্থ না বুঝে এর ইতিবাচক অর্থ না করে নেতিবাচক আলোচনায় নিজেদের কলমকে ক্লান্ত করা ঠিক হবে না। মুসলমানদের বোঝাতে হবে কেমন করে এ আয়াতগুলো দ্বারা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলা যেতে পারে? "তোমরা বাড়াবাড়ি করোনা", 'আল্লাহ বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না'– এ সকল বাক্যাংশকে কি উড়িয়ে দিতে হবে কুরআন থেকে সমালোচনার খাতিরে? তা কখনও হতে পারে না। কুরআনের এ সকল বাক্য গুলোকে সামনে রেখে সমালোচকদের সমালোচনা করা দরকার। কুরআনকে সব সময় তার প্রাসঙ্গিকতার সাথে পাঠ করা দরকার। তাছাড়া কুরআন যে তেইশ বছর অবতীর্ন হয়েছিল সেই সময়কার মানুষদের জন্য এটি নিদেশিকা ছিল। কিন্তু তা বলে কোরআনের নির্দেশিকা কেবল ঐ তেইশ বছরের মানুষদের জন্য ছিল, তেমনটি নয়। বরং তার পরেও অগুনিত মানুষদের জন্য একই আদেশ বিধিবদ্ধ।

উপরে যে সকল আয়াতগুলোর সমালোচনা তোলা হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের সামনে অন্য এক চিত্র ভেসে ওঠে। মুসলিমরা তখন সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না, তারা ছিল

অবরুদ্ধ' জীবন মৃত্যুর মাঝেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল অতি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থাতে। মক্কার কুরাইশ সহ অন্যান্য আরব জাতি মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল। মক্কায় কুরাইশরা ইসলামকে দমন করতে পারেনি সেই সঙ্গে মদিনার বুকে মুসলমানরা আশ্রয় পেয়েছে এবং দিন দিন বেড়ে চলেছে– এটা প্রতিটি কুরাইশ বাসীর মেজাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তাই তারা পেলে খেয়ে ফেলবে -এই রকম এক প্রতিহিংসা নিয়ে ক্ষুদার্থ সিংহের মত গর্জাচ্ছিল। তাই তারা ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ করে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে তারা এমন এক বড় যুদ্ধের আয়োজনে প্রস্তুত হচ্ছিল যাতে মুসলিমরা বাঁচবে কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। তারা চাইছিল মুসলিম সম্প্রদাকে একেবারে নিভিয়ে দিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের ঘোষণা,

> "তারাতো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে, এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে নেবে। তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে"।
> (কুরআন– ২:২১৭)

তাই এ আয়াতের শিক্ষাতো মুসলিমদের একটি বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্যায় অত্যাচারের মোকাবিলায় কিভাবে মুসলমানেরা পিঠ বাঁচাবে তাই এখানে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যদি একান্তভাবে তাদের প্রতি আক্রমণ আসে তাহলে কেমনভাবে সাহসিকতার সাথে লড়তে হবে তাই বলা হয়েছে এখানে। যারা সমালোচনা করে তারা কি বলতে চায়? এই রকম আয়াত অবতীর্ন না হয়ে কুরআনের অবতীর্ন বাক্য "যেখানে তাদের পাও আলিঙ্গন কর। তাদেরকে চুমু খাও কারণ তারা তোমাদের ঘর থেকে তাড়িয়েছে ও তোমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছে এই ধরণের হওয়া দরকার ছিল? আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে

এমনটি ঘটেনি। বরং আজকে বিশ্বের এমন অনেক জাতি যেখানেই সুযোগ পেয়েছে আক্রমণে তারা এতটুকু ভাবারও অবকাশ নেয়নি। আমেরিকার যুদ্ধং দেহী মনোভাবের অনেক পরিচয়ই আমরা আগেও পেয়েছি বর্তমানেও পাচ্ছি।

তাই এ কথা বলতেই হয় এরকম পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ (সাঃ) কে ঐধরণের নির্দেশ দান করে কুরআন ঠিকই করেছে কারণ তাদেরকে তো তাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করতে হবে। এই ভাবে কুরআনের এই আয়াতগুলো অবতীর্ন হয়েছিল যখন মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে চরম বিরোধ বেঁধেছিল তখন এবং যখন মুসলমানদের বেঁচে থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

কুরআনের এই আয়াত গুলোর নির্দেশিকা কিছু এতিহাসিক পরিস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত করে। যেমন "ওদের হত্যা কর" বাক্যাংশ থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে এখানে কুরআন সেই সব ব্যক্তিদের প্রতি অ্যাকশান গ্রহণ করার কথা বলেছে যারা নাকি নবী (সাঃ) ও তার সঙ্গী সাথিদের চরম নির্যাতনের সাথে বাড়ি ঘর থেকে বহিস্কার করে দিয়েছিল। তাই নবী (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ঘর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার। তারা মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন মসজিদে হারামের মধ্যে কোনরকম যুদ্ধ বা রক্তপাতের কাজ সংঘটিত না করে।

এরকম এক কঠিন মূহুর্তেও মুসলামনরা এই নিদের্শ পেয়েছিল যাতে করে তাদের দ্বারা কোন নারী, শিশু ও বৃদ্ধ যেন ক্ষতি গ্রস্থ না করা হয়। তাদের প্রতি কোন রকম বাড়াবাড়িও যেন না হয়। কারণ এগুলো সবই নিজেদেরই ধংস করে দেয়। এমনকি শত্রু পক্ষ লড়াই বন্ধ করে দিলে মুসলমানেরাও যেন যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়, এরকম নির্দেশও কুরআন দিয়ে থাকে। তাই এ কথা বলতেই হয় কেবলমাত্র বাধা প্রতিহত করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদন দিয়ে থাকে।

যুদ্ধের জন্য অবশ্য সুনির্দিষ্ট কারণ থাকা চাই, যখন তখন বিনা কারণে

যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া যায় না, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হল আত্মরক্ষার উপায়, তাছাড়া এমন প্রকৃত সত্য হল যারা ইসলাম, ইসলামের অনুসারী এবং এর নীতিমালাকে ধংস করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ চালায় তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদন দেয়।

কুরআনের ঘোষণা,

> "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম"
> (কুরআন– ২২:৩৯)

কুরআনের অনত্র বলা হয়েছে,

> "আর এক ধরণের মুনাফিক তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং জাতির দিক থেকেও। কিন্তু যখনই গোলযোগ সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধরণের লোক যদি তোমাদের সাথে মুকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমনের হতে বিরত না রাখে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরণের লোকেদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করলাম" (কুরআন– ৪:৯১)

আর এই সকল কারণকে সামনে রেখে নবী (সাঃ) এর সাথে কুরাইশদের তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এগুলো ছিল বদর, উহুদ ও পরিখার যুদ্ধ। শেষ টাকে মূলত যুদ্ধই বলা যায় না কারণ, নবী (সাঃ) ও তার সঙ্গী সাথীরা মদিনার চারপাশে এমন পরিখা খনন করেছিলেন যে তা অতিক্রম করতে না পেরে শত্রুপক্ষ কুরাইশরা একমাস অপেক্ষা করেও শেষমেস ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এর থেকে এ শিক্ষাই

পাওয়া যায় যে মুসলিমদের আক্রমণাত্মক নীতি বর্জন করতে বলা হয়েছিল এবং কোন প্রকার গন্ডগোলও যেন তাদের তরফ থেকে প্রথমে না হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কুরআনে বর্ণিত প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ সরাসরি অত্যাচার যুলুম, নিপীড়ন নির্যাতনের সাথে জড়িয়ে আছে। কুরআনে এ সব কাজকে হত্যার চেয়ে খারাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষি আছে অন্যায় অত্যাচারের পরিণামে চরম নৃশংসতা নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। এর ফলে মানুষের মর্যাদার অবমাননা হয়। মানুষের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত ও পদদলিত হয় অত্যাচারের ফলে। প্রকৃতপক্ষে নির্যাতনের ফলে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ হয় নানান দিক থেকে। এর দ্বারা নূতন করে হিংসার ও সংঘর্সের আগুন জ্বলে উঠে উভয়ের মধ্যে। অথচ এটা না ঘটলে উভয়েরই উন্নতি ঘটত। এর ফলে জীবিত থেকেও মৃত্যুর যন্ত্রনা ভোগ করে যেতে হয়। এই রকম ঘটনা রুখতে কুরআন মদিনার মুসলিমদের মক্কার কুরাইশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিল কারণ তারা মদিনার মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল চরমভাবে।

কুরআন থেকে বোঝা যায় যুলুম অত্যাচার বড় অন্যায় কাজ। হত্যা অপেক্ষাও এগুলো নিকৃষ্ট পর্যায়ের। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি কোন প্রকার শান্তির বৈঠকে না বসে, তবে রুখে দাঁড়াতে হবে বৈকি। কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন প্রভৃতি বোঝায় এটা মানুষের বিশ্বাস থেকে হটিয়ে দেওয়াও বোঝায়।

এটা সেই লড়াই যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয়েছিল এবং এই সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম যেটাকে কোরআন 'আল্লাহর জন্য' বলে অভিহিত করেছে। এই প্রবচন টা এজন্য ব্যবহার করা হয়নি যে এতে করে জোর করে একটা বিশ্বাস অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। কুরআনে এটি মাত্র একবার ব্যবহার হয়নি। বরং 'আল্লাহর জন্য' বলতে বোঝান হয়েছে অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াকে।

কুরআনের এই প্রকাশভঙ্গি থেকে এটার উপরই জোর দেওয়া হয় যে, মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক। মানুষ মুক্ত হোক অন্যায় অত্যাচার থেকে। মানুষ নির্ভয়ে স্রষ্টার ইবাদত করতে পারুক। এমনকি মানুষ যদি গির্জায় বসে স্রষ্টাকে ডাকে তবে সে গির্জা ধংস করা যাবেনা। এইভাবে মন্দির কিংবা সিনাগগ কোন কিছু ধংস করা যাবেনা। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা,

> "এরা সেই লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এতটুকু যে, তারা বলত, আমাদের রবতো আল্লাহ! আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তাহলে খানকা সমূহ, গীর্জা, উপসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহর যিকর বেশি করে করা হয় সবই চুরমার করে দেয়া হত। আল্লাহ অবশ্যই সেই লোকদের সাহায্য করবেন যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় প্রবল।"
> (কুরআন– ২২:৪০)

কুরআনের এ সব বার্তা দ্বারা এটা বোঝা যায় যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলেও তা কোন দিন নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে অপরের উপর জোর করে চাপিয়ের দেওয়ার উদ্যেশে হবে না। এবং প্রতিটি মানুষের এ অধিকার অবশ্যই থাকবে যাতে করে সে তার ধর্ম বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। তাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল কোরআনের আয়াত অবতীর্ন হয়েছিল এবং পরে এই আয়াতের মধ্যে একটু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

বাস্তবে কুরআনের অপব্যাখ্যায় এটা দেখান হয়েছে, যেন ইসলামের শুরু হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে আর তা শেষ হয়েছে যতক্ষন না মানুষ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছে দলে দলে। কিন্তু এটা ইসলামের বা কুরআনের মুক্ত চিন্তার অন্তরায়। কুরআন যে কত মুক্ত চিন্তার অবকাশ দেয় তা অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই' কুরআনের

বহু আয়াত দ্বারা মুসলামনদেরকে শান্তির জন্য ও সন্ধির জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে সূরা বাকারার ১৯৯০-১৯৫ পর্যন্ত আয়াত গুলোর সাথে সূরা নিসার ৭৬, ৩৪, ৮৯, ৯১ নং আয়াত পাঠ করা হয়ে থাকে। এগুলো সবই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে অবতীর্ন। এগুলো নিচে উদ্ধৃত হল,

> "তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘন করোনা। কেননা আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেননা। তাদের সাথে লড়াই কর। যেখানে তাদের সাথে মুকাবিলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান থেকে বহিস্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিস্কৃত করেছে। এজন্য যে নর হত্যা যদিও একটা অন্যায় কাজ। কিন্তু ফিতনা ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়। আর মসজিদে হারামের নিকট তারা যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষন তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয় তবে তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা এ ধরণের খোদাদ্রোহীদের এটাই যোগ্য শাস্তি। তবে পরে যদি বিরত হয় তবে একথা জেনে রাখ যে আল্লাহ ক্ষমা গ্রহণকারী ও অনুগ্রহশীল। তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যতক্ষন না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়। তার পরে যদি তারা বিরত হয়, তবে বুঝেনাও যে কেবলমাত্র যালেমদের ছাড়া আর কারো উপরে হস্ত প্রসারিত করা সঙ্গত নয়। হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহই তুল্যভাবে মানতে হবে। কাজেই যে তোমাদের উপর হস্ত প্রসারিত করে, তোমরাও তার উপর অনুরূপভাবে হস্ত প্রসারিত করবে। অবশ্য খোদাকে ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে আল্লাহ তাদের সঙ্গেই রয়েছেন, যারা তার নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন থেকে দূরে সরে থাকে। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় কর এবং নিজেদের

হাতেই নিজেদের ধংস সাধন করনা। অনুগ্রহ প্রদর্শনের পথ অবলম্বন কর। কেননা আল্লাহ অনুগ্রহ প্রদর্শনকারীদের ভালবাসেন।"
(কুরআন– ২:১৯০-১৯৫)

"যারা ইমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী সাথিদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলে অত্যন্তই দুর্বল"। (কুরআন– ৪:৭৬)

"আর এধরণের মুনাফিক তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক থেকেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক থেকেও। কিন্তু যখনই গোলযোগ সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এধরণের লোক তোমাদের সাথে মুকাবিলা করা থেকে বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না রাখে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানে তাদের ধরবে এবং হত্যা করবে। এ ধরণের লোকদের উপর আক্রমন চালাবার জন্য আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করলাম"। (কুরআন– ৪:৯১)

"অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন মুসরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের খবরা খবর নেওয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস। অতপর তারা যদি তওবা করে নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে তাদের পথে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুনাময়।" (কুরআন– ৯:৫)

"আর যদি প্রতিশ্রুতি দানের পর তারা নিজেদের শপথকে ভঙ্গ বরে এবং তোমাদের দ্বীনের উপর আক্রমন চালাতে শুরু করে তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কেননা তাদের কসমের কোন বিশ্বাস নেই। সম্ভবতঃ তারা বিরত হবে।" (কুরআন– ৯:১২)

> তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবে। এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। এবং বহু সংখ্যক মুমিনের অন্তরকে শীতল করবেন।" (কুরআন– ৯:১৪)

> "যুদ্ধ কর আহলি কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনেনা। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হারাম করেনা এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেনা যতক্ষন না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়।" (কুরআন– ৯:২৯)

> "প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহতা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন তখন হতেই মাসগুলির সংখ্যা মাত্র বারো, তার মধ্যে চারটি মাস হারাম, এটাই নির্ভূল ব্যবস্থা। অতএব এই চার মাসে নিজেদের উপর যুলুম করো না। আর মুশরিকদের সাথে সকলে মিলে লড়াই কর। যেমন করে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ খোদাভীরু লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন।" (আল কুরআন– ৯:৩৬)

> "হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ সেই সত্য অমান্যকারী লোকেদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে নাও আল্লাহ মুত্তাকী লোকেদের সঙ্গেই রয়েছেন।" (আল কুরআন– ৯:১২৩)

উপরের সমস্ত আয়াতগুলি যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ন হয়েছে কিন্তু ৯:৫ ও ৩:১১৫ নং আয়াত বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারী ও সমালোচকদের বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে তাদের নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতা এখানে দেওয়া হয়েছে তাই এটা বিশেষ ভাবে আলোচনা দরকার।

উপরে উদ্ধৃত (৯:৫) আয়াতে "মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদের পাও, এবং তাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের খবরা খবর নেওয়ার জন্য শক্ত হয়ে বস" নির্দেশটি সব সময়ের জন্য প্রজোয্য নয়। এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এক বিশেষ সময়ে যখন মুশরিকদের

দ্বারা শান্তি চুক্তি নষ্ট হয়েছিল। আবার এই আয়াতে "পবিত্র মাস কথাটি এসেছে। যার দ্বারা সহজেই বোঝা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে এটা কার্যকরী ছিল, এই সময়ে যুদ্ধ বিরতির সময় ছিল। কিন্তু তা স্বত্তেও মুসলামনদের বেশিরভাগ শত্রুপক্ষ উপরিপরি সন্ধীর শর্তগুলো লঙ্ঘন করেছিল, সেই সঙ্গে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ধারাও চলছিল সমান ভাবে। আর মুসলমানদের সাথে বিরোধিতায় এ ধরণে চুক্তি ভঙ্গের নজির আরব জাতির লোকেদের খুব সাধারণ চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরকম অবস্থাতে মুসলমানেদের বেঁচে থাকাটাই যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য মুসলিমদের যুদ্ধ নীতি গ্রহণ করার জন্য গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছিল। যাতে করে অবরুদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও মুসলমানদের শত্রুরা উপজাতিগুলোর গৃহীত চুক্তিও মেনে নেয়নি এবং তাদের সাথে কোন রকম ভাল ব্যবহার করেনি। এই পরিস্থিতিতে মুসলিমরা কুরআনের নির্দেশ মালা অনুসরণ করেছিল যাতে করে যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া যায় এবং অস্ত্রসস্ত্র গুটিয়ে নিয়েছিল যখন শত্রুরা তাদের অস্ত্র সমর্পন করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের এই ভদ্রনীতির মধ্য দিয়ে সুযোগ খুঁজে নিল। তারা চাতুরি করে অনেক মুসলমানদের হত্যা করে ফেলল। কুরআনের এই আয়াত সেজন্য মক্কার কুরাইশ কাফেরদের প্রতি দারুনভাবে বিরক্ত ও ক্রোধ প্রকাশ করে মুসলিমদের জানিয়ে দিল, "তাদের মধ্যে সেই লোকেরা যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, পরে তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে এক বিন্দু ভয় করেনা (৮:৫৬) কুরআন এখানে বিশেষ একধরণের দুষ্ট লোকদের কথা উল্লেখ করেছে।

আমরা এখন সূরা আল ইমরানের ১৫১ নং আয়াত নিয়ে আলোচনা করব। যেখানে বলা হয়েছে, ".....আমরা সত্যের বিরোধীদের মনের মধ্যে এক প্রকার ভীতি ও বিভিষিকা সৃষ্টি করে দেব কেননা তারা আল্লাহর সাথে এমন সব জিনিসকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক করেছে যাদের এরূপ শরীক হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনই সনদ নাযিল করেননি", এই আয়াত তো প্রকৃত পক্ষে কোরআনের শত্রুদের অনুকুলে বলা যেতে পারে।

যে সকল ব্যক্তি ইসলামকে অযথা ভয় করে থাকে তাদের কাছে কুরআনের এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে একটা বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা। 'এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছিল যখন মুহাম্মদ (সাঃ) আগ্রাসনের নীতি গ্রহণ করতে যচ্ছিলেন দ্বিতীয় বছরের জন্য। সময়টা ছিল বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর এক বছরের মধ্যে। নবী (সাঃ) যখন উহুদ যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন কুরআন তাঁকে পুনঃ আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল যে শত্রুরা ভীত হবে এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। এ সময় মুসলিম সৈন্য দক্ষতাও খুবই কম ছিল। তাদের হাতে অস্ত্র-সস্ত্র বলতে তেমন কিছু ছিলনা। এই আয়াত দ্বার শত্রু শিবিরের ধারণাই বেশী পেশ করা হয়েছে মুসলমানদেরই আদেশ দেওয়ার চেয়ে। যে সকল লোক বিরোধীপক্ষের প্রতিরক্ষামূলক কাজ কারবারেও ভয় পায় তারাতো কোরআনের 'এ আয়াতে বিদ্বেষীমূলক ইঙ্গিতই খুঁজে পাবে। এরকম লোকেরা সব সময় শত্রুতা করবে আর তা ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ হলেও তাতে কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করবে না। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতাতেও আত্মরক্ষা অর্জন এবং অত্যাচার রোখার জন্য যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যখন অর্জুন নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হওয়াকে বেশী পছন্দ করেছিল জ্যেঠাতো ভাই কৈরভদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনের চেয়ে তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ দিয়েছিল এই বলে,

> "এ ধরণের অশুভ ভাবনা তোমার মধ্যে কেমন করে এল? যেটা তোমাকে স্বর্গ প্রাপ্তি থেকে দূরে রাখবে। এ ধরণের দুর্বলতা ও হীনমন্যতা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেল। শত্রু বিজয়ী উঠে পড়!"
> (ভগবত গীতা– অধ্যায় ৪:৪৩-৪৬)

কল্পনা করুন, কোন সমালোচক যদি গীতার এই শ্লোকের উপর মন্তব্য করে বলেন, গীতা মানুষকে সন্ত্রাস ও অন্যায়ভাবে হত্যাকে উৎসাহ দেয় তা হলে আপনি তাকে কি বলবেন? নিশ্চয় আপনি তাকে বলবেন যে এটা ষড়যন্ত্র মূলক শয়তানি কাজ। গীতা অন্যায় অত্যাচার রুখতে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ অনুমোদন করেছে। ন্যায় বিচারে 'এটি সঙ্গত কথা। এটি কোন সন্ত্রাসবাদী কথা বার্তা নয় বরং শান্তির বার্তাবাহক।

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/